নাগিনী কন্যার কাহিনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট,
কলিকাতা—৬
১৯১৯

দাম চার টাকা

৪২নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা—৬ ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুম
কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩।বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬, বাণী-শ্রী প্রেস, শ্রীসু
চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত। প্রচ্ছদ শিল্পী—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী
শ্রীসন্তোষ ঘোষ
শ্রীঅনিল চক্রবর্ত্তী

স্নেহাস্পদেষু

মা-ভাগীরথীর কূলে কূলে চরভূমিতে ঝাউবন আর ঘাসবন--তারই মধ্যে বড় বড় দেবদারু গাছ। উলুঘাস কাশশর আর সিদ্ধি গাছে গাছে চাপ বেঁধে আছে। মানুষের মাথার চেয়েও উঁচু। এরই মধ্যে গঙ্গার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হিজল বিল এঁকে বেঁকে নানান ধরনের আকার নিয়ে চ'লে গেছে। ক্রোশের পর ক্রোশ লম্বা হিজল বিল। বর্ষার সময় হিজল বিল বিস্তীর্ণ বিপুল গভীর, শীতে জল ক'মে আসে, গঙ্গার টানে জল নেমে যায়, সূর্যের উত্তাপে শুকিয়ে আসে, তখন হিজল বিল টুক্রো-টুক্রো। হিজল বিল থেকে নালার শতনরী গিয়ে মিশেছে গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে; আশ্বিনের পর থেকে টুক্রো-টুক্রো বিলগুলিকে দেখে মনে হয়—ওই হারের সঙ্গে গাঁথা কালো মানিকের ধুক্‌ধুকি। তখন হিজল বিলের জলের রঙ কাজল-কালো, নীল আকাশ জলের বুকে স্থির হয়ে আসে, যেন ঘুমোয়। চারিপাশের ঘাসবনে তখন ফুল ফোটে। সাদা নরম পালকের ফুলের মত কাশফুল, শরফুল—অজস্র রাশি রাশি। দূর থেকে মনে হয় শরতের সাদা মেঘের পুঞ্জ বুঝি হিজল বিলের কূলে নেমে এসেছে—তার রঙ ফিরে নিতে: ঘন কালো রঙ: বর্ষায় যা ধুয়ে ধুয়ে গ'লে গ'লে পৃথিবীর বুকে ঝ'রে পড়ে জমা হয়ে আছে ওই হিজল বিলের জলের বুকে। মধ্যে মধ্যে হিজল বিলের বাতাস ভ'রে ওঠে অপরূপ সুগন্ধে। গঙ্গার বুকে নৌকা চলে—নৌকার মাঝি-মাল্লারা বুঝতে পারে কোথা থেকে আসছে এ সুগন্ধ। তারা প্রশ্ন করে না,

কোন কথাও বলে না—শুধু হিজল বিলের ঘাসবনের দিকে যেন অকারণেই একবার তাকিয়ে নেয়। আরোহী থাকলে তারাই প্রশ্ন করে—কোথা থেকে এমন গন্ধ আসছে মাঝি ?

মাঝি আবার একবার তাকায় হিজলের ঘাসবনের দিকে, বলে—ওই হিজল বিলের ঘাসবন থেক্যা বাবু। ঘাসবনের ভিতর কোথাকে বুনো লতায় কি বুনো ঝোপে-ঝাড়ে ফুল ফুটি থাকবে।

আর ওঠে বিচিত্র কলকল শব্দ।

আরোহী যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে ভেঙে যাবে সে ঘুম। মধ্যে মধ্যে আকাশে বেজে উঠবে ঠিক যেন ভেরীনাদ। কব্ কব্ কব্ কব্ কব্ কব্। ভেরীর আওয়াজের মত শব্দ ছড়িয়ে পড়ে আকাশে। আরোহী জেগে উঠে সবিস্ময়ে তাকায়—কি হ'ল! কোথায়, কে বাজায় ভেরী ? সত্যিই কি ভেরী বাজছে ? মাঝি আরোহীর বিস্ময় অনুমান ক'রে হেসে রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—পাখী বাবু! 'গগন-ভেরী' পাখী ; হুই হুই উড়ে চলছে। হুই। বিপুল আকারের পাখী বিশাল পাখা মেলে ভেসে চলছে আকাশে। ভেরীর আওয়াজের মত ডাক, নাম তাই গগন-ভেরী। নীচে অন্য পাখীরাও কলরব ক'রে ডেকে ওঠে।

বিলের বুকে হাঁসের মেলা বসেছে, কার্তিক মাস পড়তে না-পড়তে। হাজারে-হাজারে—ঝাঁকে-ঝাঁকে নানান আকারের বহু বিচিত্র বর্ণের হাঁস এসে বাসা নিয়েছে। জলের বুকে ভাসছে, ডুবছে, উঠছে, বিলের চারি পাশের শালুক-পানাড়ি পদ্মবনের মধ্যে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে টাটি ভেঙে খাচ্ছে, ডুব দিয়ে শামুক গুগলি তুলছে, কলরব করছে, মধ্যে মধ্যে পাক দিয়ে উড়ছে ঘুরছে আবার ঝপ-ঝপ ক'রে জলের বুকে ঝাঁপিয়ে ভেসে পড়ছে। বহু জাতের হাঁসের বিভিন্ন ডাক একসঙ্গে মেশানো এক

কলরব। কল্-কল্, কল্-কল্, কঁ্যাক-কঁ্যা-ক, ক্যাও-ক্যাও, ক্যা-ও-ক্যা-ও।

নৌকার আরোহীরা সবিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকায়—এই বিচিত্র সঙ্গীতময় শব্দ শুনে দেখতে পায় আকাশ ছেয়ে উড়ছে পাখীর ঝাঁক।

—এত পাখী!

—হিজল বিল বাবু। ওই তো ওই ঘাসবনের ঝাউবনের উ-পারে। ওই দলখেন নালাগুলায়, ওই সব নালা আসছে ওই বিল থেক্যা।

শিকারী প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে, পুষ্পবিলাসী যারা তারাও ব্যগ্রতা প্রকাশ করে—শিকারে গেলে তো হয়! ওই ফুলের চারা পাওয়া যায় না মাঝি?

মাঝিরা শিউরে ওঠে। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে। এমন কথাটি মুখে আনবেন না হুজুর। "যমরাজার দখিন দুয়ার হিজলেরই বিল।"

সত্য কথা।

রাত্রি হ'লে সে কথা ব'লে বুঝিয়ে দিতে হয় না। ঘাসবনের কোল ঘেঁষে স্রোত বেয়ে যখন নৌকা চলে তখন আপনি বুঝতে পারে আরোহীরা। জ্যোৎস্না রাত্রি হয়তো; হিজল বিলের উপরে আকাশে চাঁদ, জলে চাঁদ। সাদাফুলে ভরা কাশবন শরবন জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে—ঝাউগাছের মাথা দেবদারুর পাতা ঝিক-ঝিক্ করছে, বাতাসে ভরা ফুলের গন্ধ; আকাশে প্রতিধ্বনি উঠছে রাত্রিচর হাঁসের ঝাঁকের

কলকণ্ঠের ডাকের, এমন সময় সমস্ত কিছুকে চকিত ক'রে দিয়ে একটা ডাক উঠল—ফে-উ।

কয়েক মিনিট বিরতির পর আবার উঠল ডাক—ফেউ-ফেউ।

আবার—ফেউ-ফেউ-ফেউ।

এবার স্তব্ধ ঘাসবনের খানিকটা ঠাঁই সশব্দে ন'ড়ে উঠল, জলে কুমীর পাক খেলে—লেজের ঝাপটা মারলে যেমন আলোড়ন ওঠে জল যেমন উতলপাতল ক'রে ওঠে, তেমনি একটা আলোড়ন উঠল—সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হ'ল—নিম্ন ক্রুদ্ধ গর্জন, গর্‌র্‌! গ-র্‌-র্‌! ফ্যাঁস-ফ্যাঁস! গ-র্‌-র্‌।

চতুর কুটিল চিতাবাঘের বাসভূমি—এই ঘাসবন সিদ্ধির জঙ্গল ঝাউ এবং দেবদারুর তলদেশগুলি। ফেউয়ের ডাকে ফিরে দাঁড়িয়ে উত্যক্ত চিতা লেজ আছড়ে নিম্ন ক্রুদ্ধ গর্জন করে শাসায়। গর্‌-র্‌ গ-র্‌-র্‌! কখনও কখনও এক-একটা উঁচু হাঁকও দিয়ে ওঠে, আঁ—ক্‌! আঁ—ও!

বিলের জলের ধারে কালো কিছু চঞ্চল হয়ে মুখ তুলে কান খাড়া ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। গজরায়—গোঁ-গোঁ-গোঁ! কখনও কখনও অবরুদ্ধ ক্রোধে অধীর হয়ে ছুটে যায় শব্দের দিক লক্ষ্য ক'রে। কখনও বা ছুটেও পালায়। বুনো শুয়োরের দল, বিলের ধারে মাটি খুঁড়ে জলজ উদ্ভিদের কন্দ খেতে খেতে বাঘের সাড়ায় তারাও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ভয় কিন্তু ওসবে নয়। চিতা বাঘ বুনো শুয়োর বল্লমের খোঁচায় লাঠির ঘায়েমারা যায়। এ দেশের গোয়ালারা, চাষীরা দল বেঁধে অত্যাচারী চিতা বাঘ বুনো শুয়োর খুঁজে বের ক'রে মারে। ভয়ের আরও কিছু আছে। বাঘ, শুয়োর, এরাও তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত। ঘাসের বনের মধ্যে একফালি সরু পথের উপর দিয়ে যখন ওরা চলে, তখন চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে অতর্কিতে সাক্ষাৎ মৃত্যুর আক্রমণের আশঙ্কা। সামান্য শব্দে চকিত হয়ে থমকে দাঁড়ায়, কান পেতে শোনে, মৃদু গর্জন করে।

কোথা থেকে—হয়তো কোন ঝাউগাছের ডাল থেকে বা দেবদারুর ঘন পল্লবের মধ্য থেকে অথবা ঘন ঘাসবনের মাথার উপর বিস্তৃত লতার জাল থেকে একটা মোটা লম্বা দড়ি চাবুকের মত শিষ দিয়ে আছড়ে এসে পড়বে তার গায়ে—চোখের সামনে লক্-লক্ ক'রে দুলে উঠবে চেরা একখানা লম্বা সরু জিভ—মুহূর্তে বিঁধে যাবে একটা অগ্নিতপ্ত সূক্ষ্ম সূচের মত কিছু ; সঙ্গে সঙ্গে মাথা হতে পায়ের নখ পর্যন্ত শরীরের শিরায় স্নায়ুতে ব'য়ে যাবে বিদ্যুতের প্রবাহের মত অনুভূতি, পৃথিবী দুলে উঠবে, ঝিম-ঝিম ক'রে উঠবে সর্বাঙ্গ ; তারপর আর ভাবতে পারে না, দুরন্ত ভয়ে পিছিয়ে যায় কয়েক পা।

হিজল বিলে মা-মনসার আটন। পদ্মাবতী হিজল বনের পদ্ম-শালুকের বনে বাসা বেঁধে আছেন। চাঁদো বেনের সাত ডিঙা মধুকর সমুদ্রের বুকে ঝড়ে ডুবিয়ে এইখানে এনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। বৃন্দাবনের কালীদহের কালীনাগ কালো ঠাকুরের দণ্ড মাথায় করে কালীদহ ছেড়ে এসে এখানেই বাসা বেঁধেছে। কালীনাগ বলেছিল—তুমি তো আমাকে দণ্ড দিয়ে এখান থেকে নির্বাসন দিলে ; কিন্তু আমি যাব কোথায় বল? ঠাকুর বলেছিলেন—ভাগীরথীর তীরে হিজল বিল, সেখানে মানুষের বাস নাই, সেখানে যাও। বিশ্বাস না হয় বর্ষার সময় গঙ্গার বন্যায় যখন হিজল বিল আর গঙ্গা এক হয়ে যায় তখন গঙ্গার বুকের উপর নৌকা চ'ড়ে হিজলের চারিপাশে একবার ঘুরে এসো। দেখবে জল-জল, আর জল ; উত্তর-দক্ষিণে, পূর্বে-পশ্চিমে, জল ছাড়া মাটি দেখা যায় না, জলের উপর জেগে থেকে ঝাউ আর দেবদারুর মাথাগুলি। দেখো আকাশে পাখী উড়ে চলেছে—চলেছে তো চলেইছে। পাখী ভেরে আসছে, তবু সে গাছগুলির মাথার উপর বসছে না, কখনও কখনও খুব ক্লান্ত পাখী গাছের চারিদিকে পাক দিয়ে ঘুরে হতাশকণ্ঠে যেন মরণ-কান্না কেঁদে আবার উড়ে

যেতে চেষ্টা করে। কেন জান? গাছের মাথাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। শরীর তোমার শিউরে উঠবে। হয়তো ভয়ে ঢ'লে প'ড়ে যাবে। মা-মনসার ব্রতকথায় মর্ত্যের মেয়ে বেনেবেটী মায়ের দক্ষিণমুখী যে মূর্তি দেখেছিল—সেই মূর্তি মনে পড়ে যাবে। মা বলেছিলেন বেনের মেয়েকে—'সব দিক পানে তাকিয়ো, শুধু দক্ষিণ দিক পানে তাকিয়ো না।' বেনের মেয়ে নাগলোক থেকে মর্ত্যধামে আসবার আগে দক্ষিণ দিকের দিকে না তাকিয়ে দেখে থাকতে পারে নি। তাকিয়ে দেখেই সে ঢ'লে প'ড়ে গিয়েছিল। মা-মনসা বিষহরির ভয়ঙ্করী মূর্তিতে দক্ষিণ দিকে মৃত্যুপুরীর অন্ধকার তোরণের সামনে অজগরের কুণ্ডলীর পদ্মাসনে বসেছেন—পরনে তাঁর রক্তাম্বর, মাথায় পিঙ্গল জটাজুট, পিঙ্গল নাগেরা মাথায় জটা হয়ে দুলছে, সর্বাঙ্গে সাপের অলঙ্কার, মাথায় গোখুরা ধরেছে ফণার ছাতা, মণিবন্ধে চিত্রিতা অর্থাৎ চিতি সাপের বলয়, শঙ্খিনী সাপের শঙ্খ, বাহুতে মণি নাগের বাজুবন্ধ, গলায় সবুজ পান্নার কণ্ঠীর মত হরিদ্রক অর্থাৎ লাউডগা সাপের বেষ্টনী, বুকে দুলছে কালনাগিনীর নীল অপরাজিতার মালা, কানে দুলছে তক্ষকের কর্ণভূষা, কোমরে জড়িয়ে আছে চন্দ্র-চিত্র অর্থাৎ চন্দ্রবোড়ার চন্দ্রহার, পায়ে জড়িয়ে আছে সোনালী রঙের লম্বা সরু কাঁড় সাপ পাকে পাকে বাঁকের মত; সাপেরা হয়েছে চামর, সেই চামরে বাতাস দিচ্ছে নাগকন্যারা। বিষের বাতাস। সে বাতাসে মায়ের চোখ করছে ঢুলুঢুলু। মায়ের কাঁধে রয়েছে বিষকুম্ভ, সেই কুম্ভ থেকে শঙ্খের পানপাত্রে বিষ ঢেলে পান করছেন, আবার সেই বিষ গলগল ক'রে উগরে ফেলে বিষকুম্ভকে পরিপূর্ণ করছেন। মায়ের পিঠের কাছে মৃত্যুপুরীর তোরণে অন্ধকার করছে থমথম।

এই রূপই যেন তুমি দেখতে পাবে গাছের দিকে তাকালে। দেখবে

হয়তো গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটি জড়িয়ে ফণা তুলে ফুঁসছে বিশাল-ফণা এক দুধে গোখরো। শকুনি গৃধিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য সে অহরহ প্রস্তুত হয়ে আছে। তারপর তাকাও ডালে ডালে। দেখবে, পাকে পাকে জড়িয়ে কি যেন সব নড়ছে, দুলছে, কখনও বা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সাপ, সব সাপ। বন্যায় ডুবেছে হিজলের ঘাসবন, সাপেরা উঠেছে গাছের ডালে ডালে। কত নূতন কালীনাগ—কত দেশ থেকে গঙ্গার জলে ভেসে আসতে আসতে হিজলের ঝাউডাল দেবদারু-ডাল জড়িয়ে ধ'রে ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। খুব সাবধান! চারি-পাশের জলের স্রোতে সতর্ক দৃষ্টি রেখো, হয়তো ছপ ক'রে নৌকার কিনারা জড়িয়ে ধরবে স্রোতে ভেসে চলা সাপ। গাছের তলাগুলি সযত্নে এড়িয়ে চলো; হয়তো উপর থেকে ঝপ ক'রে খ'সে পড়বে—সাপ। হয়তো পড়বে তোমার মাথায়। 'শিরে হৈলে সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথা?'

হিজল বিলে মা মনসার আটন পাতা আছে—জনশ্রুতি মিথ্যা নয়।

প্রাচীন কবিরাজ শিবরাম সেন হিজলের গল্প বলেন।

সে আমলের ধন্বন্তরী-বংশে জন্ম ব'লে বিখ্যাত ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্য শিবরাম সেন। ধূর্জটি কবিরাজকে লোকে বলত—সাক্ষাৎ ধূর্জটি অর্থাৎ শিবের মত আয়ুর্বেদ-পারঙ্গম। ধূর্জটির 'সূচিকাভরণ' মৃতের দেহে উত্তাপ সঞ্চার করত। লোকে বলে—মৃত্যু যখন এসে হাত বাড়িয়েছে তখনও যদি ধূর্জটি কবিরাজের 'সূচিকাভরণ' প্রয়োগ করা হ'ত, তবে মৃত্যু পিছিয়ে যেত কয়েক পা, উদ্যত হাত গুটিয়ে নিত কিছুক্ষণের জন্য বা কয়েক দিনের জন্য। নিয়তিকে লঙ্ঘন করা যায় না, কবিরাজ কখনও সে চেষ্টা করতেন না, তবে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর 'সূচিকাভরণ' প্রয়োগ ক'রে মৃত্যুকে বলতেন—'তিষ্ঠ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।'

'স্ত্রী আসছে পথে, শেষ দেখা হওয়ার জন্য অপেক্ষা কর।' এমনই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন 'সূচিকাভরণ' এবং সে প্রয়োগ কখনও ব্যর্থ হয় না। সাপের বিষ থেকে তৈরি ওষুধ 'সূচিকাভরণ'—সূচের ডগায় যতটুকু ওঠে সেই তার মাত্রা। মৃত্যুশক্তিকে আয়ুর্বেদবিদ্যায় শোধন ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধায় পরিণত করতেন। সকল কবিরাজই চেষ্টা করে, কিন্তু তাঁর 'সূচিকাভরণ' ছিল অদ্ভুত। তিনি সাপ চিনতেন, সাপ দেখে তার বিষের শক্তি নির্ধারণ করতে পারতেন।

ওই হিজলের বিলের নাগ-নাগিনীর বিষ থেকে 'সূচিকাভরণ' তৈরি করতেন।

শিবরাম সেন গল্প করেন—তখন তাঁর বয়স সতেরো-আঠারো, দেশে তর্কপঞ্চাননের টোলে ব্যাকরণ শেষ করে আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য ধূর্জটি কবিরাজের পদপ্রান্তে গিয়ে বসেছেন। হঠাৎ একদিন আচার্য বললেন—হিজলে যাবেন। সূচিকাভরণের আধারটি হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেছে। নৌকায় যাত্রা। সঙ্গে শিবরামের যাবার ভাগ্য হয়েছিল।

হিজলের ধারে এসে গঙ্গার বালুচরে নৌকা বাঁধা হ'ল। শিবরামই বলেন, অসংখ্য নালা-খাল গঙ্গায় এসে পড়েছে ঘাসবনের ভিতর দিয়ে। ঘন সবুজ ঘাসবন। বাতাসে ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে—সবুজ ঘাসের উপর; সর্ সর্ শব্দ উঠছে যেন কোন অভিনব বাদ্যযন্ত্র বাজছে। ঝাউয়ের বনে শব্দ উঠছে সন্ সন্ সন্ সন্। আকাশে উড়ছে হাঁসের ঝাঁক। জনমানবের চিহ্ন নাই। হঠাৎ মাঝি বললে—খালের পালিতে কি একটা ভেস্তা আসছে কর্তা।

আচার্য কৌতূহল প্রকাশ করেন নাই। তরুণ শিবরাম কৌতূহল বশে নৌকার উপর উঠে দাঁড়িয়েছিল। বিস্মিত হয়েছিল—একটা বাচ্চা

চিতাবাঘের শব, তার উপরে কাক উড়ছে—মধ্যে মধ্যে বসছে, কিন্তু আশ্চর্য, খাচ্ছে না।

আচার্য বলেছিলেন—বিষ। সর্পবিষে মৃত্যু হয়েছে। ওর মাংস বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। খাবে না। হিজলের ঘাসবনে বাঘ মরে সাপের বিষেই বেশি।

হঠাৎ উঠেছিল পাখীগুলির আনন্দ-কলরব ছাপিয়ে কোন একটা পাখীর আর্ত চীৎকার। সে চীৎকার আর থামে না। যেন তিলে তিলে তাকে কেউ হত্যা করছে। এর অর্থ শিবরামকে ব'লে দিতে হয় নি। তিনি বুঝেছিলেন—সাপে ধরেছে পাখীকে।

শিবরাম এবং আরও দুজন ছাত্র চড়ার উপর নেমেছিল। আচার্য বলেছিলেন—সাবধান! সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলাফেরা ক'রো। জনশ্রুতি, হিজলের বিলে আছে বিষহরির আটন।

খাওয়া-দাওয়ার পর নৌকা ঢুকল একটা খালের মধ্যে। দু ধারে ঘাসবন দুলছে, মানুষের চেয়েও উঁচু ঘন জমাট ঘাস বন।

শিবরাম বলেন—সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময় যেন ওই ঘাসবনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। পাশের ঘাসবন থেকে ছপ ক'রে একটা মোটা দড়ি আছড়ে পড়ল। একটা সাপ। কালো—একেবারে অমাবস্যা রাত্রির মেঘের মত কালো তার গায়ের রঙ, সুকেশী সুন্দরীর তৈলাক্ত বেণীর মত সুগঠিত দীর্ঘ আর তেমনি তার কালো রঙের ছটা; জলে প'ড়ে একখানি তীরের মত গতিতে সে জল কেটে ছুটল। নৌকা থেমে গিয়েছে তখন। ওদিকে পিছনের ঘাসবনে আলোড়ন উঠেছে। তীরবেগে কিছু যেন ঘাসবন কেটে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ ঘাসবন থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। ওই কালো সাপের মতই গায়ের রঙ। খাটো মোটা কাপড়ে গাছকোমর বেঁধেছে। আর কিছু দেখবার সময় হ'ল না। সেও ঝপ ক'রে ঝাঁপ

দিয়ে পড়ল ওই জলে। শুধু পেলাম একটা বিচিত্র তীব্র গন্ধ, আর কানে এল কঠিন আক্রোশ-ভরা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের কয়টা কথা, ভাষা বিচিত্র কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর বাক্যগুলির ভাবার্থ। বললে—পালাবি? পলায়ে বাঁচবি? মুই তুর যম, মোর হাত থেক্যা পলায়ে বাঁচবি?

বললে ওই সাপটাকে। জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সেও চলল সাঁতার কেটে।

নালাগুলি অদ্ভুত আঁকাবাঁকা। একটা বাঁকের মুখে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার আচার্য এসে দাঁড়ালেন নৌকার ছইয়ের বাইরে। মুখে তাঁর প্রসন্ন সস্নেহ হাস্যরেখা। বললেন—চল বাবা মাঝি, চল। নাগটি খাঁটি কালোজাতের।

নৌকায় গতি সঞ্চারিত হতে হতে অদূরবর্তী বাঁকের মাথার ঘাসবন থেকে সেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, এবার কণ্ঠস্বরের মধ্যে বিজয়-হাস্যের তৃপ্তির সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।—ইবার? ইবারে কি হয়? দিব? দিব কষাটা নিঙুরে? এর পরই বেজে উঠল হাসি। কালো সাপটা যেমন এঁকেবেঁকে তীব্র গতিতে রেখা টেনে খালের জলকে চঞ্চল করে তুলেছিল তেমনি ধারা চঞ্চল হয়ে উঠল হিজল বিলের বায়ুস্তর, খিলখিল ক'রে হেসে উঠেছে মেয়েটি কোন কৌতুকে। হাসির শেষে তার কথা শোনা গেল—ইয়ে বাবা রে, ইয়ে বানাস্ রে! মুই কুথাকে যাব রে! গোসা করিছে, মোর কালনাগিনীর গোসা হল্‌ছে গো। ইরে বাবা রে, ফুঁসানি দেখ রে! আবার সেই খিল-খিল হাসি।

নৌকাখানা বাঁক ঘুরেছে তখন।

বাঁকের মাথায় জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে, তার হাতের মুঠোয় ভরা সেই কালো সাপটা। সাপটার মুখ নিজের মুখের সামনে ধ'রে সে তার সঙ্গে কথা বলছে। সাপটার জিভ লক্‌লক্ ক'রে বেরুচ্ছে; নিমেষহীন

তার চোখ দুটি মেলে রয়েছে একান্ত অসহায়ের মত। সাপটার সারা দেহটা শূন্যে ঝুলছে; যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে সে মেয়েটার হাতে পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে, জড়িয়ে ধরতে পারলে শ্বাস রুদ্ধ ক'রে নিষ্ঠুর পাকের পেষণে মেয়েটির নিটোল কালো নরম হাতখানির ভিতরের অস্থিদণ্ড দুটোকে ভেঙে গুঁড়ো ক'রে দেবে—ফুলের গাছের কচি ডালের মত। হাতের শিরা-উপশিরাগুলি নিরুদ্ধগতি রক্তের চাপে কেটে যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা তার ব্যর্থ চেষ্টা। ওই নরম হাতের মুঠিখানিতে লোহার সাঁড়াশির দৃঢ়তা। আর বিচিত্র কৌশল তার ধরার। বিদ্যুৎক্ষিপ্র আঁকাবাঁকা গতিতে সারা দীর্ঘ দেহখানা সঞ্চালিত ক'রে লেজ আছড়ে সাপটা যখনই চেষ্টা করছে বেদেনীর হাতখানাকে জড়িয়ে ধরবার, তখনই বেদের মেয়ের হাতেও একটা ক্ষিপ্রতর সঞ্চালন খেলে যাচ্ছে, একটা ঝাঁকি এসে সাপটার ক্ষিপ্র দেহ-সঞ্চালনে যেন ধাক্কা দিয়ে প্রতিহত ক'রে দিচ্ছে। মুহূর্তে শিথিল হয়ে যাচ্ছে তার দেহ। শিবরাম কবিরাজ বলেন—এ যেন বাবা নাঙ্গা, মানে—খোলা তলোয়ারধারী আর খাপে-ভরা তলোয়ারধারীর তলোয়ার খেলা। একবার তখন আমি বাবা মুর্শিদাবাদের গ্রামে কবিরাজি করি, বড় জমিদার ছিলেন সিংহ মশায়রা, তাঁরাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আমার গুরুর সুপারিশে। তাঁদের গৃহ-চিকিৎসক হিসাবে থাকি, গ্রামেও চিকিৎসাদি করি। সেই সময় একদিন রাত্রে ডাকাত পড়ল তাঁদের বাড়িতে। দেউড়িতে বাইরে দু'জন তলোয়ারধারী দারোয়ান, তারা জেগেই ছিল, খাপে তলোয়ার ঝুলছে—দুজনে কথাবার্তা বলছে—হঠাৎ তাদের সামনে একটা আ-বা-বা-আবা-বা-বা হুঙ্কার উঠল। আমি দেউড়ির সামনের রাস্তাটার ওপারে আমার ঘরে, তখনও চরকের পাতা ওল্টাচ্ছি। চমকে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে দপদপ ক'রে মশাল জ্ব'লে উঠল। মনে হ'ল যেন ওরা মাটি থেকে গজিয়ে উঠল।

মশালের আলোয় দেখলাম বাবা, দারোয়ান দুজনের সামনে দুজন খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দারোয়ানেরা খাপে-পোরা তলোয়ারের মুঠিতে হাত দিয়েছে কিন্তু যেই টানে, অমনি ডাকাতদের খোলা তলোয়ার দুলে উঠে। দারোয়ানদের হাত অবশ হয়ে যায়, খাপের তলোয়ার আবার মুঠি পর্যন্ত খাপে ঢুকে যায়—তলোয়ারখানাও যেন অবশ হয়ে গেছে। ডাকাতেরা খিল্‌খিল্ ক'রে হাসে। বলে—থাক্! যেমন আছে তেমনি থাক্; মরতে না চাস তো চাবি দে দেউড়ির। একজন দারোয়ান একটা ফাঁক পেয়েছিল। 'সরাৎ' একটা শব্দ হ'ল—সে বের ক'রেছে তলোয়ারখানা, কিন্তু তোলবার আর সময় পেলে না, ডাকাতের খোলা তলোয়ার মশালের আলোয় ঝলকে উঠল। ঝনাৎ শব্দে আছড়ে পড়ল দারোয়ানের বের করা তলোয়ারখানার ওপর, সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারখানা হাত থেকে খ'সে প'ড়ে গেল। ডাকাতটা বললে—হাত নিলাম না তোর রুটি যাবে বলে, নিলে মাথা নোব। দে, চাবি দে। সাপটার সঙ্গে বেদের মেয়েটার প্যাঁচের খেলাটা ঠিক তেমনি। সেদিন, মানে—ওই ডাকাতির রাত্রে আমার বাবা মনে পড়েছিল ওই ছবিটা। তাই বেদের মেয়েটার সেদিনের ছবি মনে প'ড়লে ওই খোলা তলোয়ার আর খাপে-পোরা তলোয়ারের খেলাটা মনে পড়ে যায়।

মেয়েটার সে কি খিল্-খিল্ হাসি!

হিজল বিলের ঘাসবনের উপর বাতাস বাধাবন্ধহীন খোলায় একটানা ব'য়ে যাচ্ছিল—তাতে খিল্-খিল্ হাসির কাঁপন ব'য়ে গেল, যেন কোন তপস্বিনী রাজকন্যার এলোচুলে যাদু-পুকুরের জলের ছিটে লেগে দীর্ঘ রুক্ষ নরম চুলের রাশি কোঁকড়া হয়ে গিয়ে ফুলে ফেঁপে দুলে উঠল।

ধূর্জটি কবিরাজ নৌকার মাথায় দাঁড়িয়ে ব'লে উঠলেন, আরে বেটী,

তুই! শবলা মায়ী! যাত্রা ভাল আমার, একেবারে মা-বিষহরির কন্তের সঙ্গে দেখা।

মেয়েটিও মুখ তুলে সুপ্রসন্ন বিস্ময়ে ঝলকে উঠল, সেও ব'লে উঠল, ই বাবা! ই বাবা গো! ধন্বন্তরী বাবা! আপুনি হেথা কোত্থেকে গো! ইরে বাবা!

শিবরাম অবাক হয়ে দেখছিলেন মেয়েটিকে। চিনতে দেরি হয় নাই, এ মেয়ে সাপুড়েদের মেয়ে, বেদেনী। কিন্তু এ বেদেনী আগের দেখা সব বেদেনী থেকে আলাদা। সাল বেদে, মাঝি বেদে, এরা তার দেশের মানুষ। এ বেদেনীর জাত আলাদা। চেহারাতে আলাদা, কথায় আলাদা, সাজে পোশাকে আলাদা, এমন বেদের মেয়ে নতুন দেখলেন শিবরাম তাঁর জীবনে। বেদেরা কালোই হয়, কিন্তু এমন মসৃণ উজ্জ্বল কালো রঙ কখনও দেখেন নি শিবরাম। তেমনি কি ধারালো গড়ন! মেয়েটির বয়স অবশ্য অল্প, কিন্তু বেশি বয়স হ'লেও একে দূর থেকে মনে হবে কিশোরী মেয়ে। ছিপছিপে পাতলা গড়ন, দীর্ঘাঙ্গী, মাথায় এক-রাশি চুল রুখু কালো করকরে কোঁকড়া চুল, খুলে দিলে পিঠের আধখানা ঢেকে চামরের মত ফাঁপা হয়ে বাতাসে দোলে, কোঁকড়া চুল টেনে সোজা করলে এসে পড়ে জানুর উপর কালো রঙের মধ্যে চিক্‌চিক্ করছে তিন অঙ্গে চার ফালি তুলির রেখায় টানা সাদা রেখা। কালো চুলের ঠিক মাঝখানে পৈতের সুতোর মত লম্বা সিঁথিটি, ধারালো নাকটির দুপাশে নরুন দিয়ে চেরা সরু অথচ লম্বা টানা পদ্মের একেবারে ভিতরের পাপড়ির মত দুটি চোখের সাদা ক্ষেত, আর ঠোঁটের ফাঁকে ছোট সাদা দাঁতের সারি। পরনে লালরঙে ছোপানো তাঁতে বোনা খাটো মোটা রাঙা শাড়ি, গলায় পদ্মবীজের মালা, তার সঙ্গে লাল সুতো দিয়ে ঝুলছে মাদুলি, পাথর আরও অনেক কিছু; হাতের মণিবন্ধ খালি, উপর হাতে

লাল সুতোর তাগা টান ক'রে বাঁধা, নরম কালো হাতের বাইরে যেন কেটে ব'সে গেছে। তাতেও মাদুলি পাথর জড়িবুটি। গাছ-কোমর বাঁধা পরনের ভিজে কাপড় হিলহিলে দেহখানির সঙ্গে সেঁটে লেগে রয়েছে; মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, যেন দুলছে। নৌকাখানা আর একটু এগিয়ে যেতেই নাকে একটা তীব্র গন্ধ ঢুকল এসে শিবরামের। মেয়েটি যখন ঘাসবন ঠেলে সাপটার পিছনে বেরিয়ে এসে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, তখন মুহূর্তের জন্য এই গন্ধ নাকে এসে পৌঁছেছিল। শিবরাম বুঝলেন এ গন্ধ ওর গায়ের গন্ধ। শরীরটা যেন পাক দিয়ে উঠল। যারা বন্য, যারা পোড়া মাংস খায়, তেল মাখে না, তাদের গায়ে একটু গন্ধ থাকে। মাল মাঝি বেদেদের গায়েও গন্ধ আছে, কিন্তু তাতে এই তীব্রতা নাই। এ যেন ঝাঁজ!

অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিলেন শিবরাম। বেদের মেয়ে, কিন্তু এমন বেদের মেয়ে তিনি দেখেন নি।

"—হি—, কন্যে রইছিস্ গঃ! হি—গঃ—!"

একটা করকরে রুক্ষ মোটা গলার ডাক ভেসে এল। ওই মানুষের চেয়ে উঁচু ঘাসবনের থেকে কেউ ডাকছে।

মেয়েটা ডান হাতে ধ'রেছিল সাপটা। বাঁ হাতের ছোট তালুখানি মুখের পাশে ধ'রে গঙ্গার খোলা দিকটা আড়াল ক'রে প্রদীপ্ত হয়ে সাড়া দিয়ে উঠল—হি—গঃ! হেথাকে—গঃ! 'হাঙরমুখীর' প্যাটের বাঁকে গঃ! ত্বরিতি এস গঃ! দেখ্যা যাও, দেখ্যা যাও, পা চালায়ে এস গঃ!

কণ্ঠস্বরে উল্লাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল। ব্যগ্র দৃষ্টিতে ঘাসবনের দিকে চেয়ে সে বললে—বুড়া অবাক হয়্যা যাবে গ বাবা!

স্মিতহাস্য ফুটে উঠল ধূর্জটি কবিরাজের মুখে। তিনিও দৃষ্টি ফেরালেন ঘাসবনের দিকে। ঘাসবন চঞ্চল হয়ে উঠেছে; দুলছে দুপাশে হেলে

স্নুয়ে পড়ছে ঘাসবন—সবল দ্রুতগতিতে চ'লে আসছে কেউ বুনো দাঁতালের মত। সবিস্ময়ে প্রতীক্ষা করছিলেন শিবরাম। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল মানুষটার মাথা, পাকা দাড়ি গোঁফ ও ঝাঁকড়া চুলে ভরা মানুষের মুখ, রঙ ঘন কালো, চোখে বন্য দৃষ্টি। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে, চোখের বন্য দৃষ্টি বিস্ময়ে বিচিত্র হয়ে উঠল; সস্মিতবিস্ময়ে পুলকিত কণ্ঠে সেও ব'লে উঠল—ধন্বন্তরী বাবা!

কবিরাজ বললেন—ভাল আছ মহাদেব? ছেলেপুলে পাড়া ঘর তোমার সব ভাল?

তাঁর কথা শেষ হতে হতে ঘাসবন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সেই মহাদেব। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত গামছার মত একফালি একটা মোটা কাপড়ের আবরণ শুধু, নইলে নগ্নদেহ এক বন্য বর্বর। গলায় হাতে তাবিজ জড়িবুটি কালো সুতোয় বাঁধা, আর গলায় দুলছে একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা। তারও গায়ে ওই উৎকট তীব্র গন্ধ। বৃদ্ধ, তবু লোকটা খাড়া সোজা। দেহখানা যেন শ্যাওলা-ধরা অতি প্রাচীন একটা পাথরের দেওয়াল, কালচে সবুজ শ্যাওলায় ছেয়ে গিয়েছে, কতকালের শ্যাওলার স্তরের উপরে শ্যাওলার স্তর, কিন্তু এখনও শক্ত অটুট রয়েছে। নির্বাকবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তরুণ শিবরাম। হ্যাঁ, এই বাপের ওই বেটীই বটে।

বেদে কিন্তু সাধারণ মাল বা মাঝি বেদে নয়। সাঁতালীর বিষ-বেদে। সাঁতালী ওদের গ্রামের নাম। ওই হিজল বিলের ধারে ভাগীরথীর চর-ভূমির ঘাসবন ঝাউবন দেবদারু গাছের সারির আড়ালে ওই হাঙরমুখী নালার ঘাট থেকে চ'লে গেছে একফালি সরু পথ, দু'দিকে ঘাসবন মাঝখানে পায়ে পায়ে রচা পথ এঁকেবেঁকে চ'লে গিয়েছে ওই বিষ-বেদেদের সাঁতালী গ্রামের মাঝখানে বিষহরি মায়ের 'থান' অর্থাৎ স্থান পর্যন্ত।

গ্রামের মাঝখানে ওই দেবস্থানটিকে ঘিরে চারি পাশে বিচিত্র বসতি। দেবদারু ডালের খুঁটোর উপর চৌকো আকারের মাচা—মাচাটির চারি পাশে ঝাউ-ডালের বেড়ায় পাতলা মাটি প্রলেপ দেওয়া, দেওয়ালের উপর ওই ঘাসবনের ঘাসে ছাওয়া চাল, এই ওদের ঘর। প্রতি বৎসরই ঝড়ে উড়ে যায়, বর্ষায় গ'লে পড়ে, শুধু নিচের শক্ত মাচাটি টিকে থাকে। গঙ্গায় বন্যা আসে, ঘাস বন ডুবে যায়, হিজল বিল আর গঙ্গায় এক হয়ে যায়, সাঁতালী গাঁ জলে ডোবে, মাচাগুলি জেগে থাকে, বড় বন্যা হ'লে তাও ডোবে, তখন গেলে দেখতে পাবে ঝাউগাছের ভেলার উপর, নৌকার উপর বিষ-বেদেরা সেই অথৈ বন্যার মধ্যে ভাসছে। বন্যার জল নেমে যায়, মাটি জাগে, ভিজে পলির আস্তরণ প'ড়ে যায়, বিষ-বেদেরা নৌকা এবং ভেলার উপর থেকে নেমে আসে, মাচার মেঝের পলি কাদা পরিষ্কার করে, দেওয়ালের খ'সে-পড়া কাদার আস্তরণ আবার লাগায়, ছোট ছেলেমেয়েরা কাদা ঘেঁটে মাছ ধরে, কাঁকড়া ধরে, দেবদারুগাছে আঁকশি লাগিয়ে শুকনো কাঠ ভেঙে আনে, বিলে ফাঁদ পেতে হাঁস ধরে, গুল্‌তি ছুঁড়েও মেরে আনে, আবার সাঁতালীর ঘরে ঘরে উনানের ধোঁয়া ওঠে, ওদের ঘরকন্না আবার শুরু হয়ে যায়। তারপর চলে এক দফা নৌকা নিয়ে সাপ ধরার কাজ। ওই যে হিজল বিলের চারি পাশে ঝাউ-গাছের উঁচু ডালে, দেবদারুর মাথায়, বন্যায় ভেসে এসে নানান ধরনের সাপেরা আশ্রয় নেয়, ওরা সেই সব সাপ দেখে দেখে প্রায় বেছে বেছে ঝাঁপি বোঝাই করে। ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না সাপেরা। দেবদারুর মাথায় যে দুধে-গোখরো ফণা তুলে আকাশের উড়ন্ত শকুন বা গাঙচিল বা বড় বড় বাজের ঠোঁট নখকে উপেক্ষা করে, সে দুধে-গোখরো ঠিক বন্দী হয়ে এসে ঢোকে ওদের ঝাঁপিতে। যে ঘন সবুজ রঙের লাউডগা সাপটা গাছের পাতার সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে

সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না, সেও ঠিক ওদের চোখে পড়বে, এবং তাকে ধরে পুরবে ওদের ঝাঁপিতে। ভোরবেলা সূর্য যখন সবে পূবের আকাশে লালি ছড়িয়ে উঠি-উঠি করে, তখন ওরা নৌকার উপর দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গাছের মাথার দিকে। উদয়নাগেরা এবার বেরিয়ে ফণা মেলে দাঁড়াবে, দুলবে, দিনের দেবতাকে প্রণাম ক'রে আবার লুকিয়ে পড়বে গাছের পাতার আবরণের অন্ধকারের মধ্যে। তারাও ধরা পড়বে ওদের হাতে। কালো কেউটের তো কথাই নাই। কাল-নাগিনী ওদের কাছে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। তারাই ওদের ঘরের লক্ষ্মী, কালনাগিনীই ওদের অন্ন যোগায়, কালনাগিনী বিষ-বেদেদের কন্যে। ওই কালনাগিনীর বিষ থেকেই হয় মহাসঞ্জীবনী—সূচিকাভরণ! সেও মা-বিষহরির বর। রাত্রির মত কালো কালনাগিনী, সুন্দরী সুকেশী মেয়ের সুচিক্কণ তৈলমসৃণ চুলে রচনা করা বেণীর গঠন আর তেমনি তার কালো রঙের দীপ্তি। কালো কেউটে অনেক জাতের আছে, কালোর উপর শ্বেত সরষের মত সাদা ছিট আছে যে কেউটের কালো গায়ে, সে কেউটে জেনো শামুকভাঙা কেউটে। যে কেউটের গলায় কণ্ঠিমালার মত, যার গায়ের কালো রঙের চেয়েও ঘন কালো রঙের দুটি দাগের বেড় আছে, সে জেনো কালীদহের কালীনাগের জাত। কালনাগিনী শুধু কালো। তার লেজ খানিকটা মোটা। বেহুলা জাঁতি দিয়ে কেটে নিয়েছিল তার লেজের খানিকটা। কালনাগিনীর নাগের জাত নাই। অন্য নাগের জাতের সন্তান প্রসব করে কালনাগিনী। তাই থেকে হয়েছে নাকি নানা জাতের কেউটের সৃষ্টি। মা-বিষহরির ইচ্ছায় ওরই মধ্যে দুই-চারিটি কন্যা একেবারে রক্ত গায়ের জাত নিয়ে জন্মায়, কাল-নাগিনীর ধারা অব্যাহত রাখবার জন্য। কালনাগিনী চেনে ওই বিষ-বেদেরা। ওদের ভুল হয় না। ধূর্জটি কবিরাজ জানেন সে তথ্য।

তাই তিনি বিষ-বেদেদের কাছ ছাড়া অন্য বেদের কাছে সূচিকাভরণের উপাদান সংগ্রহ করেন না। সেই কারণেই তাঁর সূচিকাভরণ সাক্ষাৎ সঞ্জীবনী!

আর ভাগীরথীর কূলে হিজল বিলের পাশে মা-মনসার আটনের পাট-অঙ্গনে সাঁতালী গাঁয়ের চারিপাশেই কালনাগিনীর বাসভূমি। তাই তো বিষ-বেদেরা এই ঘাস বনের মধ্যে বন্যার জলে পাঁকাল মাটির উপরেই বাস করে পরমানন্দে। বন্যায় কাদা হয়। ঘাস পচে, ভ্যাপসা গন্ধ হয়, মশায় মাছিতে ভন ভন করে চারিদিক, ঘাস বনের মধ্যে বাঘ গর্জায়, হিজল বিলের অসংখ্য নালায় কুমীর ঘুরে বেড়ায়, হাঙর আসে, কামঠ আসে, তারই মধ্যে ওরা বাস ক'রে চলেছে। এখান ছেড়ে বিষ-বেদেরা স্বর্গেও যেতে চায় না। বাপরে বাপ, এখানকার বাস কি ছাড়া যায়! মা বিষহরির সনদ দেওয়া জমি—এ জমির খাজনা নাই। লোকে বলে অমুক রাজার রাজত্বি—ও গাঁয়ের ওই জমিদারের এলাকা, কিন্তু বিষ বেদেদের খাজনা আদায় নিতে আজও কোন তশিলদারের নৌকা হাঙরমুখীর নালা বেয়ে সাঁতালী গাঁয়ের ঘাটে এসে পৌঁছে নাই। হুকুম নাই—মা বিষহরির হুকুম নাই। বেদেদের 'শিরবেদে' সমাজের সমাজপতি বুড়ো মহাদেব বলে—মা বিষহরির হুকুম নাই। তার সনদে মোরা ঘর বাঁধলাম হেথাকে এসে। চম্পাই নগরের ধারে সাঁতালী পাহাড়ে ছিষ্টির আদিকাল থেকে বাস ছিল—শতেক পুরুষের বাস—জাতে ছিলাম বিষবৈদ্য—সে বাস গেল্‌ছে, সে জাত গেল্‌ছে, মা লক্ষ্মী ছেড়ে গেল্‌ছেন—তার বদলে পেয়েছি মা বিষহরির সনদে কালনাগিনী কন্যে, মা গঙ্গার পলি পড়া জমির ওপর এই লতুন সাঁতালী গাঁয়ের জমি, এ ছেড়ে কোথাকে যাব?

দুই

বলে—সে এক বিচিত্র উপাখ্যান।

জয় বিষহরি গ! জয় বিষহরি গ!
চাঁদো বেনে দণ্ড দিল
তোমার কৃপায় তরি গ!
অ—গ!
চম্পাই নগরের ধারে
সাঁতালী পাহাড় গ!
অ—গ!
ধন্বন্তরির 'মন্তে' বাঁধা
সীমেনা তাহার গ!
অ—গ!
'বিরিখ্যে ময়ূর বৈসে
'গত্তে গত্তে' নেউল গ!
অ—গ!
বিষবৈদ্য বৈসে সেথায়
'বাণ্ডুলা বাউল' গ!

অ—গ!

ধন্বন্তরি সাঁতালী পাহাড়ের 'সীমেনায় সীমেনায়' গণ্ডী কেটে দিয়েছিলেন মন্ত্র পড়ে। ভূত পেরেত পিশাচ রাক্ষস ডাইন ডাকিনী বিষধর সেখানে ঢুকতে পারত না। বিশেষ ক'রে বিষধর, নাগ-নাগিনী, বিচ্ছু-বিছা, পোকা-মাকড়, ভিমরুল-বোলতা এরা ঢুকলে কি সীমানার

মধ্যে পা দিলে নিশ্চিত মরণ ছিল। ময়ূরে নেউলে টুকরা টুকরা ক'রে কেটে ফেলত, ধন্বন্তরি পৃথিবীর গাছপালা লতাপাতা-ফুল-মূল খুঁজে, সাত-সমুদ্দুরের তলা থেকে, স্বর্গলোকের ধন্বন্তরির বাগান থেকে পেয়েছিলেন যত 'বিষঘ্নী অর্থাৎ বিষঘ্ন গাছ-গাছড়া সব এনে তার বীজ ছড়িয়েছিলেন এই সাঁতালী পাহাড়ের মাটি-পাথরের গায়ে গায়ে। ঈশের মূলে থেকে বিশল্যকরণী পর্যন্ত। তার গন্ধে সাঁতালী পাহাড়ের বাতাস ভারী হয়ে থাকত। সাঁতালী পাহাড়ের নুড়ি পাথরের মধ্যে বিষ পাথর থাকত ছড়িয়ে, সমুদ্দুরের ধারের বালির উপর ছড়ানো ঝিনুক শামুক শাঁকের মত। বিষ পাথর বিষ শুষে নেয় মাটির জল শুষে নেওয়ার মত। সেই 'বিষঘ্নী' জড়িবুটি লতাপাতার গন্ধে বিষধরেরা চেতনা হারিয়ে নেতিয়ে পড়ত শিকড় কাটা লতার মত, বিষ পাথরের আকর্ষণে তাদের কষ বেয়ে মুখের থলির বিষ গলে বেরিয়ে আসত।

ধন্বন্তরি শিষ্যদের ওপর ভার দিয়েছিলেন সাঁতালী পাহাড়ের। চাঁদ সদাগর ধন্বন্তরীর মিতা—বিষহরির বিবাদী সে—দিয়েছিল সাঁতালী পাহাড়ে নিষ্কর বসবাসের ছাড়পত্র। ধন্বন্তরির শিষ্য বিষবৈদ্যরা সমাজে আসন পেত আদর পেত সম্মান পেত, অচ্ছুৎ ছিল না, বিষঘ্ন লতা পৈতের মত পরতে পেত গলায়। তবু তারা ছিল বিবাগী বাউল; বিষ-চিকিৎসার মূল্য নাই—অমূল্য এ বিদ্যা, ধনলোভীর এ বিদ্যা নিষ্ফল, তারা দক্ষিণা নিত না মূল্য নিত না—নিত যৎসামান্য দান।

তুরা খাস গো সুধার মধু মোরা খাইব বিষ গ!

অ—গ!

তুদের ঘরের কাল সপ্য মোদের গলায় দিস গ!
অ—গ!
আর দিস গো ছেঁড়া বস্তর মুষ্টি মেপ্যা চাউল গ!
অ—গ,
গুরুর আজ্ঞায় বিষবৈদ্য বাগুলা বাউল গ!
অ—গ!

মর্ত্যধামের অধিকারী সাতডিঙা মধুকরের মালিক চাঁদো বেনে শিবভক্ত; তবু বাদ করলে শিবকন্যে বিষহরির সঙ্গে। চ্যাঙমুড়ি কাণি, চ্যাঙমাছের মত মাথা, এক চোখ কাণা, সাপের দেবতা বিষহরি মনসাকে কিছুতেই দেবে না পূজো। আরম্ভ হল যুদ্ধ, দেবতার সঙ্গে মর্ত্যের অধিকারী সমাজের মাথার মণির বাদ! মহাজ্ঞান গেল, ধন্বন্তরি গেলেন, বিষবৈদ্যেরা হায় হায় করে উঠল, গুরু গেল—অন্ধকার হয়ে গেল তাদের জীবন, মন্ত্রের পাপড়ি ভেঙ্গে গেল। চাঁদো বেনের ছয় ছয় বেটা গেল। বিষবৈদ্যদের শিরবৈদ্য তারও গেল একমাত্র কন্যা। অপরাজিতা ফুলের কুঁড়ির মতো কালো বরণের কচি মেয়ে, নূপুর পায়ে দিয়ে বাপের বাঁশির তালে তালে নাচছিল, হঠাৎ টলতে লাগল, তারপর পড়ে গেল—মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙল, আর উঠল না। মন্ত্রতন্ত্র জড়িবুটি সব হয়ে গেল মিছে। আকাশ থেকে মা মনসা হাঁক দিয়ে বললেন—যে বিষ তোরা বিষহরির অনুচর নাগ-নাগিনীর বিষ নষ্ট করতে তাদের জীবন নিতে সাঁতালী পাহাড়ের চারিদিক ছেয়ে রেখেছিস—সেই বিষেই গেল তোর কন্যের জীবন।

সাপের বিষের ওষুদ ওই সব লতাপাতা, সেও যে বিষ। যে বিষে

বিষক্ষয় করে, সে বিষও যে সাক্ষাৎ মৃত্যু। কোন লতাতে ধরেছিল রাঙা ফল—কচি মেয়ে সেই টুকটুকে ফল তুলে খেয়ে তারই বিষে প্রাণ হারালে।

তুমি পুতলে বিষ বিরিঞ্চি ফল খাইবে কে?

শিরবৈদ্য বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল। হায় হায় করে উঠল বৈদ্যপাড়া। বললে—

"মরুক মরুক চাঁদো বেনে মুণ্ডে পড়ুক বাজ গ!

অ—গ!

এত দেবতা থাকতে হৈল মনসার সঙ্গে বাদ গ!

অ—গ!

ছয় পুত্র গিয়েছে, ধন্বন্তরি গিয়েছে, মহাজ্ঞান গিয়েছে, সাতডিঙা মধুকর গিয়েছে, তবু যার জ্ঞান হয় নাই, তাকে এসব কথা বলা মিছে। আবার ঘরে জন্মেছে চাঁদের মত 'লখিন্দর'—গণকে বলেছে বাসরে হবে সর্পাঘাত। তবু না। তবু চাঁদো বেনে ভেঙে দিলে সনকার পাতা মনসার ঘট তার হিন্তাল কাঠের লাঠির ঘায়ে। তবু সে লখিন্দরের বিয়ের আয়োজন করলে সায় বেনের কন্যে বেহুলার সঙ্গে। সাতালী পাহাড়ে কামিলা দিয়ে তৈরি করলে লোহার গড়—তার মধ্যে লোহার বাসর-ঘর। সেই রাত্রে পালটে গেল বিষবৈদ্যদের ভাগ্য। সে কি রাত্রি। আকাশে মেঘ জমেছে, সেই মেঘের পুরীতে মা বিষহরির দরবার বসেছে। অন্ধকার থমথম করছে। সেই থমথমে অন্ধকারের মধ্যে বিষবৈদ্যদের লাল চোখ আঙরার টুকরোর মত জ্বলছিল, মধ্যে মধ্যে শিরবৈদ্য তার গম্ভীর গলায় হাঁকছিল—কে? কে যায়? সাতালী পাহাড়ের গাছ-পালার ডালপালা সে হাঁকে দুলে উঠছিল, গাছের ডালে ডালে ময়ূরেরা উঠছিল পাখসাট মেরে—গর্তে গর্তে নেউলেরা মুখ বার ক'রে রোঁয়া

ফুলিয়ে নরুনের মত ধারালো সাদা দাঁত বের করে গর্জে উঠছিল সেই হাঁকের সঙ্গে।

মনসার নাগেরা এসে দূর থেকে দেখে থমকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাথা হেঁট করে ফিরে যাচ্ছিল। আকাশে মেঘ ঘন থেকে ঘন হয়ে উঠছিল—বিষহরির ভ্রূকুটির ছায়া পড়ছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ঘন ঘন, মায়ের চোখে ঝিলিক মেরে উঠছিল ক্রোধের ছটা।

এমন সময় সাঁতালীর সীমানার ধারে করুণস্বরে কে কেঁদে উঠল। মেয়েকণ্ঠের কান্না। শুধু মেয়েকণ্ঠই নয়, কচি মেয়ের কণ্ঠস্বর; দুরন্ত ভয়ে সে যেন পৃথিবী আকুল ক'রে কেঁদে উঠেছে!

বাঁচাও গো! ওগো বাঁচাও গো! আমাকে বাঁচাও গো!

সর্দার বসে ঝিমছিল। সে চমকে উঠল। কে?.. কে এমন ক'রে কাঁদে! কচি মেয়ে কে রে?

—মরে গেলাম! মেরে ফেল্‌লে! ও-গো—! শেষের দিকে মনে হল সে চীৎকারে আকাশে ঘন মেঘও যেন চিড় খেয়ে গেল, পৃথিবী কেঁদে উঠল।

সর্দার হেঁকে উঠল—ভয় নাই—ভয় নাই!

হাতের চিমটে নিয়ে সে ছুটে এগিয়ে গেল। বিষবৈদ্যদের তখন অস্ত্র ছিল—বড় বড় লোহার চিমটে, ডগায় ছিল শূলের মত ধার, সে চিমটে দিয়ে নাগরাজকে ধরলেও তার নিস্তার ছিল না। মাথার দিকে থাকত কড়া—চলার সঙ্গে সঙ্গে সে কড়াটা চিমটের দণ্ডের গায়ে আছড়ে পড়ে যন্ত্রবাদ্যের মত বাজত—ঝনাৎ ঝন্—ঝনাৎ ঝন—ঝনাৎ!

সাঁতালী পাহাড়ের সীমানার ধারে ঠিক ওপারে আট-দশ বছরের ছোট একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। শীতের শেষে উত্তুরে-বাতাসে অশ্বত্থপাতা যেমন থর থর করে কাঁপে, তেমনি ভাবে কাঁপছে আর চোখে মুখে তার সে কি ভয়!

—ভয় কি সাধে! হিজল বিলের ধারের ভাগীরথীর চরের উপর ঘাসবনের ভিতর বেদের গাঁ—সাঁতালী গাঁয়ের শিরবেদে সে-কালের উপাখ্যান বলতে বলতে নড়ে চড়ে বসে। তার দুই কাঁধের মোটা মোটা হাড়গুলো নড়ে নড়ে ওঠে বুকের ভিতরের আবেগে; চোখ ওদের ছোট—নরুন দিয়ে চেরা লম্বা সরু চোখও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। বলে—সাঁতালীর সীমানা বরাবর তখন উপরে নীচে যেন গর্জনের তুফান উঠেছে। গাছের উপরে ডালে ডালে ঝটাপট ঝটাপট শব্দ উঠছে, ময়ূরগুলোর পাখসাটের যেন ঝড় উঠছে, ক্যাঁও ক্যাঁও শব্দে সব চমকে উঠছে, নীচে মাটিতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গিয়েছে রোঁয়া ফুলিয়ে নেউলরা, ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দে রব তুলেছে, উপরে ময়ূরেরা মধ্যে মধ্যে দু'পায়ের নখ মেলে ঠোঁট লম্বা করে পাক দিয়ে উড়ে এ ডাল থেকে ও ডালে গিয়ে বসছে, নেউলগুলোর দাঁতের সারি বেরিয়ে পড়েছে—তাতে ক্ষুরের ধার, অন্ধকারের মধ্যেও আবছা দেখা যাচ্ছে সাদা দাঁতের সারি। আক্রোশ যেন ওই কচি মেয়েটার উপর। ঝাঁপিয়ে পড়লে টুকরো টুকরো করে ফেলবে লহমায়। শুধু অপেক্ষা মেয়েটার পা বাড়াবার।

শিরবেদে এসে দাঁড়াল থমকে। এ কি আশ্চর্য রূপের কন্যে! এ কি রূপ! ন-দশ বছরের মেয়ে, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, আঁধার রাত্রেও জলের তলার মানিকের মত ঝিকমিক করছে, হিলহিলে লম্বা; ঝকমকে সাদা দুটি চোখ! তেমনি কি নরম ওর গড়ন, যেন কচি লতা, যেন কালো রঙের রেশমি উড়ানি, ওকে যদি কাঁধে ফেলে কেউ, কি গলায় জড়ায় তবে লেপ্‌টে জড়িয়ে যাবে।

মেয়েটা কাঁপছিল; সঙ্গে সঙ্গে যেন নেতিয়েও পড়ছিল, সাঁতালী পাহাড়ের শিরবেদের মনে হল—শিকড়-কাটা একটি কচিশ্যামলতা যেন নেতিয়ে পড়ছে! মেয়েটা শিরবেদের দিকে আশ্চর্য চাউনিতে চেয়ে

বললে—ও বাবা, আমাকে বাঁচাও বাবা গো! শিরবৈদ্য, ও বাবা আমাকে বাঁচাও! বাবা গো—

শিরবৈদ্য কেঁপে উঠল! মনে পড়ে গেল মরা মেয়েকে। সেও এমনি করে শিকড়-কাটা লতার মত নেতিয়ে পড়েছিল! চোখের উপরে দেখতে দেখতে 'আম্‌লে' মানে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তার কণ্ঠের স্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর কণ্ঠে সে ডাকলে—বাবা গো!

আর থাকতে পারলে না শিরবৈদ্য।—মা! মা গো! বলে দু হাত মেলে পা বাড়ালে। সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরগুলো মাথার উপর চীৎকার করে উঠল, নেউলেরা চীৎকার করে শিরবৈদ্যের পথ আগলে দাঁড়াল। গোটা সাঁতালী পাহাড় যেন শিউরে উঠল। চাঁদ বেনে হিন্তাল কাঠের লাঠি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—সে চীৎকার করে উঠল—কে?

শিরবৈদ্য থমকে দাঁড়াল। তার হুঁস ফিরে এল।

কে? কে এ অপরূপ কালো মেয়ে! ময়ূরেরা কেন হায় হায় বলে চীৎকার করে উঠল, নেউলেরা কেন না-না বলে পথ আগলে দাঁড়াল। কেন শিউরে উঠল সাঁতালী পাহাড়ের মন্ত্রপূত মাটি!

গাঙের কূলের ঘাসবনের সাঁতালী গাঁয়ের শিরবেদে এ কাহিনী বলতে বলতে বলে—বিষবৈদ্যেরা তখন বিষবেদে হয় নাই ধন্বন্তরি বাবা। তখন তারা ছিল সিদ্ধবিদ্যের অধিকারী, মন্তরের ছিল মহিমা, সেই মন্তরের বলে, বিদ্যের বলে, বুঝতে পারত জীব-জন্তু পশু-পাখীর বাক্, তখন তাদের মন্তরের বলে গাছ উড়ত আকাশে, গাছে চড়ে মন্তর পড়ে বলত—চল উড়ে, মাটি-পাথর চড় চড় করে ফাটিয়ে শিকড়বাকড় নিয়ে গাছ হু হু করে আকাশে উঠত, মন্তর পড়ে গণ্ডী এঁকে দিলে সে

গণ্ডী পার হয়ে কারুর যাবার হুকুম ছিল না, হোক না কেন দেবতা, হোক না কেন দত্যি, যক্ষ বল, রক্ষ বল, কারুর না। শিরবৈদ্য বুঝতে পারলে ময়ূর, নেউলের বাক্, সাঁতালীর মাটির শিউরে ওঠা। হুঁস ফিরল তার, থমকে দাঁড়াল, ভুরু কুঁচকে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল, শুধালে—কে তু? অাঁ?

মেয়েটা তখন ভুঁইয়ের উপর বসে পড়েছে—নেতিয়ে পড়েছে। টলছে, বিসর্জনের প্রতিমার মত টলছে। তবু সে কন্তে কোন মতে বললে—তিন ভুবনে আমার ঠাঁই নাই, তিন ভুবনে আপন নাই; ছিল শুধু মা; সে-ও আমাকে দিলে তাড়িয়ে। মায়ের কাজ করতে নারলাম, তাই দিলে তাড়িয়ে। তোমার নাম শুনেছি, তোমার কাছে এসেছি ঠাঁইয়ের জন্যে। তুমি যদি ঠাঁই দাও তো বাঁচি, নইলে আমাকে—

হাঁপাতে লাগল সে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বললে—এই নেউলে আর ওই ময়ূরেরা আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে গো! তা ছাড়া এখানকার বাতাসে কি রয়েছে,—আমার দম বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে!

শিরবৈদ্য এবার চিনলে। বুকে তার কন্যের শোক, চোখে তার ওই কালো মেয়েটার রূপের ছটার ধাঁধা—তবু সে চিনতে পারলে। কালো মেয়ের দাঁত কি মিহি, কি ঝকঝকে, আর মুখ থেকে কি কটু বাস বেরিয়ে আসছে! বিষবৈদ্যের কাছে কতক্ষণ লুকানো থাকবে কালকূটের গন্ধ?

দু'পা পিছিয়ে এল শিরবৈদ্য।

সর্বনাশী—কালনাগিনী! পালা, পালা তুই, পালা! নইলে তোর পরান যাবে আমার হাতে! ওই মোহিনী কন্যে মূর্তি না ধরে' এলে এতক্ষণে তা যেত!

তখন মেয়েটা এলিয়ে পড়ে গিয়েছে ধুলোর উপর। অন্ধকার রাত্রে একছড়া কালোমানিকের হারের মত পড়ে আছে, আকাশের বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে!

শিরবেদে মহাদেব কাহিনী বলতে বলতে থেমে যায় এইখানে। একটুখানি হাসি তার মুখে ফুটে ওঠে। মাথা নেড়ে অসহায়তা জানিয়ে আবার বলে, দেবতার সহায় 'নেয়ত', 'নেয়তের' হাতে মানুষ হল পুতুলনাচের পুতুল বাবা! যেমন নাচায় তেমনি নাচি।

'চাঁদো বেনের সঙ্গে বিষহরির লড়াইয়ে নিয়তি বিষহরির সহায়; শিবের ভক্ত চাঁদ, মহাজ্ঞানের অধিকারী চাঁদ নাচলে পুতুলের মত। লখিন্দর জন্মাল বাবা, নিয়তি তার কপালে 'লেখন লিখলে'। তাকে এড়িয়ে যাবে শিরবৈদ্যি—সে সাধ্যি তার কোথায়? হয় তো সাধ্যি হ'ত যদি থাকত গুরুবল—ধন্বন্তরি থাকতেন বেঁচে। এই ছলনায় ছলবার তরে নিয়তি আগে থেকে ছক সাজিয়ে রেখেছে। কন্যে দিয়েছিল, সেই কন্যেকে কচিকালে কেড়ে নিয়েছে, বুকের মধ্যে তেষ্টা জাগিয়ে রেখেছে, তার পরেতে কালনাগিনীকে ছোট মেয়েটি সাজিয়ে এই কালো রজনীতে তার ছামনে দাঁড় করিয়েছে। তবু শিরবৈদ্য আপন গুরুবলে বিদ্যেবলে তাকে চিনতে পেরে দু'পা এল পিছায়ে। তখন বাবা মোক্ষম ছলনা এল।'

শিরবৈদ্য দেখতে পেলে আর একটি মূর্তি। ছায়ার মতন। ওই নেতিয়ে পড়া কালনাগিনীর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা সে হল সাক্ষাৎ নিয়তি, মহামায়ার মায়া! একেবারে শিরবৈদ্যের সেই মরা কন্যে। এবারে শুধু শিরবৈদ্যই ভুললে না বাবা, সাক্ষাৎ নিয়তির ছলা, তাতে ভুলল সবাই, ময়ূরেরা ভুলল, নেউলেরা ভুলল, সাঁতালী পাহাড়ের মন্তর-পড়া মাটি, সেও ভুলল;—সবাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল সেই

ছায়ার মত মূর্তিটির দিকে। সেই কন্যে, শিরবৈদ্যর দুলালী, যে ময়ূরদের সঙ্গে নাচত, নেউলেরা যার পায়ে মাথা ঘষত, যার পায়ের মলের ঝমঝমানিতে সাঁতালী পাহাড়ের মন্তর-পড়া মাটি তালে তালে দুলে উঠত,—সেই কন্যে। অবিকল! 'তিল থুতে' তফাৎ নাই। সেই! সেই!

সে মেয়ে এবার ডাকলে—বাবা!

শিরবৈদ্য এবার হা করে কেঁদে উঠে দুহাত মেলে দিয়ে বললে, আয়-আয় ওরে আমার হারানিধি—ওরে আমার কন্যে আয় মা, আমার বুকে আয়।

কন্যে মূর্তি ধরে নিয়তি বললে,—কি করে যাব বাবা! এ যে আমার ছায়ামূর্তি! নূতন মূর্তিতে তোমার বুকে জুড়াব বলে এলাম,—কিন্তু তুমি যে আমাকে নিলে না বাবা।

শিরবৈদ্যের চোখ দিয়ে জল গড়ালো, ময়ূরেরা বিলাপ করে উঠল, নেউলেরা ফোঁসানি ছেড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, গাছের পাতাপল্লব থেকে টপ টপ করে ঝরতে লাগল শিশিরের ফোঁটা।

কন্যে বললে,—নতুন জন্মে আমি নাগকুলে জন্ম নিয়েছি বাবা। এই তো আমার নতুন কায়া, এই তো পড়ে রয়েছে সে কায়া, সাঁতালীর সীমানায় কালো রত্নহারের মত। তুমি যদি বুকে নাও তবেই ওই কায়ায় থাকতে পাব, নইলে আবার মরতে হবে।

বলতে বলতে ছায়ামূর্তি যেন এলিয়ে গলে মিলিয়ে গেল—ওই কালো মেয়ের অচেতন দেহের মধ্যে। মানুষের ছলা মানুষের মায়া,—এ ছেঁড়া যায়, কাটা যায়, দেবমায়াও বুঝা যায় বাবা, নিয়তির মায়া, সে বুঝবার সাধ্যি এক আছে শিবের, আর কারুর নাই।

শিরবদ্যি ভুলল; সে পাগলের মত ছুটে গিয়ে তুলে নিলে কাল-

নাগিনীর কন্যে-মূর্তি-ধরা দেহখানি। মনে হল বুক যেন জুড়িয়ে গেল। নাগিনীর অঙ্গের পরশ বড় শীতল যে! বিষবৈদ্যের দেহে তেমনি জ্বালা। বিষ খেয়ে সে ঝিমোয় সারা অঙ্গে মাখে বিষহরা ওষুধের রস, গলায় হাতে তার জড়িবুটি, তেল মাখা বারণ; দেহ তার আগুনের মত তপ্ত। নাগিনীর শীতল পরশে দেহ জুড়ালো, মনে হ'ল বুকও যেন জুড়িয়ে গেল। শিরবৈদ্য আরও জোরে বুকে জড়িয়ে ধরলে কন্যের দেহখানি। কথায় আছে—ম'রে মানুষ জ্বালা জুড়ায়। তা বাবা, নাগিনীর দেহ অঙ্গে জড়ালে ভাবতে হয়—মরণ ঠাণ্ডা বেশি, না, নাগিনী শীতল বেশি।

—তারপর?

প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে হাসে গঙ্গার চরের সাঁতালীর শিরবেদে। ঘাড় নাড়ে গূঢ় রহস্যোপলব্ধির আনন্দে নিরাসক্তের মত। বলে—তারপর যা হবার তাই হল, কন্যের মুখে চোখে দিলে মন্ত্রপড়া জল, ওষুদের গন্ধ সহ্য করবার মত ওষুদও দিলে দুধের সঙ্গে। ময়ূরদের বললে—যা যা চলে যা! হুস্—ধা! নেউলদের বললে—যা তোরাও যা! বলে শিস মেরে দিলে ইশারা!

মেয়ে চোখ মেললে! বললে—তুমি আমার বাপ!

শিরবৈদ্য বললে—হ্যাঁ মা হ্যাঁ। তার পর বললে—কিন্তু আমাকে কথা দে মা—আমাকে কখনও ছেড়ে যাবি না।

—না-না-না! তিনসত্যি করলে কালোকন্যে। বললে—তোমার ঘরে আমি চিরকাল থাকব, থাকব, থাকব। তোমার ঘরে ঝাঁপিতে থাকব নাগিনী হয়ে, তোমাদের বংশে জন্মাব আমি কন্যে হয়ে। তুমি বাঁশি বাজিয়ে আমাকে নাচাবে—আমি নাচব।

শিরবৈদ্য বললে—আকাশে সাক্ষী রইল দেবতারা, মর্ত্যে সাক্ষী রইল

নেউলেরা, ময়ূরেরা, আর এই সাঁতালীর গাছপালা। যদি চলে যাস তবে আমার বাণে হবে তোর মরণ।

—হ্যাঁ তাই।

এইবার শিরবৈদ্য তাকে পরিয়ে দিলে তার সেই মরা মেয়ের অলঙ্কারগুলি। পায়ে দিলে মল, গলায় দিলে লাল পলার মালা, হাতে দিলে শঙ্খের কঙ্কণ, তারপর তুলে নিলে তার বাঁশি। বাঁশের বাঁশি নয়, অন্য বাঁশি নয়, এই তুমড়ি বাঁশি। আর সেই মেয়ে নাচলে নাচন। দুলে দুলে পাক দিয়ে দিয়ে, সে নাচন বিষবৈদ্যের মেয়ে আর নাগকন্যে ছাড়া আর কেউ জানে না। নাচতে নাচতে এসে শিরবৈদ্যের গলা জড়িয়ে ধরে দুলতে লাগল। তার নিঃশ্বাস পড়তে লাগল শিরবৈদ্যের নাকের কাছে। নাগিনীর নিঃশ্বাস অন্যের কাছে বিষ—কিন্তু বিষবৈদ্যর কাছে দুঃখহরা চিন্তাহরা আসব। আমরা বাবা সাপের বিষ খেয়ে নেশা ক'রে যে সুখ পাই—হোক না কেন হাজার কড়া মদ, সে সুখ পাই না। শিরবৈদ্য বুক ভ'রে নিঃশ্বাস টানতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতের তুমড়ি বাঁশির সুর এলিয়ে পড়তে লাগল, চোখ দুটি ঢুলতে লাগল, সারা গা টলতে লাগল, পায়ের তলায় মাটি দুলতে লাগল, শেষ খসে পড়ল হাতের বাঁশি।

এবার নাগিনী গান ধরলে গুনগুনিয়ে—ঘুমপাড়ানী গানের মত—বিষছড়ানী গান।

"বাসুকী দোলায় মাথা দোলে চরাচর রে—
তুই ঢল ঢলে পড় রে!
সমুদ্র মন্থনে দোলে ও সাত সাগর রে—
তুই ঢল ঢলে পড় রে!
অনন্ত উগারেন সুধা তাই হলাহল রে—
ও তুই ঢল ঢলে পড় রে!

সে সুধা ধরেন কণ্ঠে ভোলা মহেশ্বর রে—
তুই ঢল ঢলে পড় রে!

ভোলার চক্ষু ঢুলুঢুলু অঙ্গ টলমল রে—
তুই ঢল ঢলে পড় রে!

অনন্ত শয্যায় শুয়ে ঘুমান ঈশ্বর রে—
তুই ঢল ঢলে পড় রে!

বাবা অমন ঘুমের ওষুদ আর নাই। ভোলানাথ মহেশ্বর হলেন মিত্যুঞ্জয়, মিত্যুকে জয় করলে কি ঘুম তার কাছে আসে? আসে না। মিত্যুর 'ছেঁয়া' হল ঘুম। তোমার আমার অঙ্গের যেমন ছেঁয়াতে তোমার আমারই আকার পেকার—মিত্যুর 'ছেঁয়াতে'ও তাই তারই ছোঁয়াচ। নিথর করে দেবে, সব ভুলিয়ে দেবে। তা মিত্যুর ছেঁয়া ঘুম মিত্যুঞ্জয়ের চোখে কি পেকারে আসবে বল? আসে না। মিত্যুও নাই ঘুমও নাই। সদাই জেগে আছেন শিব। কিন্তু ওই নিঃশ্বাসের নেশায় সদাই আধঘুমে ঢুলুঢুলু করছেন—মনে কিছুই নাই, সব আছেন ভুলে। আবার দেখ বাবা—ঈশ্বর—তিনি পাতেন অনন্ত শয্যা—ক্ষীরোদ সাগরে। অনন্ত নাগের শয্যা ভিন্ন ঘুম আসে না। ঈশ্বরকে ঘুম পাড়ায় বাবা ওই নিঃশ্বাস। সেই নিঃশ্বাসে ঢলে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল শিরবৈদ্য। শুধু সে কেন? গোটা সাঁতালী পাহাড়! ময়ূরের পাখা হল নিথর, নেউলের দেহ পড়ল নেতিয়ে, সাঁতালীর লতাপাতা ঝিম হয়ে রইল। তখন বের হল সেই ছোট কালোমেয়ে। খুলে ফেললে শিরবৈদ্যের দেওয়া গয়নাগুলি। নিঃশব্দে চলল এগিয়ে। নিঃশব্দে কিন্তু তীরের মত বেগে। বাসর ঘরের লোহার পাচিলে কামিলে রেখেছিল। ছিদ্র—সেখানে গিয়ে ধরলে নিজের মূর্তি। দাঁড়াল ফণা ধরে, লকলক

ক'রে খেলতে লাগল জিভ, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ছিদ্র বড় হতে লাগল—কয়লার গুড়ো খসে পড়ল।

—তারপর ?

—তারপর তো তোমরা সব জান গো! জান্তে না শুধু বিষ-বৈদ্যদের এই কথাকটি! কি ক'রে জানবে বল? ঘটল রাত্তিরের আঁধারে। সাক্ষী তো কেউ ছিল না। আর বিশ্বাসই বা কে করবে বল? সকালে যখন বেহুলার কান্না শুনে চাঁদ সদাগর ছুটে এল ডাঙশ-খাওয়া হাতীর মত, এসে দেখলে—সোনার লখিন্দর নাই। কাঁদছে বেহুলা, পড়ে আছে নাগিনীর লেজের একটা টুকরো। তখন সর্বাগ্রে সে ছুটে এসেছিল বিষবৈদ্যদের পাড়ায় শিরবৈদ্যের আঙনেতে। তখনও সে ঘুমে অচেতন।

লাথি মারলে চাঁদ। হিন্তালের লাঠি দিয়ে দিলে গোঁচা! শিরবৈদ্য জাগতেই তাকে বললে—তুই নেমকহারাম। তুই বিশ্বাসঘাতী! তুই পাপী! তুই সাহায্য না করলে, তুই পথ না দিলে পথ পায় কি ক'রে নাগিনী ?

শিরবৈদ্য স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল বণিক মহাশয়ের মুখের দিকে। শুধু একবার দেখে নিলে চারিপাশ। কোথায় কালোমেয়ে? কেউ কোথাও নাই, শুধু ক'খানা অলঙ্কার পড়ে রয়েছে চারিদিকে ছড়িয়ে।

মায়া! ছলনা! নিয়তি!

মাথা হেঁট করলে সে দণ্ড নেবার জন্যে।

চাঁদো বেনে শাপান্ত করলে।

বাক্য দিয়ে বাক লঙ্ঘন করেছিস, বিশ্বাস করেছিলাম—সে বিশ্বাসকে হনন করেছিস, তুই—তোর জাত বাক্যহন্তা বিশ্বাসহন্তা। যে বাক্ দিয়ে বাক্ রাখে না তার জাত থাকে না। বিশ্বাস করলে যে বিশ্বাসকে হনন

করে তার দণ্ড নির্বাসন। সাঁতালী পাহাড়ে যে নিষ্কর সনদ দিয়েছিলাম সে হল বাতিল, এই পাহাড় থেকে—এই সমাজ থেকে—এই দেশ থেকে তোদের ঠাঁই আমি কেড়ে নিলাম। শিবের আজ্ঞায় রাজা নিলেন কেড়ে। তোদের বাস গেল জাত গেল মান গেল লক্ষ্মী গেল। শিবের আজ্ঞা, আমার শাপান্ত! তোদের কেউ ছোঁবে না, ছোঁওয়া জিনিস নেবে না, বসতির মধ্যে ঠাঁই দেবে না।

চলে গেল সদাগর। সাত পুত্রের শোক বুকে নিয়ে সে তখন পাথর, তার সে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে শিরবৈদ্যের সাহস হ'ল না যে বলে—সদাগর, তোমার সাতটি গিয়ে যেমন বুক খালি হয়েছে, আমার একটি গিয়েই তেমনি বুক খালি হয়েছে। বিশ্বাস যদি না কর তো, তোমার বুকে হাত দিয়ে আমার বুকে হাত দাও,—তাপ সমান কি-না দেখ! সে বাক্যহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওদিকে তখন চম্পাই নগরে হায় হায় উঠেছে। দুয়ারে দুয়ারে লোক জমেছে, নদীর ঘাটে কলার মাঞ্জাস বাঁধা হচ্ছে; লখিন্দরের দেহ নিয়ে বেহুলা জলে ভাসবেন; মরা লখিন্দরের প্রাণ ফিরে পেলে তবেই ফিরবেন, নইলে এই ভাসা মরণলোকে ভাসা!

"জলে ভেসে যায় রে সোনার কমলা!"
হায় গ! হায় গ!
কঠিন নাগিনী তোর দয়া হল না!
হায় গ! হায় গ!

বিষবৈদ্যের জাতি ছিল, কুল ছিল, মান ছিল, খাতির ছিল কিন্তু লক্ষ্মী ছিল না। চিরটা দিন বাণ্ডুলা বাউল, ওষুধের মূল্য নাই, মন্ত্র-গুণের দক্ষিণা নাই। ভগবানের 'ছিষ্টি আর গুরুর দান'—এ-বিক্রি ক'রে

কি মূল্য নিতে আছে, না এ-দুয়ের মূল্য সোনায় রূপায় হতে পারে। নিয়ম হ'ল—'বিষে জীবন যায়' এ সংবাদ যদি কাকের মুখে পাও তো কাককে শুধাবে কোথায়, কার? তারপরে ঘরের চিঁড়ামুড়ি খুঁটে বেঁধে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করবে সেই দিকে। পরান ফিরায়ে দিয়ে ফিরে আসবে ঘর। খালি হাতে যাত্রা খালি হাতে ফেরা। তাদের ঘরে লক্ষী হবে কোথা থেকে বল? চিরদিনই তারা গরীব। শুধু ছিল জাতি, কুল, মান—তাও গেল সমাজের শিরোমণি লক্ষীশ্বর চাঁদোবেনের শাপে! ব্রহ্মার সৃষ্টির প্রথম থেকে সাঁতালী-পাহাড়ে বসতের 'শাসন-পত্র', তাও হয়ে গেল দেবচক্রে নিয়তির ছলনায় বাতিল। বিষবৈদ্যদের রূপ ছিল সাধুসন্ন্যাসীর মত, তাদের অঙ্গের জড়ি-বুটি ওষুধের গন্ধ বিষধরের কাছে অসহ্য কিন্তু মানুষের কাছে সে গন্ধ দিব্য-গন্ধ বলে মনে হ'ত! তাদের রূপে পড়ল কালি, দিব্য-গন্ধ দুর্গন্ধ হয়ে উঠল চাঁদোরাজার শাপে। লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে সাঁতালী ছেড়ে, জড়িবুটির বোঝা সাপের ঝাঁপি আর মাটির ভাঁড় সম্বল করে বেরিয়ে পড়ল। সাঁতালীর সীমানা পার হয়ে—যেখানে শিরবৈদ্য প্রথম দেখেছিল সেই মায়াবিনী কালো কন্যে-মূর্তি-ধরা কালনাগিনীকে সেইখানে এসে থমকে দাঁড়াল শিরবৈদ্য; মনে পড়ল সব। সে আক্ষেপ করে চীৎকার করে উঠল—আঃ মায়াবিনীরে! তোর ছলাতে সব হারালাম, তোকেও হারালাম? বাক্ দিয়ে বাকভঙ্গ করলি সব্বনাশী!

কাঁধের বাঁকে ঝুলানো ঝাঁপি থেকে শিষ দিয়ে কে যেন বলে উঠল—না বাবা, না! আমি আছি—তোমার সঙ্গেই আছি।

ঝাঁপি খুলতেই মাথা তুলে দুলে উঠল কালোমানিকের হারের মত ঝলমলানো ছটা নিয়ে কালনাগিনী কালো কন্যে। ছপাৎ ক'রে ছোবল দেওয়ার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল শিরবৈদ্যের বুকের দিকে। শিরবৈদ্য তাকে

জড়িয়ে নিলে গলায়। নাগিনী মাথা তুলে দুলতে লাগল শিরবৈদ্যের কানের পাশে। ফোঁস-ফুঁসিয়ে কানে কানে বললে—নাগের বাক্যে দেব-বাক্যে তফাৎ নাই। বাক্ দিলে সে বাক্ ফেরে না। চাঁদের আজ্ঞায় তোমাদের বাস ভূমি গিয়েছে, মা বিষহরির আজ্ঞায় তোমরা পাবে নতুন বাসের ঠাঁই। গঙ্গার বুকে ভাসাও নৌকা; মা-গঙ্গা স্বর্গের কন্যে, পৃথিবীর বুকে বেয়ে গেলেও পৃথিবীর বাইরে। গঙ্গার জল যত দূর পর্যন্ত মাটি ঢেকে দেয় তত দূর মা-গঙ্গার সীমানা। গঙ্গার ধারে পবিত্র পলিপড়া চরের উপর যেখানে তোমার পছন্দ সেইখানেই ঘর বাঁধ। চাঁদের আজ্ঞা সেখানে খাটবে না। তোমাদের জাতি নিলে কুল নিলে চাঁদ, মা-বিষহরি তোমাদের দিলেন নতুন জাত, নতুন কুল। তোমরা কারুর ভাত খাবে না, তোমাদের জল তোমাদের ফুল মা-বিষহরি নেবেন মাথায়। এ জাত তোমার যাবে না। চাঁদের শাপে তোমাদের বর্ণ হয়ে গেল কালি বর্ণ, মায়ের ইচ্ছায় ওই কালি বর্ণে ফুটে উঠবে আমার বর্ণের ছটা! আর মা দিয়েছেন ধন্বন্তরির বিদ্যার উপরে নতুন মন্ত্র, যে মন্ত্রে পৃথিবীর জন্তু-জানোয়ার সব বশ মানবে। নাগের দংশন সে যেমন হোক যদি বিধির লেখা মৃত্যু-দণ্ডের দংশন না হয়, তবে সে মন্ত্রে নাগের বিষ উড়ে যাবে কর্পূরের মত। আর মা দিলেন তোমাকে নতুন অধিকার, তুমি নিতে পাবে গৃহস্থের কাছে পেটের অন্নের জন্যে চাল, অঙ্গ ঢাকবার জন্য বস্ত্র। আর দিয়েছেন অধিকার আমার বিষের উপর—এই বিষ গেলে তুমি বিক্রি করবে বৈদ্যদের কাছে, তোমার হাতের গেলে-দেওয়া-বিষ তারা শোধন ক'রে নিলে হবে অমৃত। সে অমৃত সূচ-পরিমাণ দিলে মরতে-মরতে মানুষ বেঁচে উঠবে। বাক্-বন্ধের বাক্ ফুটবে, পঙ্গুর দেহে সাড় আসবে; আর বাবা, আমি হয়েছি কাল রাত্রে তোমার কন্যে, চিরকাল তাই থাকব। ঝাঁপিতে থাকব নাগিনী

মূর্তিতে, তুমি আমাকে নাচাবে আমি নাচব; তোমাদের ঘরে জন্মাব সত্যিকারের কন্যে হয়েও। তুমি শিরবেদে, তুমি আমাকে চিনতে পারবে আমার লক্ষণ দেখে। প্রথম লক্ষণ বাবা, পাঁচ বছরের আগে সে কন্যা বিধবা হবে, স্বামী মরবে নাগের বিষে। তারপর ষোল পর্যন্ত সে কন্যের আর বিয়ে দেবে না; ষোলবছরের আগে ফুটবে নাগিনী লক্ষণ। কাল রাত্রে আমার যেমন রূপ দেখেছ বাবা, ঠিক তেমনি রূপ। তার কপালে তুমি দেখতে পাবে 'চক্রচিহ্ন'। সেই কন্যে নেবে তোমাদের বিষহরির পূজোর ভার। তোমাদের কল্যাণ করবে সে, তোমার আজ্ঞাধীন হবে, তোমাকে জানাবে মা-বিষহরির অভিপ্রায়ের কথা। চল বাবা, ভাসাও নৌকা। আমি দেখাই তোমাকে পথ।

গাঙ্গুড়ের জলে রাত্রির অন্ধকারে নৌকা ভাসল।

দিনে সকালে বেহুলার মাঞ্জাস ভেসে গিয়েছে।

সমস্ত দিন অরণ্যে মুখ ঢেকে থেকে রাত্রে বিষবেদের নৌকা ভাসল—চলল চম্পাইনগর সাঁতালী পাহাড় দেশভুঁই ছেড়ে। গলুইয়ের উপর ফণা তুলে কালনাগিনী বলে এইবারে বাঁয়ে ভাও বাবা! এইবার ডাইনে। আকাশে মেঘ ওঠে, নাগিনী ফণা তুলে ধরে ছত্র। ওঠে ঝড়, নাগিনী বিষ-নিঃশ্বাসে দেয় উড়িয়ে। প্রভাত হয়, শিরবৈদ্য দেখে সারিবন্দী নৌকার অর্ধেক নাই। নাগিনী বলে, ওরা তোমাকে ছাড়লে বাবা। পতিত হয়ে ওরা থেকে গেল, মাটিতে ঠাঁই রইল না, এখানকার নদীতেই নৌকায় নৌকায় ফিরবে ওরা। পরের দিন সকালে যখন নৌকা পদ্মাবতীর মাঝামাঝি এল তখন দেখলে আরও অর্ধেক নৌকা নাই, রাত্রের অন্ধকারে অকূলে ভাসবার দুশ্চিন্তা সইতে না পেরে চুপি চুপি সঙ্গ ছেড়ে নৌকা বেঁধেছে কোন ঘাটে। তারাও থাকল সেখানে।

শেষ তিনখানা নৌকা এসে পৌঁছাল এই হিজল বিলের ধারে।

নাগিনী বললে—এইখানে আছে মা-বিষহরির আটন। এরই তলায় মা লুকিয়ে রেখেছিলেন চাঁদোর সাতডিঙ্গা মধুকর।

শিরবেদে বললে—তবে এইখানের ভুঁইয়ে ঘর বাঁধি?

—মা-গঙ্গার চরের উপর যেখানে খুশি সেইখানেই বাঁধতে পার। বাঁধ, এইখানেই বাঁধ। হিজল বিলের বুক থেকে নালা-খালার অন্ত নাই—এইখানের মুখে হাঙরের বাস—এর নাম হাঙরমুখী, ওর পাশে ওইটে হ'ল কুমীরখালা, তার ওদিকে হাঁসখালী।

এ বিলের নালা-খালার অন্ত নাই; কর্কটির খাল, চিতির নালা, কাঁদুনে গড়ানী। হিজলের যে দিকটা লোকে চেনে, এটা সে দিক নয়, সে দিকে আছে আরও কত নালা-খালা।

আমরা এইখানেই ঢুকলাম নৌকা নিয়ে।

তিনখানি নৌকা ঘাটে বাঁধা রইল। ঘাস বনের ভিতর মাচান বেঁধে উঠল। তিনখানি ঘরে নতুন সাঁতালী গাঁয়ের পত্তন হ'ল।

তিন ঘর থেকে তিরিশ ঘরের উপর বিষ-বেদের বসতি সাঁতালী।

শরতের প্রথমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। মেঘের গায়ে পেঁজাতুলোর বর্ণ ও লাবণ্য দেখা দিয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। দশদণ্ড রাত্রি পার হয়ে গিয়ে আকাশে কৃষ্ণা পঞ্চমীর চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিগন্তের দিকে; বড় বড় সাদা মেঘের খানা ভেসে যাচ্ছে। নিচে হিজল বিলে পদ্ম-শালুকের পানাড়ীর ফুল ঝলমল করছে। হিজলের ঘন সবুজ ঘাসবনে কাশফুল ফুটতে শুরু করেছে, এখনও ফুলে ফেঁপে দুধ বরণ সাদা হয়ে ওঠেনি। তার উপর পড়েছে জ্যোৎস্না।

হাঙরমুখীর বাঁকে বাঁকে ঘুরে সাঁতালীর ঘাটে যদি কেউ যেতে পারে —তবে দেখতে পাবে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশখানা নৌকা বাঁধা। নৌকায় নৌকায় আলো জ্বলছে: পিদিমের আলো। ঘাটে পৌছবার আগেই শুনতে পাবে বিচিত্র বাজনার শব্দ।

তুমড়ি বাঁশির একঘেয়ে শব্দের সঙ্গে—বিষম-ঢাকি বাজছে। তার সঙ্গে উঠছে ঝনাৎঝন-ঝনাৎঝন বিচিত্র ধাতব ঝঙ্কার। শরীর মন কেমন শির শির করে উঠবে সে বাজনা শুনে। তারই সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ঠিক তালে তালে সমবেত কণ্ঠের ধুয়া গান শুনতে পাবে—অ-গ-! অ-গ-!

আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে শুনতে পাবে মোটা ভরাট গলার গান—

"লাচো লাচো আমার কালনাগিনী কন্যে গ !"

অ-গ !

চুস্কু আমার সোনা হইল তু মানিকের জন্যে গ !"

অ-গ !

"কদমতলায় বাজে বাঁশি রাধার মন উদাসী গ !"

অ-গ !

"কালীদহে কালনাগিনী উঠল জলে ভাসি গ !"

অ-গ !

"মোহন বংশীধারীর আমার নয়ন মন ভোলে গ।"

অ-গ !

ঝাঁপ দিল কালো কানাই রাধা রাধা ব'লে গ ,"

অ-গ !

"কালোবরণ কালনাগিনী-কালো চাঁদের পাশে-গ।"

অ-গ !

"কালীদহের জলে যুগল নীলকমল ভাসে-গ !"

অ গ !

ঘাটে এসে বাঁধ নৌকা ! সাবধানে নেমো। অনেক বিপদ। সামনে পাবে এক-ফালি সরু পথ। দুপাশে ঘাস বন ; এঁকে-বেঁকে চলে গেছে রাস্তাটি ! ঝক ঝক করছে আজ রাস্তাটি। চেঁচে-ছুলে পরিষ্কার করেছে আজ। রাস্তায় দাঁড়ালেই পাবে ধুপের মিষ্ট গন্ধ। ধুপের সঙ্গে ওরা দেবদারুর আঠা আর মুথা ঘাষের গেঁড়ো শুকিয়ে গুঁড়ো করে মেশায়। বাজনা এবার উচ্চ হয়ে উঠেছে, একঘেয়ে সুরেই বেজে চলেছে।

ঝনাৎ ঝন—ঝনাৎ ঝন—ঝনাৎ ঝন।

চিমটের মাথায় কড়া বাজাচ্ছে ! বাজছে মন্দিরার মত তালে তালে, ঝনাৎ-ঝন !

ধুম-ধুম, ধুম-ধুম, ধুম-ধুম।

বিষম ঢাকি বাজছে।

বিচিত্র তুমড়ি বাঁশি বাজছে পুঁ-উ-উ ! পুঁ-উ-উ ! পু-উ-উ !

আজ ভাদ্রের শেষ নাগপঞ্চমী। বিষহরির আরাধনা করছে বিষবেদেরা। আজ ওদের শ্রেষ্ঠ উৎসব ! উৎসব হচ্ছে বিষহরির আঙনেতে। পূজা হয়ে গিয়েছে দিনে, এখন হচ্ছে গান। গোটা পাড়া গানের আসরে এসে বসেছে, সবাই গাইছে গান। মেয়ে পুরুষ সবাই। শ্রোতা নাই। এগিয়ে চল—শুনতে পাবে নারীকণ্ঠ—একা একটি মেয়ে গান গাইছে—

—"অ আমার সাত জন্মের বাপ গ—তোরে দিছি বাক-গ !"

সমবেত নারীকণ্ঠে এবার সেই ধুয়া ধ্বনিত হয়ে উঠবে "অ-গ" !

—"তোরে ছেড়্যা যাইলে আমার মুণ্ডে পড়বে বাজ গ !

—অ-গ !"

—"এ ঘোর সঙ্কটে তুমি রাখলে আমার মান্যে গ।

—অ-গ !"

—"জন্ম জন্ম তোমার ঘরে হইব আমি কন্যে গ !

—অ-গ !"

—"তোমার বাঁশির তালে তালে নাচব হেল্যা দুল্যা গ !

—অ-গ !"

—"আমার গরল হইবে সুধা তুমি বাবা ছুল্যে গ।

—অ-গ।"

এ গান গাইছে ওদের নাগিনী কন্যা।

কালনাগিনী ওদের ঝাঁপির মধ্যে থাকে। আবার ওদের ঘরে কন্যা হয়েও জন্মায়। বাক দিয়েছিল কালনাগিনী :

"তোমার বংশ তোমার ঝাঁপি হইল আমার ঘর গ !"

—অ-গ

"তুমি না করিলে পর হইব না মুই পর গ !"

—অ-মরি-মরি-মরি গ ; অ মরি মরি গ !

আজও সে বাকের অন্যথা হয় নাই। পাঁচ বৎসর বয়সের আগে সর্পাঘাতে বিধবা হয় যে কন্যে তার দিকে সকল বেদের চোখ গিয়ে পড়ে। বেদের ঘরে মেয়ের বিয়ের কাল হয় অন্নপ্রাশনের পরই। ছ-মাস থেকে তিনবছর বয়সের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যায়। বেদের ছেলে সাপ নিয়ে খেলা করে ; বেদেদের সাপ নিয়ে কারবার। মনসার কথায় আছে—"নরে নাগে বাস হয় না।" সাঁতালী গাঁয়ে সেই নরে-নাগে বাস। সেবার

মধ্যে অপরাধ হয়, নাগ দংশন করে; বিষহরির বরে—সে বিষ মন্ত্রবলে ওষুধের গুণে নেমে যায়। কিন্তু নিয়তির লেখায় যে দংশন হয় তার উপায় নাই। মৃত্যু এসে নাগের দন্তে আসন পেতে বসে; নাগের বিষের মধ্যে মিশিয়ে দেয় নিজের শক্তিকে। নৌকার মাঝি মরে জলে, কাঠুরে মরে গাছ থেকে ডাল ভেঙে প'ড়ে, যুদ্ধ যার পেশা সে মরে অস্ত্রাঘাতে।

শিরবেদে বলে—মিত্যু বহুরূপী বাবা। মানুষের 'ছেষ্ট' কামনার দব্য অন্ন জল তার মধ্যে দিয়েই সে আসে। বেদের মিত্যু সাপের মুখের মধ্যে দিয়ে আসবে তাতে আর আশ্চয্যি কি। তাই যারা মরে সাপের দংশনে তাদের পরিবার সবাই কিছু নাগিনী কন্যে হয় না। ধীরে ধীরে অঙ্গে লক্ষণ ফুটে ওঠে! বেদের জাতে বিধবার বিয়ে হয়, আবার ছাড় বিচারও আছে। কিন্তু এই সব কন্যের সাঙা ষোল বছরের আগে হয় না। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত চোখ থাকে এই কন্যেদের ওপর।

নূতন নাগিনী কন্যে দেখা দিলেই পুরানো নাগিনী কন্যেকে সরতে হয়। গাঁয়ের ধারে ছোট একখানি ঘরে গিয়ে আর জন্মের ভাগ্যের জন্যে মা-বিষহরিকে ধেয়ায়।

একজন শিরবেদের আমলে দু-তিন জন নাগিনী কন্যার আমল পার হয়।

তিন

কতজন শিরবেদের কাল চলে গেল, সে জানেন কালপুরুষ। সে কি মনে রাখার সাধ্য মানুষের? তবে মূল শিরবেদে ছিলেন বিশ্বম্ভর। তার নামটাই মনে আছে বেদেদের, বলে আদিপুরুষ বিশ্বম্ভর। বেদেকুলে জন্ম নিয়েছিলেন স্বয়ংশিব।

নিজে বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভর পৃথিবীকে দেন অমৃত। ঢুলুঢুলু করে তাঁর চোখ। শিরবেদে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে তার মিল অবিকল। এই বিশ্বম্ভরই জাতি কুল ঘর দুয়ার দিয়ে সাঁতালী গাঁয়ের পত্তন করেছিল। মায়ের আজ্ঞাতে আবার বিয়ে করেছিল বুড়া বয়সে। সন্তান হ'ল, কালো মেঘে ঢাকা চাঁদের মত সন্তান। কিন্তু কই? কালনাগিনী যে বলেছিল সে আসবে বেদেকুলে কন্যে হ'য়ে—সে এল কই? কন্যে না হয়ে এ যে হ'ল 'পুত্তু-সন্তান'! শিরবেদে বিশ্বম্ভর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে; কিন্তু বেদেদের বিধাতা হাসলেন। বিশ্বম্ভরের ছেলে, বারো বছর বয়স তখন, দেখে মনে হয় ষোল বছরের জোয়ান ছেলে। সাপ ধরে মাছের মত। গাছের উপর চড়ে তেড়ে ধরে বাঁদর। তেমনি তার ভেলকি বাজিতে হাত সাফাই! তাকে পাশে নিয়ে শিরবেদে একদিন বসে ওই কথাই ভাবছে, এমন সময়, এল কালো পাতলা এক চার বছরের মেয়ে, গামছা পরে ঘোমটা দিয়ে বউ সেজেছে। এসে দাঁড়াল সামনে, বিশ্বম্ভর হেসে বললে—কে গো? তুমি কাদের বউ? মেয়েটি পড়শীর মেয়ে, নাম দধিমুখী, সে ঘোমটা খুলে বিশ্বম্ভরের ছেলেকে দেখিয়ে বললে—উর বউ আমি। উকে বিয়ে করব। বিশ্বম্ভরের ভাবনা ভেসে গেল আনন্দের ঢেউয়ে। বললে—সেই ভাল! তুই হবি আমার বেটার বউ! বিশ্বম্ভরের যে কথা সেই কাজ। ধুমধাম

করে বিয়ে দিলে ছেলের। কিন্তু সাতদিন যেতে না যেতে নাগদংশনে গেল শিরবেদের সন্তানটি। বিশ্বম্ভর চমকে উঠল। বেটার জন্যে কাঁদল না, চোখ রাখলে দধিমুখীর উপর। ষোল বছর যখন ওই বিধবা কন্যেটির বয়স হল, কন্যেটির মা-বাপে আবার বিয়ে দেবার উদ্যোগ করছে, তখন একদিন এমনি বিষহরির পূজার দিনে শিরবেদে চীৎকার ক'রে উঠল—জয় বিষহরি!

তার ঢুলুঢুলু চোখের দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছে ওই কন্যের কপালে নাগচক্র। তার মুখখানাকে দু হাতে ধরে একদৃষ্টে দেখে বললে—হুঁ। হুঁ। হুঁ।

—কি?

—নাগচক্র!

—কই?

—কন্যের ললাটে!

বার বার ঘাড় নেড়ে বলে উঠেছিল—তাথেই তাথেই, এই এরে দিবে বলে মা মোর বলি নিলে কালাচাঁদকে!

তারপর চেঁচিয়ে উঠল—বাজা বাজা বাঁশি বাজা, বিষমঢাকি বাজা, চিমটে বাজা। ধুপ আর ধুনা আন, পিদিম আন, দুধ আন, কলা আন; মা-বিষহরির বারি তোল আটনে, আল্‌ছে আল্‌ছে, যে বাক দিয়েছিল, সে আলছে।

পাড়ায় তখন তিন ঘর বেদে। সে সেই প্রথম সাঁতালী পত্তনের কালের কথা।

তারপর কত শিববেদের আমল গেল সে ওদের মনে নাই। বলে—সে জানেন এক কালপুরুষ।

মনে আছে তিন জনা শিরবেদের কথা।

শিবরাম কবিরাজ বলেন—মহাদেব শিরবেদেকে দেখেছিলাম গুরু ধূর্জটি কবিরাজের সঙ্গে গিয়ে। গুরুর ওখানে ওরা আসত আশ্বিনের প্রথমে। গঙ্গার ঘাটে বেদেদের নৌকা এসে লাগত। ওদের রুখু কালো চুল, চিকণ কালো দেহ-বর্ণ, গলায় মাহুলি—তার সঙ্গে পাথর জড়ি-বুটি, ওদের মেয়েদের বিচিত্র রূপ, ওদের গায়ের গন্ধ বলে দিত ওরা বিষবেদে। ওদের নৌকার গড়ন—নৌকায় বোঝাই সাপের ঝাঁপির থাক, এক পাশে বাঁধা ছাগল, ছইয়ের মাথায় খুঁটিতে বাঁধা বাঁদর—এসব দেখলেই গঙ্গার তীরভূমির পথিকেরা থমকে দাঁড়াত। বলত—বেদে! বিষবেদের নৌকা।

ধূর্জটি কবিরাজ মহাশয়ের আয়ুর্বেদ ভবনে গম্ভীর গলায়—জয় বিষহরি! —হাঁক দিয়ে এসে দাঁড়াত বেদেরা। সকলের আগে থাকত মহাদেব।

জয় বিষহরি হাঁক দিয়েই আবার হাঁক দিত—জয় বাবা ধন্বন্তরি! তারপরই হাতের বিষমঢাকিতে টোকা মেরে শব্দ তুলত—ধুন-ধুন! তুমড়ি বাঁশিতে ফুঁ দিত—পুঁ-উঁ-উঁ! পুঁ-উঁ-উঁ। চিমটের কড়া বেজে উঠত—ঝনাৎ-ঝন!

প্রসন্নমূর্তি আচার্য বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেন প্রসন্ন মুখে; স্মিতহাসি ফুটে উঠত, সমাদর করেই তিনি বলতেন—এসেছ!

হাত জোড় করে মহাদেব বলত—যজমানের ঘর, আন্নদাতার আঙ্‌নে, প্রভু ধন্বন্তরি বাবার আটন, এখানে না এস্থা যাব কোথা? অন্ন দিবে কে? বাবা ধন্বন্তরি আপনকার পাথরের খল ছাড়া এ গরলই বা ফেলব কোথা? একে সুধা করবে কে শোধন ক'রে? জলে ফেলি তো জীবনাশ, মাটিতে ফেলি তো নরলোকের সব্বনাশ। আপুনি ছাড়া গতি কোথা বলেন।

শিবরাম কবিরাজ বলেন—আমি দেখলাম মহাদেব শিরবেদেকে। সে যেন এক ঘন অরণ্যের ভিতরের অটুট একটা পাথরের দেউল। কোন্ পুরাকালে কোন্ সাধক তার ইষ্টদেবতার মন্দির গড়েছিল,—বড় বড় পাথরের চাইয়ে গড়া মন্দির। কারুকার্য নাই, পলেস্তারা নাই, এবড়ো খেবড়ো গড়ন—যুগ যুগান্তরের বর্ষায় শ্যাওলা ধরেছে, তার উপর গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদ পড়ে শ্যাওলায় সবুজে সাদা খড়ির দাগ পড়েছে, মাথার উপরের গাছের পল্লব থেকে শুকনো পাতার গুঁড়ো—শুকনো ফুলের রেণু। বাতাসে বনের তলার ধুলো উড়িয়ে তা দিয়েও তাকে ধুলিধুসর করে তুলেছে। খাড়া সোজা এমন শক্ত কাঠামোর বুড়ো আমি আর দেখি নি, দেখে ওই উপমা ছাড়া আর কোন উপমা আমার মনে আসে না। গলায় হাতে জড়িবুটি মালা দেখে মনে পড়ে যেন দেউলের গায়ে উঠেছে বুনো লতার জাল। মাথায় ঝাকড়া চুলে মনে হয় দেউলটার মাথায় বর্ষায় ঘাস গজিয়েছিল—সেগুলো এখন শুকিয়ে গিয়ে ঝাকড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে প্রথম দেখেছিলাম—হিজল বিলের ধারে সাঁতালী গাঁয়ে গিয়ে। গুরুর সঙ্গে নৌকা ক'রে গিয়েছিলাম বিষ কিনতে। দেখে এসেছিলাম ওদের গ্রাম, ওদের ঘর, মা-বিষহরির আটন, হিজলের বিল, ওদের নাগিনী কন্যা শবলাকে। শুনে এসেছিলাম ওদের ভাসান গান, ওদের বাজনা; নাগিনী কন্যের চুলে চুলে পাক দিয়ে নাচন, বারি মাথায় করে ভরন—দেখে এসেছিলাম। আর দেখে এসেছিলাম সে কত রকমের সাপ। কত চিত্র-বিচিত্র দেহ, কত রকমের বর্ণ, কত রকমের মুখ! ভুলতে পারি নি। বিশেষ করে ওই কালো কন্যে আর ওই খাড়া সোজা পাথরের দেউলের মত বুড়ো—এদের দুই জনকে ভুলতে পারি নি।

আবার হঠাৎ একদিন দেখলাম।

আশ্বিনের শেষ।

শহরে গুরুর ঔষধালয়ে রোগীর ভিড় জমেছে, বসে আছে সব। রাস্তার উপর গরুর গাড়ী, ডুলি, পালকির ভিড়, দূর দূরান্তর থেকে রোগী এসেছে। ঘরের মধ্যে ব'সে গুরু চোখ বুজে একে একে নাড়ী পরীক্ষা করছেন, উপসর্গের কথা শুনছেন, ব্যবস্থা দিচ্ছেন, আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ বাইরে ঝনাৎ-ঝন্ ঝনাৎ-ঝন্ শব্দ উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ভারী গলায় কেউ বললে—জয় মা বিষহরি! পেন্নাম বাবা ধন্বন্তরি।

তার কথা শেষ হ'তে না-হ'তে বেজে উঠল বিষম ঢাকি—ধুম—ধুম—ধুম্—ধুম। তারই সঙ্গে বেজে উঠল এক ঘেয়ে সরু সুরে তুমড়ি বাঁশি—পুঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ!

গুরু বারেকের জন্যে চোখ খুলে বললেন, মহাদেবের দল এসেছে, অপেক্ষা করতে বল।

বেরিয়ে এলাম। দেখলাম কাঁধে সাপের ঝাঁপির ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাঁতালী গায়ের বেদের দল। তাদের সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে খাড়া সোজা শক্ত পেশী বাঁধা দেহ বুড়ো মহাদেব শিরবেদে। আর তার পাশে সেই আশ্চর্য কালো বেদের মেয়ে—শবলা। নাগিনী কন্যে। আশ্বিন মাসের সকাল বেলার রোদ, বারো মাসের মধ্যে উজ্জ্বল রোদ, দু-দুমাস বর্ষার ধারায় স্নান ক'রে কিরণের অঙ্গে তখন যেন জ্যোতি ফোটে, সেই রোদের ছটা ওই কালো মেয়ের অঙ্গে পড়েছে—তার অঙ্গ থেকেও কালো ছটা ঝিলিক মারছে, শুধু মাথার চুল রুখু—সকাল বেলার বাতাসে এলোমেলো হ'য়ে গোছা গোছা উড়ছে। পরনে তার টকটকে রাঙা শাড়ি, গাছকোমর বেঁধে পরা।

বললাম—বস তোমরা, কবিরাজ মশায় আসছেন।

মহাদেব বললে—তুমারে চিনি-চিনি লাগছে যেন বাবা? কুথা দেখলম গ তুমাকে?

শবলা হেসে বললে—লজর তুর খাট হল্‌ছে বুড়া। মানুষ চিনতে দেরি লাগছে। উটি সেই বাবার সাথে হামরাদের গাঁয়ে গেলছিল, বাবার সাকরেদ বটে, কচি-ধন্বন্তরি।

শিবরাম বলেন—বেদের মেয়ের বাক্যে যত বিষ তত মধু, শবলা আমার নাম দিয়েছিল কচি-ধন্বন্তরি।

খিল খিল ক'রে হেসে শবলা বলেছিল মহাদেবকে—নামটি কেমন দিলম রে বুড়া? এঁ্যা?

মহাদেব রূঢ় হ'য়ে উঠল. বললে—হুঁ।

ভাদ্রের শেষে শেষ নাগপঞ্চমীতে মা-বিষহরির পূজো শেষ ক'রে ওদের সফর শুরু হয়। সাঁওতালেরা যেমন বসন্ত কালে শালগাছে কচিপাতা বের হ'লে শিকারে বের হয়, সে কালে শরৎকালে বিজয়া দশমী 'দশেরা' সেরে যেমন রাজারা দিগ্বিজয়ে বের হতেন, বণিকেরা যেমন বের হতেন ডিঙার বহর ভাসিয়ে বাণিজ্যে, আজও যেমন গাড়ী বোঝাই ক'রে ছোট দোকানীরা মেলা ফিরতে বের হয়—তেমনি বিষবেদেরাও বের হয়—তাদের কুল-ব্যবসায়ে। হাঙরমুখী, কুমীরখালা, হাঁসজলা বেয়ে সারি সারি বিষবেদেদের নৌকা এসে পড়ে মা-গঙ্গার জলে। নৌকাতে সাপের ঝাঁপি, রান্নার হাঁড়ি, খেলা-দেখাবার বাঁদর-ছাগল আর মানুষ। শুধু বিষবেদেরাই নয়—অন্য অন্য যারা জাতবেদে তারাও বের হয়। কতক নৌকায়, কতক হাঁটাপথে—ভার কাঁধে। এই সফর ওদের কুলপ্রথা, জাতি-ধর্ম। বর্ষা গিয়েছে, কত পাহাড় বন ভাসিয়ে কত জল বয়ে গিয়ে পড়েছে

সাগরে, কত দেশ ভেসেছে, কত দেশের কত সাপ, কত গাছ, কত গাছের বীজ, কত জন্তু, কত মানুষ ভেসেছে তার সঙ্গে, তার কতক বলি নিয়েছেন মহাসাগর, কতক ভেসে কূল নিয়েছে—ডাঙায় উঠেছে। গাছের বীজ- আগামী বারের বর্ষার অপেক্ষা ক'রে আছে, সেই বর্ষায় ফেটে অঙ্কুর হ'য়ে মাথা তুলবে। সাপ গর্তে বাসা নিয়েছে, সে অপেক্ষা ক'রে আছে কবে কোন্ সাপিনীর অঙ্গের কাঠালীচাঁপার সুবাস পাবে। সাপিনী অপেক্ষা ক'রে আছে—তার অঙ্গে বাস কবে বের হবে,—সে সুবাসের আকর্ষণে আসবে কোন সাপ। সেই সব সাপ-সাপিনী, মাঠে মাঠে, বা নদীনালার কূলের গর্তে গর্তে সন্ধান ক'রে ধরতে বের হয়। দেশ দেশান্তর ঘোরে, বাঁধা কবিরাজ মশায়দের ঘর আছে। সেইখানে গিয়ে তাঁদের চোখের সামনে কাল নাগিনীর বিষ গেলে বিক্রি করে; গ্রামে গ্রামে গৃহস্থদের ঘরে ঘরে খেলা দেখায়, সাপের নাচন, ছাগল-বাঁদরের খেলা। দেখিয়ে দেখিয়ে চলে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম, এক জেলা থেকে আর এক জেলা—মাসের পর মাস কেটে যায়, তারপর একদিন আবার ঘরের দিকে ফেরে। বিষবেদেরা চলে নৌকায়—জলে জলে, গঙ্গা থেকে ঢোকে অন্য নদীতে, চলে আসে কলকাতার শহর পর্যন্ত, সেখানে সাহেবান লোকের নতুন শহর গড়ে উঠছে, বড় বড় আমীর বাস করে, অনেক কবিরাজও আছেন। সেখানেও বিষ বিক্রি করে, তারপর শীত বেশ গাঢ় হ'য়ে পড়তেই ফেরে। গাঙের জল কমে আসছে, হিজলবিলের ধারে ধারে জল শুকিয়ে পাঁক জেগেছে, চারিপাশে এর পর কুমীরখালায় হাঙরমুখীতে জল মরে শুকিয়ে আসবে—তখন আর নৌকা নিয়ে সাঁতালী গাঁয়ের ঘাটে গিয়ে ওঠা যাবে না। তার উপর শীতে নাগ-নাগিনী কাতর হয়েছে, জর-জর হয়েছে হিমেল দেহখানি, চোখ হয়েছে ঘোলা, মাথা তোলার শক্তি নাই, আর শিস মেরে মাথা তুলে নাচতে পারে না।

খোঁচা দিলে ফোঁস করেই একটু পাক খেয়ে নিথর হয়ে যায়। বিষবেদের মন কাতর হয়, মা-বিষহরির সন্তান, তাদের মেরে ফেলতে ওরা চায় না, ওরা তাদের ছেড়ে দেয় নদীর নির্জন কূলে, অথবা পতিত-প্রান্তরে, বনে কিম্বা জঙ্গলে। বলে দেয়—'স্বস্থানে যা। মা তোকে রক্ষে করুন।' সাপদের মুক্তি দিয়ে খালি ঝাঁপি নিয়ে শহরে বাজারে কিনে কেটে ফেরে সাঁতালীতে। শুধু তো খালে-বিলে জলই শুকায় নি, গাঙের চরে, বিলের চারিপাশে কাশ বনে ঘাস পেকেছে। সেই ঘাস কাটতে হবে, শুকুতে হবে, ঘরগুলি ছাইতে হবে কাশ দিয়ে। তা-ছাড়া, হিজলের চারিপাশে এতদিন চাষীরা এসে গিয়েছে। লাঙল দিয়ে চ'ষে বুনে দিয়েছে গম যব ছোলা মসুর মটর সরষে। সবুজ হয়ে উঠেছে চারিধার। হিজলের ধাপ বারমাসই সবুজ কিন্তু এ সবুজ যেন আলাদা সবুজ। এ সবুজে শুধু রঙ নাই, রঙে রসে একাকার। ফসল তোলার সময় ফসল কুড়িয়ে ওরা ঘরে তুলবে। তা ছাড়া মাঘ হতে পড়বে সব সাদি-সাঙার হিড়িক। সাঁতালীতে ছ মাস জল, ছ মাস স্থল। স্থল না জাগলে সাদি-সাঙা হয় কি করে? তা-ছাড়া ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছে হাজার হাজার হাঁস। তারা আকাশে উড়ছে আর ডাকছে—প্যাক-প্যাক। ক্যাও-ক্যাও। কিচ-কিচ। কল্-কল্-কল্-কল্।

তারা ওদের ডাক পাঠায়।

লায়ের মাথায় শীতের কালে বুনো হাঁস পাক খেয়ে ডাক মেরে গেলেই শিরবেদের হুকুম হয়—ঘুরায়ে দে লায়ের মুখ। চল্। সাঁতালী! সাঁতালী!

নাগ-পঞ্চমীতে সাঁতালী থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মহাদেবের দল এসে লা বেঁধেছে শহরে। প্রথমেই ধন্বন্তরি বাবার বাড়ীতে বিষ না দিয়ে ওরা আর কোনখানে বিষ বেচে না। ধূর্জটি কবিরাজের খ্যাতি তার প্রধান কারণ তো বটেই, কিন্তু আরও কারণ আছে। বাবার

মত আদর ওদের কেউ করে না। বাবার মত সাপ চিনতে ওস্তাদ ওদের চোখে পড়ে নাই।

লা—অর্থাৎ নৌকাগুলি বেঁধেছে শহরের প্রান্তে। গঙ্গার কূলে বেশ একটি পরিষ্কার পতিত জায়গা, তার উপর গুটি তিনেক বড় বড় গাছ। সেই গাছগুলির শিকড় কূলের ভাঙনের মধ্যে এঁকা বেঁকা হয়ে বেরিয়ে আছে, তাতেই বেঁধেছে নৌকার দড়ি। বটগাছের তলাগুলি যথাসাধ্য পরিষ্কার ক'রে নিয়ে পেতেছে গৃহস্থালি। ডালে ঝুলিয়েছে শিকে—তাতে রয়েছে রান্নার হাঁড়ি। তার পাশেই শিকেতে ঝুলছে সাপের ঝাঁপি; তলায় পেতেছে উনান, তার পাশে খেজুরের চাটাই বিছিয়ে দিয়েছে, ঘাসের উপর শুকাচ্ছে ভিজে কাপড়, শিকড়ে বেঁধেছে ছাগল আর বাঁদর। বাচ্চারা ধুলোয় হামা দিয়ে বেড়াচ্ছে নগ্নদেহে, নাকে পোঁটা গড়িয়ে এসেছে—মুটোবন্দী মাটি নিয়ে খাচ্ছে, মুখে মাখছে। অপেক্ষাকৃত বড়রা গায়ে ধুলো মেখে ছুটে বেড়াচ্ছে; তার চেয়ে বড়রা শুকনো কাঠ-কুটা কুড়িয়ে ঘুরছে—কতক গাছের ডালে উঠে দোল খাচ্ছে। সবল বেদেরা বেরিয়েছে তাদের পসরা নিয়ে। সঙ্গে তাদের যুবতী বেদেনীর দল।

ধূর্জটি কবিরাজ এসে দাঁড়ালেন। হাস্য-প্রসন্ন মুখে স্নেহ স্মিতকণ্ঠে সমাদর জানিয়ে বললেন—এসেছ মহাদেব!

হাত জোড় করে মহাদেব বললে—এলম বাবা। যজমানের ঘর, অন্নদাতার আঙন, ধন্বন্তরির আটন, হেথাকে না এস্যা যাব কুথাকে বাবা? বিষবেদের সম্বল বাবা—লাগের বিষ—মানুষের রক্তে এক ফোঁটা লাগলে মিত্যু, হলাহল—গরল, এ বস্তু এক শিব ধারণ করেছেন গলায় আর ধারণ করতে পারে বাবা ধন্বন্তরির পাথরের খল। আপনকার খল ছাড়া এ ফেলব কুথা গো? জলে ফেললে—জলের জীব মরে, থলে ফেললে

নরলোকের হয় সব্বনাশ! এক আপুনিই তো পারেন এরে শোধন ক'রে সুধা করতে!

পুরুষানুক্রমিক বাঁধা বুলি ওদের।

কবিরাজের উদ্দেশ্যে সকলেই মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে—পেনাম বাবা!

কবিরাজ হেসে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

তারপর প্রশ্ন করেন—মায়ী শবলা, তুই এত চুপচাপ কেন রে বেটী?

দাঁত বের ক'রে তিক্তস্বরে মহাদেব কুটিল হয়ে উঠল একমুহূর্তে, বললে—তাই শুধান বাবা, তাই শুধান। আমারে কয় কি জানেন? কয়, বুড়া হল্‌ছিস, তুর লজর গেলছে। কানে খাটো হল্‌ছিস, চেঁচায়ে গোল না করলে চুপচাপ ভাবিস; ভাবান্তর দেখিস! লাগিনী জরেছে বাবা, খোলস ছাড়বে।

কালনাগিনী চকিতের জন্য যেমন ফণা তোলে, তেমনি ভাবেই শবলা একবার সোজা হয়ে উঠল, মনে হ'ল ছোবল মারার মত—বুড়াকে আক্রমণ ক'রে কিছু বলবে, কিন্তু পরক্ষণেই একটু হেসে শান্ত হয়ে মাথা নামালে, বললে—বাবা গো, লাগিনী যখন শিশু থাকে, তখন কিলবিল কর‍্যা ঘুরে বেড়ায়, ঘাসের বনে বাতাস বইল পর, তা শুনেও হিস কর‍্যা ফণা তুলে দাঁড়ায়। বয়স বাড়ে বাবা, পিথিমীর সব বুঝতে পারে, সাবধান হয়। মানুষ দেখলি, জন্তু দেখলি সি তখন ফোঁস কর‍্যা মাথা তুলে না বাবা, চুপিসাড়ে পলায়ে যেতে চায়। নেহাৎ দায়ে পড়লি পর তবে ফণা তুলে বাবা। আক্কেল হয় তখন যি, মানুষ সামান্যি লয়। মানুষকে কামড়ালি পরে লাগের বিষে মানুষ মরে, কিন্তুক মানুষ তারে ছাড়ে না, লাঠির ঘায়ে মারে; মারতে না পারলি—বেদে ডাকে। বেদে তারে বন্দী করে, বিষদাঁত ভাংে—নাচায়। সে মরণের বাড়া। তার উপর বেদের হাতের

জ্বালা বড় জ্বালা বাবা! সেই বোধ হলছে বাবা—বেদের ঝাঁপির লাগিনী, অঙ্গের জ্বালায় জরেছি; ওই হ'ল মরণ-জরা!

শবলা হাসলে। কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ছিল যেমন তেমনি ছিল আরও কিছু। 'বুঝতে ঠিক পারলাম না শুধু আঁচ পেলাম।' শিবরাম বললেন—গুরু রোগী দেখেন যেমন ক'রে—তেমনি করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শবলার মুখের দিকে। তারপর বললেন—শবলা বেটী আমার সাক্ষাৎ নাগিনী কন্যা!

মহাদেব বলে উঠল—হঁ বাবা। গর্তের মধ্যি থাকে, খোঁচা খেলে ফোঁসায় না, পথের পাশে লুকায়ে থাকে, মানুষ তো মানুষ, বেদের বাপের সাধ্যি নাই যে ঠাওর করে। ফাঁক খোঁজে, রাগ চেপে রোষ চেপে, পড়ে পড়ে ফাঁক খোঁজে কখন ডংশাবে।

তার পাকা দাড়ি-গোঁফের মধ্যে থেকে আবার বের হ'ল দুপাটি বড় বড় দাঁত; হাসলে মহাদেবকে ভয়ঙ্কর দেখাত;—বয়সের জন্য বড় বড় দাঁতগুলি মাড়ি থেকে ঠেলে উঠে আরও বড় দেখায়, লাল-কালো ছোপ ধরা বড় বড় দাঁত; তার মধ্যে দু-তিনটে না থাকার জন্যে ভয়ঙ্কর দেখায় বেশি!

—হঁ রে বুড়া হঁ। সব অপরাধ লাগিনীর। সে তো জনমদোষিনী রে! মানুষের আয়ু ফুরায়ে যায় নেয়তের লিখন থাকে; যম লাগিনীরে কয়—তুর বিষে মরণ দিলাম মিশায়ে, যা তু উরে ডংশায়ে আয়; লাগনী যমের কেনাদাসী; আজ্ঞে লঙ্ঘন করতে লারে, ডংশায়; মানুষটা মরে, অপরাধ হয় লাগিনীর। পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে হতভাগিনীরা ঘুরে বেড়ায়, মানুষ মাথায় দেয় পা, পুচ্ছে দেয় পা, লাগিনী কখনও রাগের বশে, কখনও পরানের দায়ে, কখনও পরানের ডরে তারে ডংশায়। অপরাধ হয় লাগিনীর!

হাসলে শবলা, সেই বিচিত্র হাসি, যে হাসি সে ওর আগেও একবার হেসেছিল। তারপর বললে—লে—লে বুড়া, কথার প্যাঁচ থুয়ে বাবারে লাগগুলান দেখা। বাবার অনেক কাজ। তুর আমার খেল্, এ আর কি দেখবেন উনি? তু আমারে খোঁচা দিলে আমি তুরে ছোবল মারব। দাঁত ভাঙবি, ফের গজাবে সি দাঁত। কুনো দিন যদি তুর অঙ্গে বিঁধে, আর নিয়ত যদি লিখে থাকে কি ওই বিষেই তুর মরণ হবে, তবে তু মরবি। লয় তো মুই মরব তুর হাতের পরশের জ্বালায়, তুর লাঠির খোঁচায়, তুর জড়িবুটির গন্ধে। লে, এখন সাপগুলান দেখা, বিষ গেলে দে, দিয়া চল ফিরে চল।

ধূর্জটি কবিরাজ বললেন—সেই ভাল। তুমি শিরবেদে, তুমি বাপ—শবলা নাগিনী কন্যে, তোমার বেটী, বাপ-বেটীর ঝগড়া তোমাদের মিটিয়ে নিয়ো।

সাপের বিষ গেলে নেওয়া দেখেছ?

শিবরাম বললে—আজকাল বিজ্ঞানের যুগে নানা কৌশল হয়েছে, শুনেছি কাচের নলের মধ্যে বিষ গেলে জমা হয়, চমৎকার সে কৌশল। কিন্তু বেদেদের সেই আদি কাল থেকে এক কৌশল। তার আর অদল বদল হয় না। বদলের কথা বললে হাসে।

তালের পাতা আর ঝিনুকের খোলা। যে ঝিনুক পুকুরে মেলে সেই ঝিনুক। তালের পাতা ধনুকের ছিলার মত ঝিনুকের গায়ে টান করে বেঁধে ধরে একজন, আর একজন সাপের চোয়াল টিপে হাঁ করিয়ে ধরে। ঝিনুকটা দেয় মুখের মধ্যে পুরে, বিষ দাঁত দুটি বিঁধে যায় ওই তালপাতার বাঁধনে।

তালপাতার ধারালো করকরে প্রান্তভাগের চাপ পড়ে বিষের থলিতে, ওদিকে বিষদাঁত বিঁধে থাকার স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বিষ দাঁতের নালী বেয়ে টপ টপ করে পড়ে ওই ঝিনুকের খোলায়। এমনই কৌশল ওদের যে বিষ শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত ঝ'রে পড়বে। তারপর সাপটা যায় ঝাঁপিতে, ঝিনুকের বিষ যায় সরষের তেলে ভরা কবিরাজের পাত্রে। জলের উপর তেলের মত, তেলের উপর বিষ ছড়িয়ে প'ড়ে ভাসে। না-হলে বাতাসের সংস্পর্শে জমে যায় বাবা।

আমি বসে ছিলাম গুরুর পায়ের কাছে—আমার সম্মুখেই আমাদের বিষ নেওয়ার পাত্র। বেদের দলের সামনে ব'সে মহাদেব, তার পাশে বাঁ-দিকে শবলা। শিরবেদে আর নাগিনীকন্যা, পিছনে বেদেরা। বেদেরা হাঁড়ি এগিয়ে দেয়—মহাদেব হাঁড়ির মুখের সরা খুলে সাপ বের ক'রে। জেলেরা যেমন মাছ ধরে, সে ধরা তেমনিভাবে ধরা বাবা। এক হাতে মাথা একহাতে লেজ ধ'রে প্রথমটা গুরুকে দেখাচ্ছিল, গুরু লক্ষণ দেখে সাপ চিনে নিচ্ছিলেন। কাল রঙ হলেই হয় না, কালো সাপের মধ্যেই কত জাত। কালো সাপের গায়ের দিকে চাইলে দেখতে পাবে তার মধ্যে সূচের ডগায় আঁকা বিন্দুর মত সাদা ফুটকি। ফণার নিচে গলায় কারও বা একটি, কারও দুটি, কারও বা তিনটি মালার মত সাদা কাল বেড়। কারও বা মধ্যের দাগটি চাঁপা ফুলের রঙ। ফণায় চক্রচিহ্ন, তাও কত রকমের। কারও চক্র শঙ্খের মত, কারও বা পদ্মের কুঁড়ির মত, কারও বা মাথায় ঠিক একটি চরণচিহ্ন। কারও কালো রঙ একটু ফিকে, কারও রঙের উপর রোদের ছটা পড়লে অন্য একটা রঙ ঝিলিক দেয়।

গুরু বলেছিলেন—কাল-নাগিনী হবে বাবা শুধু কালো। সুকেশী মেয়ের তৈলাক্ত বেণীর মত কালো মাথায় থাকবে নিখুঁত চরণ-চিহ্নটি। বাকি যা দেখ বাবা—ও সব হ'ল বর্ণসঙ্কর। কাল-নাগিনীর নাগ নাই,

শঙ্খনাগ সন্ততি দিয়েছে, তার মাথায় শঙ্খচিহ্ন, পদ্মনাগ দিয়েছে পদ্মকলি চিহ্ন; আপন আপন কুলের ছাপ রেখে গেছে বাবা। ওই ছাপ যেখানে দেখবে—সেখানে বুঝবে ওর স্বভাবে ওর বিষে—সবই আছে পিতৃকুলের ধারা। সাবধান হবে বাবা। এদের বিষে ঠিক কাজ হয় না।

থাক, ওসব কথা থাক। ওসব আমাদের জাতিবিদ্যার কথা। এক টিপ নস্য নিয়ে নাক মুছে শিবরাম বলেন—মহাদেব, ধূর্জটি কবিরাজকে না-জানা নয়, তবু ওর জাতি-স্বভাব গত বোলচাল দিতে ছাড়লে না। এক একটি সাপ ধ'রে তাঁর সামনে দেখাতে লাগল।

—এই দেখেন বাবা! গড়নটা দেখেন আর বরণটা দেখেন। চিকচিকে কালো। এই দেখেন চক্কটি দেখেন। লেজটি দেখেন।

—উঁহু। ওটা চলবে না মহাদেব। ওটা রাখ।

—কেনে বাবা? ই তো খাঁটি জাত।

—না। ওটা রাখ তুমি।

শবলা বলছিল—রাখ বুড়া রাখ। ইখানে তু জাতিস্বভাবটা ছাড়। কারে কি বুলছিস? শুনছিস, রাখ।

মহাদেব রাখলে সে সাপ কিন্তু অগ্নিদৃষ্টি হেনে শবলাকে বললে—তু থাম।

শবলা হাসলে!

ধূর্জটি কবিরাজ দেখে শুনে বেছে দিলেন পাঁচটি কালো সাপ; মহাদেব এবার বসল—সে সাপের মুখ ধরবে, আর তালপাতার বেড় দেওয়া ঝিনুক মুখে পরিয়ে ধরবে নাগিনী কন্যা শবলা।

ঈষৎ বাঁকা, সাদা দাঁত দুটির দিকে তাকিয়ে শিবরাম যেন মোহাবিষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলেন। ওই বাঁকা ওই এতটুকু একটি কাঁটার মত দাঁত,

ওর প্রান্তভাগে ওই ক্ষুদ্র এক তরল বিন্দু, ওর কোথায় রয়েছে মৃত্যু ? কিন্তু আছে, ওরই মধ্যে সে আছে, এতে সন্দেহ নাই। সাপের চোখে পলক নাই, পলকহীন দৃষ্টিতে তার সম্মোহিনী আছে ; সাপের চোখে চোখ রেখে মানুষ তাকিয়ে থাকতে থাকতে পঙ্গু হ'য়ে যাওয়ার কথা শিবরাম শুনেছেন, কিন্তু ওই বিষবিন্দু-ঝরা দাঁতের দিকে চেয়ে পঙ্গু হ'য়ে যাওয়ার কথা তিনি শুনেন নি। তিনি যেন পঙ্গু হ'য়ে গেলেন।

ধূর্জটি কবিরাজ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সেবার তোমাদের গ্রামে যখন গিয়েছিলাম, তখন শবলামায়ী যে সাপটি দিয়েছিল মহাদেব, সে জাত কিন্তু আর পেলাম না।

মহাদেব হাসলে। তিক্ত এবং কঠিন সে হাসি। নাকের ডগাটা ফুলে উঠল ; হাসিতে ঠোঁট দুটি বিস্ফারিত হল না, ধনুকের মত বেঁকে গেল। তারপর বললে—ধন্বন্তরি বাবার তো অজানা কিছুই নাই গ ! কি বলব বলেন ?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে শবলার দিকে মুহূর্তের জন্য ফিরে তাকালে। তাকিয়ে বললে—ই জাতটার নেকনের ফল, রীতচরিত্তের দোষ। এই, এর মতি দেখেন কেনে ! সে আঙুল দিয়ে দেখালে শবলাকে।

সঙ্গে সঙ্গে গুরুর শঙ্কিত সতর্ক কণ্ঠস্বরে শিবরাম চমকে উঠলেন, সাপের দাঁত দেখে মোহে পঙ্গু হ'য়ে পড়েছিলেন, সে মোহ তাঁর ছুটে গেল।

ধূর্জটি কবিরাজ শঙ্কিত সতর্ক কণ্ঠস্বরে হেঁকে উঠলেন—হাঁ শবলা !

শবলা হাসলে, হেসে উত্তর দিলে—দেখেছি বাবা। হাত, মুই সরায়ে নিইছি ঠিক সময়ে।

ধূর্জটি কবিরাজ বললেন—সাবধান হও বাবা মহাদেব। কি হ'ত বল ত ?

সত্যই কি হ'ত ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলেন শিবরাম। সর্বনাশ হ'য়ে যেত। মহাদেব দুই আঙুলে টিপে ধ'রেছিল সাপটার চোয়াল, ঝিনুক ধ'রেছিল শবলা। উত্তেজিত হ'য়ে মহাদেব শবলার দিকে চোখ ফিরিয়ে মুক্ত হাতটির আঙুল দিয়ে শবলাকে যে মুহূর্তে দেখাতে গিয়েছে, সেই মুহূর্তে তার সাপ-ধরা-হাতটি ঈষৎ বেঁকে গিয়েছে, সাপটার মাথা হেলে প'ড়েছে, তালপাতায় বেঁধা একটা দাঁত তালপাতা থেকে খুলে গিয়েছে। শবলা যদি মহাদেবের কথায় বা আঙুল দিয়ে দেখানোর প্রতিক্রিয়ায় মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হ'য়ে চকিতের জন্যও চোখ তুলত, তাকাত মহাদেবের দিকে, তবে ঐ বক্র তীক্ষ্ণ দাঁতটি ব'সে যেত শবলার আঙুলে।

ধূর্জটি কবিরাজ তিরস্কারের সুরেই বললেন—সাবধানে বাবা মহাদেব! কি হ'ত বল ত?

অবজ্ঞার হাসি হাসলে মহাদেব। আর কি হ'ত বাবা?

সুরে সুর মিলিয়ে শবলা বললে—তা বৈ কি বাবা! কি আর হ'ত বলেন। নিজের বিষেই জরে মরত নাগিনী। নরদেহের যন্ত্রণা থেকে খালাস পেত।

খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠল বিচিত্র বেদের মেয়ে। সে হাসিতে ব্যঙ্গ যেন শতধারে ঝরে পড়ল।

মহাদেবের মুখখানা থমথমে হ'য়ে উঠল। এরপর নীরবে অতি-সতর্কতার সঙ্গে চলতে লাগল বিষ গালার কাজ।

বিষ গালা শেষ হ'ল। শবলা বললে—বাবাঠাকুরের ছামুতে তু মিটায়ে দে যার যা পাওনা। বাবা, আপুনি দেন গ হিসাব ক'রে।

মহাদেব কঠিন দৃষ্টিতে তাকালে শবলার দিকে। কেনে?

—কেনে আবার কি? বাবা হিসাব ক'রে দিবেন এক কলমে, মুখে

মুখে হিসাব ক'রতে তুদের সারাদিন কেটে যাবে। কি গ, বল্ না কেনে তুরা? মুখে যে সব মাটি লেপে দিলি! আঁ?

একজন বেদে বললে—হ্যাঁ; তা হ্যাঁ, সেই তো ভাল! না, কি গ? সকলের মুখের দিকে চাইলে সে।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। সকলেই বললে। কেউ বা মুখ ফুটে বললে, কেউ সম্মতি জানালে ঘাড় নেড়ে। হ্যাঁ-হ্যাঁ।

* * * *

—কচি-ধন্বন্তরি!

শিবরাম বলেন—আমি চমকে উঠলাম, এমন সুরেলা মিষ্টি গলায় এমন বিচিত্র মধুর ডাক কে ডাকে? জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলাম হ্যাঁ সে-ই। সেই বেদের মেয়ে। বেলা তখন তৃতীয় প্রহরের শেষ পাদ। প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত যায় গুরুর বৈদ্যভবনের কাজে; তারপর খানিকটা বিশ্রাম। রোগীরা চ'লে যায়, বৈদ্যভবনের দুয়ারগুলি বন্ধ হয়, আমরা আহার করি, স্নানের নিয়ম প্রাতঃস্নান, ওটা হ'য়ে থাকে, গুরুর বিশ্রাম তখনও হয় না, তাঁকে বের হ'তে হয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাড়ী রোগী দেখতে, অনেক ক্ষেত্রে যে সব রোগীকে নড়াচড়া করা চলে না, সে সব বাড়ীতে যেতে হয়। এমনি সময় তখন। আঙিনাটা জনশূন্য; গুরু বেরিয়েছেন তখনও ফেরেন নি; সঙ্গে গিয়েছে অন্য শিষ্য, আমার সেদিন বিশ্রাম। একদিকের কোণের একটা ছোট ঘরে শুয়ে আছি, পাশে খোলা প'ড়ে আছে একখানা বিষশাস্ত্রের পুঁথি। বেদেরা যাওয়ার পর ওই পুঁথিখানাই বের ক'রে খুলে বসেছিলাম। কিন্তু সে পড়তে ভাল লাগছিল না। ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম; ভাবছিলাম বোধ হয় বেদেদের কথাই। ওই আশ্চর্য কালো বেদের মেয়ের কথা, মহাদেবের কথা। একটা নেশা লেগেছে যেন। ওদের ওই আশ্চর্য কৌশল, ওই

অদ্ভুত সাহস, ওদের বিচিত্র দ্রব্যগুণ-বিদ্যা আর সর্বাপেক্ষা রহস্যময় মন্ত্রবিদ্যা শিখবার একটা আগ্রহ নেশার মত আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল আমাকে।

*　　*　　*　　*

বিষের দাম মিটিয়ে যখন নেয় বেদেরা তখন শিবরাম মহাদেবের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। যার যা প্রাপ্য হিসেব করে নিচ্ছিল বেদেরা, মহাদেব নিস্পৃহের মত বসেছিল একদিকে। শিবরাম তাকে বলেছিলেন —আমায় শেখাবে? কিছু বিদ্যা দেবে? আমি দক্ষিণা দোব।

মহাদেব বলেছিল দক্ষিণা দিবে তো বুঝলাম। কিন্তুক বিদ্যা কি একদিন দু দিনে শিখা যায়? বলেন না আপুনি?

তা যায় না। তবে কতকগুলো জিনিস তো শেখা যায় দু-একবার দেখে। তা ছাড়া, তোমরা বলবে আমি লিখে নেব। আমি তো সাপ ধরা শিখতে চাই না, আমি সাপ চিনতে চাই। লক্ষণ পড়েছি আমাদের শাস্ত্রে, সেই লক্ষণ মিলিয়ে সাপ দেখিয়ে চিনিয়ে দেবে। জড়ি শিকড় চিনিয়ে দেবে, নাম বলে দেবে। আমি লিখে নেব।

—কি দিবা বল? দক্ষিণা?

—কি চাও বল?

—পাঁচ কুড়ি টাকা দিবা। আর ষোল আনা মা-বিষহরির প্রণামী।

অর্থাৎ একশো একটাকা।

একশো একটাকা কোথায় পাবেন ছাত্র শিবরাম। গুরুগৃহে বাস, গুরুর অন্নে দিনযাপন। প্রায় পুরাকালের শিক্ষা-ব্যবস্থার ধারা।

শেষে বলেছিলেন—পাঁচটি টাকা আমি দেব, বিদ্যা শেখাতে হবে না, সাপ চিনিয়ে দিয়ো।

রাজী হয়েছিল মহাদেব। বলেছিল শহরের দুই দক্ষিণে একেরে

সিধা চলি যাবা গাঙের কূলে কূলে। আধকোশ-টাক গিয়া পাবা আমবাগান, আর গাঙের কূলে তিনটা বট গাছ। দেখবা বেদেদের লা বাঁধা রইছে ; সেই পাড়ের উপর হামরাদের আস্তানা !

শিবরাম সেই কথাগুলিই ভাবছিলেন।

হঠাৎ কানে এল এই সুরেলা উচ্চারণে মিহি গলার ডাক—কচি-ধন্বন্তরি !

জানালার ওপাশে সেই বিচিত্র বেদের মেয়ের মুখ।

ঠোঁটে একমুখ হাসি—চোখে চঞ্চল তারায় সস্মিত আহ্বান—সে তাকেই ডাকছে।

শিবরাম বললেন—আমাকে বলছ ?

—হঁা গ। তুমাকে ছাড়া আর কাকে ? তুমি ধন্বন্তরিও বট, কচিও বট। তাই তো কইলাম কচি-ধন্বন্তরি ! শুন।

—কি ?

বাইরে এস গ। আমি বাইরে রইলাম দাঁড়ায়ে—তুমি ঘর থেক্যা কইছ কি ? কেমন তুমি ?

অপ্রতিভ হয়ে বাইরে এলেন শিবরাম।

—ধন্বন্তরি বাবা কই ? এবার তার চোখে তীব্র দীপ্তি ফুটে উঠল।

—গুরু তো ডাকে বেরিয়েছেন।

—ঘরে নাই ?

—না।

মেয়েটা গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তার পর উঠে পড়ল। বললে—চললাম। চলে গেল। কিছুক্ষণ পরই ফিরল ধূর্জটি কবিরাজের পালকি। পালকির সঙ্গে ফিরল শবলা। পথে দেখা হয়েছে।

কবিরাজ পালকি থেকে নেমে বললেন—কি? মহাদেবের সঙ্গে বনছে না? সেই মীমাংসা করতে হবে?

—না বাবা। যা দেবতার অসাধ্যি তার লেগে মুই বাবার কাছে আসি নাই।

—তবে?

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শবলা। কোন কথা বললে না। কোন কথা বলতে যেন সে পারছে না।

—বল্, আমার এখনও আহার হয় নি বেটী।

শবলা বলে উঠল—হেই মা গো! তবে এখুন নয়। সে এখুন থাক। আপুনি গিয়া সেবা করেন বাবা! হেই মা গো!

ব'লে প্রায় ছুটেই চলে গেল।

—শবলা! শোন্। ব'লে যা!

—না! না! তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সে ছুটে পালাচ্ছে।

বিচিত্র মেয়ে। কেনই বা এসেছিল, কেনই বা এমন ক'রে ছুটে চলে গেল শিবরাম বুঝতে পারলেন না। ধূর্জটি কবিরাজ একটু হাসলেন। বিষণ্ণ সস্নেহ হাসি! তারপর চলে গেলেন ভিতরে! এই তৃতীয় প্রহরে আবার তিনি স্নান করবেন, তারপর আহার।

পরের দিন কিন্তু ধন্বন্তরি ধূর্জটি কবিরাজের কাছে শবলা আর এল না। না এলেও শিবরামের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

গুরু তাকে পাঠিয়েছিলেন এক রোগীর বাড়ী। ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীর রোগী। তরুণ গৃহস্বামীর দুর্ভাগিনী পিতামহীর অসুখ।

দুর্ভাগিনী বৃদ্ধা স্বামী-পুত্র হারিয়ে পৌত্রের আমলে সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত। বড় ঘরে—বড় খাটে পড়ে আছেন, চাকরে টানাপাখাও টানে, কিন্তু এক কন্যা ছাড়া কেউ দেখে না। মৃত্যুরোগ নয়, যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি, তাঁরই ওষুধ নিয়ে পাঠালেন শিবরামকে, ওষুধগুলি অন্তঃপুরে গিয়ে বৃদ্ধার কন্যার হাতে দিয়ে সেবন-বিধি বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। নইলে ওষুধ হয় তো বাইরেই পড়ে থাকবে। অথবা এ চাকর দেবে তার হাতে, সে দেবে এক ঝিয়ের হাতে, ঝি কখন একসময় গিয়ে কোন্ কুলুঙ্গীতে রেখে চলে আসবে। বলেও আসবে না যে ওষুধ রইল। কবিরাজ অনুপানগুলি পর্যন্ত সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

এই অন্তঃপুরের উঠানে দেখলেন শবলাকে।

শবলা। কিন্তু এ কি সেই শবলা? এ যেন আর একজন। হাতে তার দড়িতে বাঁধা দুটো বাঁদর একটা ছাগল। কাঁধে ঝুলিতে সাপের ঝাঁপি! চোখে চকিত চপল দৃষ্টি। অঙ্গের হিল্লোলে, কথার সুরে, কৌতুক রসিকতা যেন—ঢেউ খেলে চলেছে।

এটা ওদের আর একটা ব্যবসা।

নদীর কূলে নৌকা বেঁধে পাড়ের উপর আস্তানা ফেলে মেয়েরা বেরিয়ে পড়ে। সাপ বাঁদর ছাগল ডুগডুগি বিষমঢাকি নিয়ে অন্দরের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ডাক দেয়—বেদেনীর খেলা দ্যাখেন গ মা বাড়ীর গিন্নী, রাজার রানী, স্বামী সোহাগী, সোনা-কপালী চাঁদের মা। কাল-নাগিনীর দোলন নাচন হীরেমনের খেল্—?

বিচিত্র সুর, খাঁজে খাঁজে সুরেলা টানে ওঠে-নামে। বাড়ীর মেয়েরা এ সুর চেনে, ছুটে এসে দাঁড়ায় দরজায়। বেদের মেয়ে এসেছে। আশ্চর্য কালো মেয়ে, আশ্চর্য ভাষা! আশ্চর্য ভূষা!

—বেদেনী এসেছিস! ওরে সব আয়রে! বেদেনী! বেদেনী এসেছে!

—হ্যাঁ গ মা লক্ষ্মী, বেদেনী আল্‌ছে! অর্থাৎ এসেছে। "বেদেনী আল্‌ছে মা, পোড়ারমুখী আলছে, তুমাদের দুয়ারের কাঙালিনী আল্‌ছে, সব্বনাশী-মায়াবিনী আল্‌ছে খেল্ দেখাতে, ভিখ মাঙতে, দুয়ারে এস্যা হাত পেতে দাঁড়ালছে।

মেয়েরা হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসে। না এসে পারে না। এই কালো মেয়েগুলি রহস্যময়ী মেয়ে, ওরা সত্যিই বোধ হয় যাদু জানে। কথায় যাদু আছে, খেলায় যাদু আছে, হাসিতে যাদু আছে। কোন কোন গিন্নী বলেন—ঢের হয়েছে, আজ যা এখন। সব্বনাশীরা কাজ পণ্ড করার যাশু; হাতের কাজ পড়ে আছে আমাদের। পালা বলছি।

ওরা খিল খিল করে হাসে। বলে—তা, মা-জন্নুনি, সোনামুখী তুমি বুলেছ ঠিক। বেদেনী দুয়ারে এস্যা হাঁক দিলি পর হাতের কাজ মাটি। বেদেনী মায়াবিনী গ হামরাদের মন্তর রইছে যে ঠাকরণ! এখুন বিদায় কর আপদেরে, জয় জয় দিতি দিতি মুই পথ ধরি; তুমরাদের ছেঁড়া কাজ আবার জোড়া লাগক; ভাণ্ডার ভর্‌্যা উঠুক; মা-বিষহরি কল্যেণ করেন, নীলকণ্ঠের আশীব্বাদে তুমার ঘরের সকল বিষ হর্‌্যা যাক! জয়-মা বিষহরি, জয় বাবা নীলকণ্ঠ, জয় আমার গিন্নীমা, এই ঝুলি পাতলম, দাও ভিখ দাও, বিদাও কর।

দাবি ওদের কিন্তু সামান্য নয়। দাবি অনেক।

বড় একটা বিষধরকে গলায় জড়িয়ে তার মুখটা হাতে ধরে মুখের সামনে এনে বলে, 'শিগ্‌গিরি বেনারসী শাড়ি আনেন ঠাকরণ—বরের সাথে বেদেনীর শুভদৃষ্টি হবে। আনেন ঠাকরণ, আনেন, মাথার পরে ঢেক্যা দ্যান, ত্বরিৎ করেন, বর মোর গলায় পাক দিচ্ছে।' কাপড় না পেলে বেদেনী সাপের পাকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে যাবার ভাণ করে। এ

ভাণের কথা লোকে জানে কিন্তু এত ভয়ঙ্কর এ ভাণ যে, ভাণ বুঝেও চোখে দেখতে পারে না।

কখনও পোষা বাঁদরটাকে বলে, হীরেমন, ধর মা-গিন্নীর চরণে ধর। বল ওই পরনের শাড়ীখানি ছেড়্যা দ্যান লইলিপর চরণ ছাড়ব নাই।

বাঁদরটা এমন কথা বুঝতে পারে যে ঠিক এসে গিন্নীর পা দুখানি দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে বসে পড়ে। গিন্নী শিউরে ওঠেন। ছাড় ছাড়! বেদেনী হাসে বলে কিছু করবে নাই মা. কিছু করবে নাই। তবে কাপড়খানি না পেলে ও ছাড়বে না। মুই কি করব বলেন? ই আজ্ঞে ওস্তাদের আজ্ঞে!

দর্শক পুরুষ হলে তো কথাই নাই।

বাঁদর নাচাতে নাচাতে, সাপ নাচাতে নাচাতে গানের সঙ্গেই তার অফুরন্ত দাবি জানিয়ে যায়—

"যেমন বাবুর চাঁদো মুখো
তেমনি বিদায় পাব গ।
বেনারসীর শাড়ি পর্যা
লেচে লেচে যাব গ!
প্রভু রাঙ্গা হাত ঝাড়িলে
আমার পাহাড় হয় গ!
মাথায় নিয়া সোনার পাহাড়
দিব প্রভুর জয় গ!

মেয়েদের মজলিসে বেদের মেয়ের শুধু বাক্যের মোহ সম্বল; পুরুষদের মহলে বাক্যের মোহের সঙ্গে তার দৃষ্টি এবং হিল্লোলিত দেহও মোহ বিস্তার করে। সাপের নাচ বাঁদরের খেলা দেখিয়ে সব শেষে সে বলে—এই ব্যারে প্রভু বেদেনীর লাচন দেখেন। লাগিনী লেচেছে হেলে দুলে, এই

ব্যারে লাচবে দেখেন বেদের কন্তে। হঠাৎ কথা হয়ে ওঠে সুরেলা, টানা লম্বা সুরে ছড়ার মতই বলে যায়, লাচ-লাচ না মায়াবিনী, লাচ দেখিনি লাচ দেখিনি! হেলে দুলে পাকে পাকে; বেউলা সতীর যে লাচ দেখে ভুলেছিল বুড়া শিবের মন! আবার সুরেলা ছড়া কাটা বন্ধ করে বলে যায়, শিবের আজ্ঞায় বিষহরি ফিরায়ে দিছিল সতীর মরা পতিকে সেই লাচ লাচবি। বাবুদের রাঙ্গা মন জাগিয়ে ভিক্ষার ঝুলিতে ভর‍্যা নিয়া গরবিনী সাজবি! বাবুর হাতের আংটি লিবি, লয় তো লিবি সোনার মোহর—তবে ফির‍্যা দিবি সেই রাঙ্গা মন!

কথা শেষ করেই গান ধরে নাচ শুরু করে। এক হাত থাকে মাথার উপর, এক হাত রাখে কাঁখালে, পা দুটি জোড় করে সাপের পাকের মত পাকে পাকে দুলিয়ে নাচে, সে পাক পা থেকে যেন ঠিক সাপের পাকের মতই দেহের উপর দিকে ওঠে।

উর্‌র্—হায় হায় লাজে মরি
আমার মরণ ক্যানে হয় না হরি—!
আমার, পতির মরণ সাপের বিষে
আমার মরণ কিসে গ!
মদন পোড়া চিতের ছাইয়ের
কে দেবে হায় দিশে গ!
রঙ্গ মেখ্যা সেই পোড়া ছাই
ধৈরয মুই ধরি গ ধৈরয মুই ধরি—!

বেহুলার গান। এ গান রচনা করেছে কোন্ বিষবেদেদের কবি, ওরাই গায়। এ গান গাইবার সময় বেহুলার মত চোখের কোণ থেকে জলের ধারা নেমে আসার কথা; বেহুলা যখন দেবসভায় মৃত লখিন্দরকে স্মরণ করে নেচেছিল তখন চোখের জলে তার বুক ভেসেছিল। কিন্তু

মায়াবিনী বেদের কন্যে যখন গান গেয়ে নাচে তখন তার চোখ থেকে জলের ধারা নামে না, ওদের সরু অথচ লম্বা চোখ ও ভুরু দুটি কটাক্ষভঙ্গির টানে বেঁকে হয়ে ওঠে গুণ-টানা ধনুকের মত। লাস্যের তূনির খালি করে সম্মোহন বাণের পর বাণ নিক্ষেপ ক'রে স্থানটার আকাশ-বাতাস যেন আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। দর্শকেরা সত্যই সম্মোহিত হয়ে পড়ে।

শিবরাম বলেন—বুড়ো শিব বেহুলা সতীর নৃত্য দেখে মোহিত হয়ে কন্যা বিষহরিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে। বেদের কন্যে বাবুদের মোহিত করে বিদায় চায়, টাকা চায় দুহাত ভরে।

ধনীর বাড়ীতে বারান্দায় বসেছিলেন তরুণ গৃহস্বামী আর তাঁর সঙ্গীরা। সামনে বাগানে নাচছিল শবলা। অন্দর থেকে ফিরে শিবরাম থমকে দাঁড়ালেন।

গৃহস্বামী তাঁকে দেখেও দেখলেন না। দেখবার তখন অবকাশ ছিল না তাঁর। বেদের মেয়েও তাঁর দিকে ফিরে তাকালে না। তারই বা অবকাশ কোথায়? দেবসভায় অপ্সরা নৃত্যের কথা শিবরামের মনে পড়ে গেল। দেবতারাও মোহগ্রস্ত, নৃত্যপরা অপ্সরা নৃত্যলাস্যে মোহবিস্তার করতে গিয়ে নিজেও হয়েছে মোহগ্রস্ত। শবলার চোখেও নেশার ছটা লেগেছে। সে রূপবান তরুণ গৃহস্বামীর কাছে হাত পেতেছে, বলছে—মুই বেদের কন্যে, কালনাগিনীর পারা কালো আঁধার, রাঙা হাত মুই কোথাকে পাব? কিন্তুক লাজ নাই বেদেনীর, লাজের মাথা খেয়ে তবে তো দেখাতে পেরেছি লাচন। তাই বাবু মোর সোনার লখিন্দর, বাবুর ছামনে পাতলাম কালো আঁধার হাত!

হেসে বাবু বললেন—কি চাই বল্?

—দাও, রাঙা বরণ শাড়ি দাও; দেখ কি কাপড় পরে রইছি দেখ!

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হয়ে গেল। নতুন লাল রঙের শাড়ি এখুনি এনে দাও দোকান থেকে। জলদি।

লোক ছুটল সঙ্গে সঙ্গে।

—আর একটা টাকা দাও একে।

বেদেনী বলে উঠল—উঁহু উঁহু, টাকা কি লিব? টাকা লিব না মুই! সোনা লিব—তুমার সোনার বরণ অঙ্গে কত সোনা রইছে, দুই হাতে অতগুলান অঙ্গুরি, গলায় হার—হাতে তাগা, ওই একটুকরা লিবে কালামুখী কালোবরণী কালনাগিনী বেদের কন্তে!

দুটো চোখ থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে কটাক্ষ হানছিল সে।

তরুণ গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ হাত থেকে একটি আংটি খুলে বললেন—নে!

এবার বেদেনী খিল-খিল ক'রে হেসে উঠে খানিকটা পিছিয়ে গেল।—ইরে বাবা রে!

—কি? কি হ'ল?

শবলা হেসে বলে—ই—বাবা গ! সব্বনাশ সব্বনাশ! উ লিলি পর আমার পরান যাবে, আপনার মান্তি যাবে। বেদে বুড়া দেখলি পর টুঁটি টিপে ধরবে, লয় তো বুকে বিন্ধে দিবে লোহার শলা। আর গিন্নী মা দেখলি পর মোর মাথায় মারবেন ঝাঁটা। আপনার খালি আঙুল দেখ্যা গোসা কর‍্যা ঘরে গিয়া খিল দিবেন কি চল্যা যাবেন বাপের ঘর।

হেসে তরুণ গৃহস্বামী আংটিটা আবার আঙুলে পরলেন, বললেন—তবে চাইলি কেন?

—দেখলাম আমার সোনার লখিন্দরের কালনাগিনীর পরে ভালবাসাটা খাঁটি না মেকী!

—কি দেখলি ?

—খাঁটি, খাঁটি ! হঠাৎ মুখে কাপড় দিয়ে হেসে উঠল, বললে—খাঁটিই হয় গো সোনার লখিন্দর ! তাতেই তো লাগের বিষে মরে না লখিন্দর, লাগিনীর বিষে মরে !

ঠিক এই সময়েই বাজার থেকে লোক ফিরে এল লাল রঙের চন্দ্রকোণা শাড়ি নিয়ে। টকটকে লাল রঙের শাড়ি, তারও চেয়ে গাঢ় লাল রঙের পাড়। চকচক করে উঠল বেদেনীর চোখ !

কাপড়খানা গায়ে জড়িয়ে নতুন কাপড়ের গন্ধ নাকে শুকে সে বললে—আঃ !

—পছন্দ হয়েছে ?

—হবে না ? চাঁদের পারা বদন তুমার, তুমার দেওয়া জিনিস কি অপছন্দ হয় ? অখুন—বিদায় কর !

—আর কি চাই বল্ ? আঙটি চাইলি, দিতে গেলাম, নিলি নে—

—দাও। যখুন দিবার তরে মন উঠছে, পোড়াকপালী বেদের বেটীর কপাল ফিরেছে, তখুন দাও, আংটির দাম পাচটা টাকা দিবার হুকুম কর। তুমি হাত ঝাড়লে হামরাদের তাই পব্বত। দিয়া দাও পাঁচটা টাকা !

তাও হুকুম হ'ল দিতে।

পাওনা নিয়েই ছুটতে শুরু করলে। বেদের মেয়েটার চলন কি দ্রুত ! মাঠের মধ্যে সাপের পিছনে তাড়া ক'রে সাপের নাগাল নেয়,—বেদের মেয়েদের চলনই খর, বলনও খর, চাউনিও খর। শবলা আবার তাদের মধ্যে অদ্বিতীয়া। বিচিত্র বেদের মেয়েদের মধ্যে ও আবার আরও বিচিত্র।

বাবু হাঁকলেন—দাঁড়া দাঁড়া। এই বেদেনী, এই !

দাঁড়াল শবলা। এরই মধ্যে সে প্রায় হাত বিশেক চলে গেছে।

ফিরে দাঁড়িয়ে অতি মধুর এবং অতি চতুর হাসি হাসলে সে। বললে—

আজ আর লয় সোনার লখিন্দর, উই তাকায়ে দ্যাখেন পছিম আকাশ বাগে—বেলা হিলে গেল্‌ছে, সুয্যি দেবতায় লালি ধরেছে; সাঁঝ আসছে নেম্যা। যাব সেই কত পথ। শিয়াল ডাকবার আগে ঘরকে যেতে না পারলি ঘরে লিবে না, জাতে ঠেলবে। বলেই হেসে সুর করে বলে :

"শিয়াল ডাকিলি পরে, বেদেরা না লিবে ঘরে
অভাগিনীর যাবে জাতিকুল।"

তারপরই ছড়া ছেড়ে সহজ ক'রে বললে—বেশ চুপিচুপি বলার ভঙ্গিতে বললে—তুমি জান না সোনার লখিন্দর, তুমি বেদের কন্যেরে জান না। বেদের কন্যের লাজ নাই, শরম নাই, বেদের কন্যের ধরম নাই, বেদের কন্যের ঘরের মায়া নাই; বেদের কন্যে বেদেনী অবিশ্বাসিনী। রীত চরিত তার লাগের কন্যে লাগিনীর মতুন। রাত লাগলি, আঁধার নামলি চোখে নেশা লাগে বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে, লাগিনীর মতন সনসনিয়ে চলে, ফণা তুলে লাচে। সে লাচন যে দেখে সে সংসার ভুলে যায়।

চোখ দুটো তার ঝকঝক ক'রে উঠল একবার।

বললে—সে নাচন তুমাকে দেখাবার উপায় নাই সোনার লখিন্দর।

তারপর সে আবার ছুটল। সত্যসত্যই সে ছুটতে শুরু করল। ওদিকে সূর্য প্রায় দিগন্তের কোলে নেমেছে, রঙ তার লাল হ'য়ে উঠেছে। সন্ধ্যা হতে খুব দেরি নাই! শবলা মিথ্যা বলে নাই, শিবরাম জানেন, শুনেছেন; ওই যে বার গিয়েছিলেন হিজলবিলের ধারে সাঁতালী গাঁয়ে, সেবারেই শুনে এসেছিলেন, সন্ধ্যার শিবারবের পর যে বেদের মেয়ে গাঁয়ের বা আস্তানার বাইরে রইল, তার আর ঘরে প্রবেশাধিকার রইল না।

অন্তত সে রাত্রির মত রইল না। পরের দিন সকালে তাকে সাক্ষীসাবুদ নিয়ে শিরবেদের সম্মুখে এসে দাঁড়াতে হবে, প্রমাণ করতে হবে, সে সন্ধ্যের সময় পর্যন্ত কোনমতেই ঘর পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে পারে নাই এবং সন্ধ্যের সময়েই সে আশ্রয় নিয়েছিল কোন সৎগৃহস্থের ঘরে, কোন অপরাধে সে অপরাধিনী নয়। তবে সে পায় ঘরে ঢুকতে। প্রমাণে এতটুকু খুঁত বের হ'লে দিতে হয় জরিমানা। এর উপর খেতে হয় বেদের প্রহার।

শবলা নাগিনী কন্যা, পাঁচ বছর বয়সের আগে নিজের স্বামীকে খেয়ে সে প্রায় চিরকুমারী, কিন্তু আস্তানায় বা ঘরে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকে স্বয়ং শিরবেদে। নাগিনী কন্যাকে যদি স্পর্শ করে ব্যাভিচারের অপরাধ তবে গোটা বেদে সমাজের মুখে কালি পড়বে, মা-বিষহরি তার হাতে পূজা নেবেন না। পরকালে পিতাপুরুষদের অধোগতি হবে! সন্ধ্যার শিবাধ্বনি কানে ঢুকবামাত্র শিরবেদে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে মা-বিষহরির নাম নিয়ে প্রণাম করবে।—জয় মা-বিষহরি, জয় মা-মনসা!

কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করেই হাঁকবে—কন্যে!

—হাঁ গ, সন্ঝার প্রদীপ জ্বালছি গ! উত্তর দিতে হবে নাগিনী কন্যাকে।

ছুটে চলল শবলা।

গঙ্গার ঘাটের দিকে চলল, তারপর সেখান থেকে গঙ্গার কূলের পথ ধরে তাকে হাঁটতে হবে অনেকটা। তার আকর্ষণে ছাগলটা বাঁদর দুটোও ছুটছে।

দর্শকদের সঙ্গে শিবরামও দাঁড়িয়ে রইলেন তার দিকে চেয়ে। মেয়েটার ছুটে চলাও বিচিত্র, সজাগ হয়েই ছুটে চলছে বোধ হয় মেয়েটা, দর্শকেরা যে তার পিছনে তারই দিকে চেয়ে রয়েছে এ কথা সে মুহূর্তের

জন্যও ভুলছে না। ছুটে চলার মধ্যেও তার তন্বী দেহের হিল্লোল অটুট রেখে ছুটে চলেছে। নাচতে নাচতেই ছুটছে মেয়েটা।

শিবরামের মনে হল—মেয়েটার মুখে হাসির রেশ ফুটে রয়েছে। সে নিশ্চয় ক'রে জানে যে দর্শকেরা মোহগ্রস্তের মত এখনও তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

দেখতে দেখতে গঙ্গার কূলের জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল বেদের মেয়ে।

শিবরাম বলেন—পরের দিন সকালেই মহাদেব এসে দাঁড়াল ধূর্জটি কবিরাজের উঠানে। চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি, কাঁধে সাপের বাঁক নাই, হাতে ডমরুর মত আকারের বাদ্যযন্ত্রটা নাই, তুমড়ি বাঁশীও নাই; হাতে শুধু লোহার ডাণ্ডাটাই আছে।

—বাবা!

তখনও প্রায় ভোর বেলা। ধূর্জটি কবিরাজ চিরটাকাল রাত্রির শেষ প্রহরে শয্যাত্যাগ ক'রে প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করতেন ঠিক উদয়-মুহূর্তে। সূর্যোদয় না হ'লে দিবাগণনা হয় না বলেই অপেক্ষা ক'রে থাকতেন—স্তবপাঠ ইত্যাদি করতেন। দিনের দেবতার উদয় হলেই গঙ্গাস্নান করে ফিরে পূজায় বসতেন। কবিরাজ সবে স্নান সেরে বাড়ী ঢুকছেন—ওদিক থেকে ব্যস্ত হয়েই এসে উপস্থিত হ'ল মহাদেব।

—কি মহাদেব? এই ভোরে—?

তার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বললেন—এই ভাবে? কি ব্যাপার?

শহরে এসে মধ্যে মধ্যে ওরা মহামারীতে আক্রান্ত হয়। নগদ পয়সা হাতে পেয়ে শহরের খাদ্য-অখাদ্য খায় আকণ্ঠ পুরে। দিনে দুপুরে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়, তৃষ্ণা পায়। সে তৃষ্ণা মেটাতে যে-কোন স্থানের জল গ্রহণে ওদের দ্বিধা নেই, সুতরাং মহামারীর আর আশ্চর্য কি?

মহাদেব বললে—বিপদ হ'ল বাবা, ছুটে এলম। হেথা তুমি ছাড়া হামরাদের কে রইছে কও?

—কি হ'ল?

—একটা ছোড়া মরিছে কাল রাতে।

—মরেছে? কি হয়েছিল?

—কি হবে বাবা? বেদের মিত্যু লাগের মুখে। সপ্যাঘাত হইছে।

—সর্পাঘাত?

—হঁ৷ বাবা। সাক্ষাৎ কাল। এক আকামা রাজগোখুরা। কি ক'রে আজ্ঞা খুলল ঝাঁপি, কে জানে? পেলে ছোড়াকে ছামুতে, পিছা ফিরা৷ বসেছিল—পিঠের উপর মাথা ঠুঁকে দিলেক ছোবল। এক্কেরে এক খামচ মাস খাবলে তুলে নিলে। কিছুতে কিছু হল নাই—দণ্ড দুইয়ের ভিতর শ্যাষ হয়ে গেল! এখুন বাবা, ইটা হ'ল শহর-বাজার ঠাঁই, অপঘাত মিত্যুর নাকি তদন্ত হবে থানাতে। আপুনি একটা চিরকুট লিখে দাও বাবা দরোগাকে!

—বস।

হাত জোড় ক'রে মহাদেব বললে—অভয় পাই তো একটি কথা বলি বাবা ধন্বন্তরি!

—বল।

—চিরকুট লিখ্যা এই বাবাঠাকুরের হাত দিয়া—ইয়ারে মোর সাথে দাও। দারোগার সাথে কথা, কি বলতি কি বুলব—বাবা—।

সুরে ভঙ্গিমায় অসমাপ্ত থেকে গেল মহাদেবের কথা। বলতে পারলে না, হয় তো জানে না বাক্যের রীতি অথবা সাহস করলে না অনুরোধ পুনরাবৃত্তি করতে।

আচার্য ভাবছিলেন। ভাবছিলেন আয়ুর্বেদ ভবনের সুবিধা অসুবিধার কথা, শিষ্যের অসুবিধার কথাও মনে হচ্ছিল।

হাত জোড় করে মহাদেব বললে—বাবা, কাল নিয়ে খেলা করি, মরি বাঁচি ডর করি না, কিন্তুক থানা-পুলিশ যমের বাড়া, উরা বাবা, সাক্ষাৎ বাঘ। দেখলি পরেই পরানটা খাঁচাছাড়া হয়্যা যায় গ।

এবার হেসে ফেললেন ধূর্জটি কবিরাজ। শিবরামের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার হয় তো একটু কষ্ট হবে শিবরাম, তবে এদের জন্য কষ্ট করলে পুণ্য আছে, তুমি যাও একবার। দারোগাকে আমার নাম ক'রে বলো। অযথা কোন কষ্ট যেন না দেন। তুমি না গেলে হয় তো হয়রানির ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করবে। বুঝেছ?

শিবরাম উঠলেন। বললেন—আমি যাচ্ছি!

জোয়ান বেদের ছেলে। মৃতদেহটা দেখে মনে হচ্ছিল, কালো কষ্টিপাথরে গড়া একটা মূর্তি, সুন্দর সবল চেহারা। শুইয়ে রেখেছিল বেদেদের আস্তানার ঠিক মাঝখানে। মাথার শিয়রে কাঁদছিল তার মা। চারিদিকে আপন আপন আস্তানায় বেদেরা যেন অসাড় হয়ে বসে আছে। ছোট ছোট ছেলেগুলো শুধু দল-বেঁধে চঞ্চল হবার চেষ্টা করছে কিন্তু তাও ঠিক পেরে উঠছে না চঞ্চল হ'তে, বড় মানুষদের স্তম্ভিত ভাবের প্রভাব তাদেরও যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

শবলা দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছের ডাল ধ'রে; যেন ডালটা অবলম্বন ক'রে তবে দাঁড়াতে পেরেছে। অদ্ভুত চেহারা হয়েছে চঞ্চলা চপলা মেয়েটার মুখের। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওই মরা মানুষটার দিকে, কিন্তু তাকে সে দেখছে না, মনের ভিতরটা যেন বাইরে এসে ওই মরা মানুষটার উপরে শবাসনে বসে আছে। চোখের উপরে ভ্রূ দুটির মাঝখানে দুটি রেখা স্পষ্ট দাঁড়িয়ে উঠেছে।

দারোগা-পুলিশের তদন্ত অল্পেই মিটে গেল।

কি-ই বা আছে তদন্তের! সাপের ওঝার মৃত্যু সাধারণত সাপের বিষেই হয়ে থাকে। কাল নিয়ে খেলা করতে গেলে দশ দিন খেলোয়াড়ের, একদিন কালের। তার উপর বিখ্যাত ধূর্জটি কবিরাজের অনুরোধ নিয়ে তাঁর শিষ্য শিবরাম উপস্থিত। নইলে এমন ক্ষেত্রে অল্পস্বল্পও কিছু আদায় করে পুলিশ। দারোগা শবসংকারের অনুমতি দিয়ে চলে গেলেন।

মহাদেব দেখালে সমস্ত। সাপটা দেখালে। প্রকাণ্ড একটা দুধে গোখুরো। সাদা রঙের গোখুরো খুব বিরল। কদাচিৎ পাওয়া যায়। বেদেরা বলে রাজার ভিটে ছাড়া দুধে গোখুরো বাস করে না। রাজবংশের ভাগ্যপ্রতিষ্ঠা যখন হয়—বংশের লক্ষ্মী যখন রাজলক্ষ্মীর মর্যাদা পান, তখনই হয় ওর আবির্ভাব। লক্ষ্মীর মাথার উপর ছত্র ধরে সে-ই তাঁকে দেয় ওই গৌরব। তারপর রাজবংশের ভাগ্য ভাঙে, বংশ শেষ হয়ে যায়, রাজপুরী ভেঙে পড়ে, লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হন, চলে যান স্বস্থানে—ওকেই রেখে যান ভাঙা পুরী পাহারা দেবার জন্যে। ভাঙাপুরীর খিলানে খিলানে—ফাটলে ফাটলে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়ায়। অনধিকারী মন্দ অভিপ্রায়ে এই ভাঙা পুরীতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে দণ্ড ধ'রে অর্থাৎ ফণা তুলে দাঁড়ায়। মন্দ অভিপ্রায়

না থাকলে তুমি যাও, ও সাড়া দেবে না; তুমি ঘুরে ফিরে দেখবে—ও তোমাকে দেখবে, নিজের অস্তিত্ব জানতে দেবে না, পাছে তুমি ভয় পাও, তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে হয় তো বড়জোর ও-ও নিশ্বাস ফেলবে। হঠাৎ যদি তোমার প্রবেশ-মুখে ও বাইরেই থাকে, চোখে পড়ে তোমার, তবে তৎক্ষণাৎ ও দ্রুতবেগে চলে যাবে কোন্ অন্ধকারে। লুকিয়ে পড়বে। মুখে ওর ভাষা নাই, ভাষা থাকলে শুনতে পেতে, ও বলছে—ভয় নাই! ভয় নাই! এস, দেখ!

—মালদহে দেখেছিলম বাবা। মহাদেব বললে—তখুন মুই ভর্তি জোয়ান। মোর বাপ শঙ্কর শিরবেদে বেঁচ্যা! অরুণ্যে ভরা ভাঙাভগ্ন পুরী, ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা দেখছি। আর বিধাতারে বুলছি—হায় বিধেতা, হায় রে! এ কি তোর খেলা! ই গড়াই বা ক্যানে—আর গড়লি যদি তবে ভাঙাই বা ক্যানে! ঘুরতে ঘুরতে মনে হল, এই এত বড় রাজবাড়ী, ইয়ার কুথা আছে তোষাখানা? সিথানে কি সোনা-দানা-হীরে-মানিকের কিছুই নাই পড়ে? কি বুলব বাবা, মাথার উপর উঠল গর্জন—ফোঁ-ফোঁ-ফোঁ! শুন্যা পরানটা উড়ে গেল। এক্কেরে মাথার উপরে যে, ফিরে তাকাবার সময় নাই! শিরে হৈলে সর্প্যাঘাত, তাগা বাঁধব কুথা! তবে বেদের বেটা—ভয় তো করি না। বুদ্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লম ঝপ করে। তাবাদে মাথা তুলে উপর বাগে তাকালম! দেখি, খিলানের ফাটল থেক্যা এই হাত থানেক দেহখানা বার ক'রে দণ্ড ধ'রে গর্জাইছে! এই কুলার মতন ফণা, এই সোনার বরণ চক্ক, দুধের মতুন দেহের রঙ! মরি মরি মরি! কি বুলব বাবা, মন আমার মোহিত হয়ে গেল! বেদের কুলে জন্ম নিছি, হিজলবিলের ধারে সাঁতালী গাঁয়ে বাস—পাতালে নাগলোকে যত নাগ সাঁতালীর ঘাস বনে, গাছে, কোটরেও তত নাগ। কিন্তুক এমুনটি তো দেখি

নাই? মনটা নেচ্যা উঠল বাবা। ভাবলম-ইয়ারে যদি ধরতে না পারি তো কিসের বেদে মুই? খানিক পিছিয়ে এলম, দাঁড়ালম বাবা খুঁট লিয়ে! আয়, তু আয়! মনে মনে ডাকলম মা-বিষহরিকে, ডাকলম কাললাগিনী বেটীকে! হাঁকতে লাগলম মন্তর! সেও থির, মুইও থির। কে জেতে কে হারে! ভাবলম, ফাঁস বানায়ে মারব ছুঁড়ে শেষ পর্যন্ত। পিছন থেকে মোর বাপ হাঁক দিলেক—খবরদার! মুখ ফিরাবার জো নাই বাবা, আমি ফিরাব চোখ তো উ মারবে ছোবল, উ নামাবে মাথা তো মুই দোব ছোঁ। মুখ না ফিরায়ে মুই বাপকে কইলাম, এস তুমি আগায়ে এস—মুই ঠিক আছি। ধর তুমি। বাপ কইল—না। পিছায়ে আয় পায়ে পায়ে। উনি হলেন রাজ-গোখুর, এ পুরীর আগলদার—সাক্ষাৎ কাল! ওঁরে ধরে কেউ বাঁচে না। পিছায়ে আয়! বাপের হুকুম—শিরবেদের আদেশ বাবা, দু পা পিছায়ে গেলম। সেও খানিক দেহ গুটায়ে ঢুকায়ে নিলে, ফণাটা খানিক ছোট হল। বাবা কইলে—সব্বনাশ করেছিলি! ওঁরে ধরতে নাই। বেদের বেটা ধরতে হয় তো পারবি। কিন্তুক মুখে রক্ত উঠ্যা মরে যাবি—নয় তো যেতে হবে ওই ওঁর বিষে। তা—উনি এমুন দণ্ড ধরে দাঁড়ালেন ক্যানে? ওরে তেড়ে ছিলি? না—মনে মনে পাপ ভাবনা ভেবেছিলি? গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিলি? বললম—কি ক'রে জানলা গ? বাবা কইল বৃত্তান্ত। কইল, পাপ বাসনা মুছে ফেল্, ভুলে যা। দেবতারে পেনাম কর‍্যা আস্তানায় চল্। নইলে নিস্তার পাবি নাই। মনের বাসনা মনে ডুবালম—মুছে দিলম। বুললম, দেবতা, তুমি ক্ষমা কর। ব্যস্ বাবা, নিমিখ্ ফেলতে ফেলতে দেখি—আর নাই তিনি! ঢুকে গেছেন। ফিরে এলম। তার পরে গিয়েছি বাবা সেই ভিটেতে, মনে মনে বলেছি

—ক্ষমা কর দেবতা, কোন বাসনা নিয়ে আসি নাই, এসেছি দেখতে, নয়ন সাথক করতে। আর কোন দিন দেখা পাই নাই।

নিজের গল্প শেষ ক'রে মহাদেব বললে—কাল বাবা, দেখি, ই ছোঁড়া ধরে এনেছে, সেই এক রাজগোক্ষুর, সাক্ষাৎ কাল। বাবা, শিবের বরণ হল দুধের মতুন, তার অঙ্গের পরশ ছাড়া ই বরণ উ পাবে কুথা? বেদের ছেলে, ই কথা না-জানা লয়, মুই কতবার ই কাহিনী বুলেছি। জানে ভালমতে। কিন্তুক ওর নেয়ত। ওর রীতচরিতটা খারাপ ছিল—এমুনি হবে মুই জানতম। জোয়ান বয়েস কার না হয় বাবা! ই ছোঁড়ার জোয়ান বয়স হ'ল—যেন সাপের পাঁচপা দেখলে! রক্তের তেজে ধরাখানা হ'ল সরা। যত কিছু মানা আছে বেদের কুলে—সে-ই করতে ছিল উয়ার ঝোঁক। লইলে বাবা—

হঠাৎ ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠল মহাদেবের মুখ, কণ্ঠস্বরে বেজে উঠল যেন বিষমঢাকির স্বর, সে প্রায় গর্জন ক'রে উঠল, ফেটে পড়ল সে, বললে—লইলে বাবা, লাগিনী কন্যে বেদের কুলের কন্যে—লক্ষ্মী, তার দিকে দিষ্টি পড়ে বাবা?

—এই উয়ার নিয়ত। এই উয়ার নিয়ত! মাথা ঝাঁকি দিয়ে উঠল মহাদেব, ঝাঁকড়া চুল দুলে উঠল। পাপ কথা উচ্চারণ ক'রে সম্ভবত প্রায়শ্চিত্তের জন্য দেবতার নাম স্মরণ ক'রলে সে—জয় বাবা মহাদেব, জয় মা-বিষহরি, জয় মা-চণ্ডী, ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর!

সমস্ত স্থানটা থম থম করছিল। গঙ্গার ওপারের তটভূমিতে তখনও শোনা যাচ্ছিল মহাদেবের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি। আর উঠছিল গঙ্গার স্রোতের কুল কুল শব্দ, এবং উত্তর বাতাসে অশ্বত্থ ও বটগাছের পাতায় পাতায় মৃদু সর-সর ধ্বনি, মধ্যে মধ্যে দুটো-একটা পাতা ঝ'রে ঘুরতে ঘুরতে মাটির উপর এসে পড়ছিল। বেদেদের সকলে স্তব্ধ, ছেলেগুলো

পর্যন্ত ভয় পেয়ে চুপ ক'রে গিয়েছে, সভয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহাদেবের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে। শবলা শুধু একবার ফিরে তাকালে মহাদেবের দিকে, তারপর আবার যেমন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

মহাদেব মনের আবেগে ব'লেই যাচ্ছিল, বলে কথা যেন শেষ ক'রতে পারছে না। সে আবার বললে—আমি জানতম। আমি জানতম। এমন হবে আমি জানতম। কন্যে চান করে বিলে, ছোঁড়াটা লুকায়ে দেখে। আমি সাবধান ক'রে দিছি। চুলের মুঠা ধ'রে মারছি। তবু উয়ার লালস মিটল না। ওই কন্যেটা—ওই যে লাগিনীর জাত, উ একদিন, বাবা, কন্যের রূপ ধ'রে ছলেছিল গোটা বেদের জাতটারে। জনমে জনমে উ ছলনা করে বাবা। ছোঁড়ার নেয়ত! ছোঁড়া কাল গেছিল দুই মা-গঙ্গার দুই পাড়ে—ভাঙা লবাববাড়ীর জঙ্গলের দিকে। সেখানে ছিলেন এই দেবতা। এসে বুললে—শবলারে। শবলা বুললে—বেদের বেটা লাগ দেখ্যা ছেড়্যা দিয়া এলি—কি রকম বেদের বেটা তু? যা ধর্যা নিয়ে আয়। জোয়ান বেদের বেটা, তার উপর, শবলা বুলেছে আর রক্ষা আছে বাবা! নিয়া এল ধর্যা। আমি দেখলম, দেখ্যা শিউরে উঠলম। বললম—ছেড়্যা দে, লইলে মরবি। কিছুতে রাজী হয় না; শ্যাষ আমি কেড়ে নিলম বাবা। সাঝ হয়ে গেছিল, ঝাঁপিতে ভর্যা রেখে দিলম, ভাবলম—কাল সকালে ছেড়্যা দিয়া আসব স্বস্থানে। ওর নেয়ত, আমি কি করব, বলেন? রাতের বেলা ঝাঁপি ঠেল্যা বেরিয়েছে সাক্ষাৎ কাল; ইদিকে ছোঁড়া গাঙের ধারে গিয়া বস্যা কি ক'রছিল কে জানে? পিছা থেকে সাপটা গিয়া একেরে পিঠের মেরু-দণ্ডের 'পরে দিছে ছোবল। ছোঁড়া ঘুর্যা দেখে কাল। বেদের বেটা, হাতে ছিল লোহার ডাণ্ডা, দিলেক পিটায়ে।

প্রকাণ্ড দুধে গোখুরাটার নির্জীব দেহটা খানিকটা দূরে একটা ঝুড়ির নীচে ঢাকা ছিল। পাছে কাক চিল বা অন্য কোন মৃত মাংসলোভী পাখী ওটাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে—সেই ভয়েই ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছে। ঝুড়িটা তুলে মহাদেব বললে—দেখেন, নিজের পাপে নিজে মরেছে ছোঁড়া, আবার মরণের কালে ই কি পাপ করে গেল, দেখেন। কি, দেবতার মতুন দেহ দেখেন। কি সোনার ছাতার মতুন চক্ক দেখেন। ই পাপ অর্সাবে বেদে গুষ্টির উপর!

এতক্ষণে কথা বললে শবলা, শবদেহটার উপর থেকে দৃষ্টি তার ফিরে আবদ্ধ হ'য়েছিল মহাদেবের উপর। কখন যে ফিরেছিল কেউ লক্ষ্য করে নাই। উত্তেজিত মহাদেবের কথা শুনে লোকে তার দিকেই তাকিয়েছিল, তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'য়েছিল সাপটার উপর। সত্যই সাপটার দেহ-বর্ণ অপরূপ, এমন দুধের মত সাদা গোখুরো সাপ দেখা যায় না। ওরই মধ্যে শবলা কখন দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকিয়েছিল মহাদেবের দিকে। সে ব'লে উঠল, ই পাপ অর্সাবে তুকে। বেদে গুষ্টির পাপ ইতে নাই। পাপ তুর!

চমকে উঠল মহাদেব।

তিক্ত কুটিল হাসিতে শবলার ঠোঁট দুটি বেঁকে গিয়েছে, নাকের ডগাটা ফুলে-ফুলে উঠছে। চোখের দৃষ্টিতে আক্রোশ যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কোন অগ্নিকুণ্ডের ছাইয়ের আবরণ যেন অকস্মাৎ একটা দমকা বাতাসে উড়ে গিয়ে বাতাসের স্পর্শে মুহূর্তে মুহূর্তে দীপ্যমান হয়ে উঠছে। মহাদেবের কোন্ কথা যে দমকা বাতাসের কাজ করলে, শবলার চোখের দৃষ্টি থেকে উদাসীনতার স্তিমিত ভাবের ছাইয়ের আবরণ উড়িয়ে দিলে সে-কথা জানে ওই শবলাই।

মহাদেব তার কথা শুনে চমকে উঠেছিল, তার দিকে তাকিয়ে যেন থমকে গেল।

শবলার মুখের তিক্ত হাসি আরও একটু স্পষ্ট হ'য়ে উঠল—একটু বেশি টান দিলে তার দুই ঠোঁটের কোণে; মহাদেবের চমক দেখে এবং তাকে থমকে যেতে দেখে সে খুশি হ'য়ে উঠেছে যেন, মহাদেবের স্তম্ভিত ভাবের অবসরে সে নিজের কথাটা আরও দৃঢ় ক'রে বলে উঠল, বললে—শুধু ওই রাজনাগের মরণের পাপই লয় বুড়া, ওই বেদের ছাওয়াল মরল—তার পাপও বটে। দুই পাপই তুর।

রোষ এবং বিস্ময়ে মিশিয়ে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠছিল মহাদেবের মুখে,—কিন্তু সে যেন নিজেকে ঠিক প্রকাশ করতে পারছিল না, শুকনো বারুদ ঠিকই আছে কিন্তু আগুনের স্পর্শ পাচ্ছিল না। সে শুধু বললে—হামরার পাপ?

—হাঁ। তুর! তুর! বুড়া, তুর! বুল ক্যানে—উপরে রইছেন মাথার পরে দিনের ঠাকুর দিনমণি, পায়ের তলায় তুর মা-বসুমতী, তাকে মাথায় ধ'রে রইছেন মা-বিষহরির সহোদর বাসুকী। তুর ছামুতে রইছে মায়ের বারি—তু বুল—বুল বুড়া, পাপ কার?

এবার ফেটে পড়ল মহাদেব। চীৎকার ক'রে উঠল—শবলা!

সে হাঁক যেন মানুষের হাঁক নয়—সে যেন আত্মা চীৎকার ক'রে উঠল। সে আওয়াজে বেদেরা-যে-বেদেরা, যারা মহাদেবের সঙ্গে আজীবন বাস ক'রে আসছে, তারাও চমকে উঠল। শিবরাম চমকে উঠলেন, বেদেদের আস্তানায় গাছের ডালে বাঁধা বাঁদরগুলি চিক্ চিক্ ক'রে এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে পড়ল, ছাগলগুলি শুয়েছিল সভয়ে শব্দ ক'রে উঠে দাঁড়াল, গাছের মাথায় পাখী যারা ব'সেছিল, উড়ে

পালাল; শব্দটা গঙ্গার বুকের জল ঘেঁষে দুদিকে ছুটে চলে গেল, যেতে-যেতে আঁকে-বাঁকে ধাক্কা মেরে প্রতিধ্বনি তুললে—

শবলা!

শবলা!

শবলা!

ক্রমশ দূরে-দূরান্তরে গিয়ে শব্দটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে মিলিয়ে গেল। তখনও সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে র'য়েছে। শুধু শবলা গাছের ডালটা ছেড়ে দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। তারপর অতি মৃদু কণ্ঠে অল্প একটু হেসে বললে—তুই বিচার কর‍্যা দেখ! পাঁচজন রইছে, পঞ্চজনেও বিচার করুক। এই রইছেন ধন্বন্তরি বাবার শিষ্য—ওঁরেও শুধা। বুল রে বুড়া, তু যে লাগকে দেখে চিনলি রাজলাগ ব'লে, তু জানলি কি—ইয়ারে ধরলে মিত্যু থেকে নিস্তার নাই, মুয়ে তু বললি সি কথা, ছোঁড়াটার কাছ থেকে কেড়েও লিলি, কিন্তু ছেড়ে দিলি নাই ক্যানে? গাঙ পার কর‍্যা দেবলাগকে ছেড়্যা দিয়া যদি মেগে লিতিস তার মার্জনা—তবে বুল রে বুড়া, মরত ওই বেদের ছাওয়াল, না মরত ওই দেবলাগ? ই বার বিচার ক'রে দেখ্—পাঁচজনাতে দেখুক কার পাপ?

মহাদেব কথার উত্তর খুঁজে পেলে না।

শবলা শিবরামের দিকে তাকিয়ে বললে—কই, বুল তো তুমি ধন্বন্তরি-বাবার শিষ্য কচি-ধন্বন্তরি! বিচার কর তো তুমি।

শিবরামকেও বলতে হ'ল—হ্যাঁ, সাপটা তুমি সন্ধ্যেতেই যদি ছেড়ে দিয়ে আসতে মহাদেব! ভুল তোমার হ'য়েছে।

মহাদেব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বললে—হ্যাঁ, তা বুলতে পার গ। তবে ভুল তো এক রকমের নয়, ভুল দু-রকমের, এক ভুল মানুষ করে নিজের বুদ্ধির দোষে, আর এক ভুল সে ভুল নয় বাবা 'ভেরম্'—

'নেয়ত'—'অদেষ্ট' মানুষকে ভেরম করায়। এ সেই অদেষ্টের খেলা, 'নেয়ত' ভেরম করিয়ে দিলে।

আবার মহাদেব হঠাৎ উগ্র হয়ে উঠল, বললে—একবার বাবা, শিরবেদে বিশ্বম্ভরকে ছ'লেছিল অদেষ্ট ; নিয়তি কন্যে মূর্তি ধরে এসে কাললাগিনীকে বুকে ধরিয়েছিল—'ভেরমে' ফেলে বুঝিয়েছিল, সেই তার মরা কন্যে। এও তাই বাবা! ওই পাপিনী লাগিনী কন্যের ছলনা! ওই কন্যেটার মধ্যে পাপ ঢুকেছে বাবা। মহাপাপ। মা-বিষহরির সেবায় মন নাই, মন টলেছে কন্যের। লাগিনীর মন মেতেছে বয়সের নেশায়। ওই ছোঁড়াটারে উ ভুলায়েছিল। কাঁচা বয়স ছাওয়ালটার, তার উপর মরদ হয়্যা উঠেছিল ভারী জবর। আঁধারের মধ্যে যমকে দেখলে, তার পিছা-পিছা ছুটে যেত। ছোঁড়া সেই গরমে এতবড় ধরাকে দেখলে সরাখানা! লাগিনীর কাল বরনের চিক্‌চিকি আর চোখের ঝিকঝিকিতে মেতে গেল। বেদের ছাওয়াল, মানলে না বেদেদে কুল-শাসন, বুঝলে না লাগিনী হ'ল বেদে কুলের কন্যে, ও কন্যে মায়াবিনী, মায়াতে ভুলায়ে আপন বাসনা মিটায়ে লিয়ে ওই ওরে ডংশন করবে। ততটা দূর ঘটনাটা এগোয় নাই বাবা, যদি ততদূর যেত তবে ওই লাগিনীই ওরে ডংশন করত। বেদের সহায় মা-বিষহরি, মা বেদেদের সে পাপ থেক্যা রক্ষা ক'রেছেন—রাজগোখুরারে পাঠায়ে দিছেন, ওরে মোহিত করেছেন। ওই সব্বনাশী—

শবলাকে দেখিয়ে মহাদেব বললে—সব্বনাশী মায়ের ছলনা বুঝে নাই বাবা, বুঝলে ছোঁড়াটারে বারণ করত। বুলত, না, ধরিস না, উ সাক্ষাৎ কাল, মা তুকে আমাকে ছলতে পাঠায়েছেন ওই কালকে।

হাসলে মহাদেব—দেবছলনা বুঝা যায় না বাবা। মায়াবিনীই ছোঁড়ারে বুলেছিল—নিয়ে আয় ধরে। হোক দুধ বরন সাপ। মায়াবিনী

রাজগোখুরা চিনত নাই, চোখে দেখে নাই। ওরই কথাতে আনল ছোঁড়া ধর‍্যা। দেবতার ইচ্ছা, বুঝতে লারি বাবা, লইলে রাজগোখুরার শুধু তো ছোঁড়াটারে খাবার কথা লয়, পাপী-পাপিনী দুজনারে খাবার কথা, তা হ'ল নাই, শুধু ছোঁড়াটার জীবনটাই গেল!

তারপর শবলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—ওই কন্যেটার কপালে অনেক দুঃখ আছে বাবা। অনেক দুঃখ পেয়ে মরবে।

* * *

পরের দিন শিবরাম আবার গিয়েছিলেন বেদেদের আস্তানায়।

যার জন্য মহাদেব একদিন পাঁচ কুড়ি এক টাকা অর্থাৎ একশো এক টাকা চেয়েছিল—তাই দিতে চেয়েছে বিনা দক্ষিণায়, ওই দিনের পুলিশ তদন্তের সময় শিবরাম উপস্থিত ছিলেন—সেই কৃতজ্ঞতায় মহাদেব বলেছিল—আপনি যা করলে বাবা, তা কেউ করে না; বাবা ধন্বন্তরির দয়া হামরাদের 'পরে আছে, এই শহরে ওই মানুষটিই হামরাদের আপন জন, তাঁর কথাতেই আপনি এসেছ তা ঠিক, কিন্তক বাবা, এসেছ তো তুমি! আপনজনের মতুন কথা তো বুলেছ! আপনকার চরণে কাঁটা বিঁধলি পর দাঁতে কর‍্যা তুলে দিব আমি। কি দিব তুমাকে, বাবা, এই দুটি টাকা পেনামী—

শিবরাম বলেছিলেন—না-না-না। টাকা দিতে হবে না মহাদেব। টাকা আমি নেব না। যদি দেবেই কিছু, তবে আমাকে সাপ চিনিয়ে দিয়ো। আমি তোমাকে বলেছিলাম, মনে আছে?

—হুঁ হুঁ। আছে। দিব, তাই দিব। কাল আসিও আপনি। টাকা লাগবে না, কিছু লাগবে না, দিব, চিনায়ে দিব।

কিন্তু আশ্চর্য!

পরের দিন মহাদেব আর এক মহাদেব।

বসেছিল সে আচ্ছন্নের মত। নেশা করেছে। গাঁজার সঙ্গে সাপের বিষ মিশিয়ে খেয়েছে। তার সঙ্গে খেয়েছে মদ! নেশায় ঘোরালো চোখ দুটো মেলে সে শিবরামের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে—কি? কি বটে? কি চাই?

শিবরাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি কোন কথা বলবার পূর্বেই মহাদেব বলে উঠল—বেদের মেয়ের লোভে আসছ? আ! বলে দুপাটি বড় বড় অপরিচ্ছন্ন দাঁত বের করলে হিংস্র জানোয়ারের মত।

শিবরাম শিউরে উঠলেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন রক্তস্রোত শন্ শন্ করে বয়ে গেল। অত্মসম্বরণ করতে পারলেন না তিনি; বলে উঠলেন—কি বলছ তুমি?

—ঠিক বুলছি। মহাদেবের চোখ আবার তখন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে; কণ্ঠস্বর মাদকের জড়তায় জড়িয়ে এসেছে।

—না। কাল তুমি নিজে আসতে বলেছিলে, তাই এসেছি। টাকা দিতে এসেছিলে—আমি নিই নি, বলেছিলাম—

—অ। আবার চোখ দুটো বিস্ফারিত করে মহাদেব তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে—অ। কবিরাজ ঠাকুর! অ। আমি তুমারে চিনতে লেরেছি বাবা। নেশা করেছি, নেশা। তা—

আবার ঢুলতে লাগল সে। বিড় বিড় ক'রে বললে—এখুন লারব বাবা। এখুন হবে না! উঁ-হু! উঁ-হু! সে ধুলোর উপরেই শুয়ে পড়ল।

আর একজন বেদে এসে বললে—আপনি এখন ফিরে যাও বাবা। বুড়ার এখুন হুঁস নাই!

শিবরাম ক্ষুন্ন মনেই ফিরলেন। কিন্তু দোষ দেবেন কাকে? ওদের জীবনের ওই ধারা। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

পরের দিন ঠিক দুপুর বেলা—এল শবলা।

আরও একদিন সে যে সময়ে এসেছিল—ধূর্জটি কবিরাজ ছিলেন না, ঠিক তেমনি সময়ে। এসে সেই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডাকলে—কচি-ধন্বন্তরি! ছোট কবিরাজ গ!

বেরিয়ে এলেন শিবরাম।

—কি? কবিরাজ মশাই তো এ সময় বাড়ীতে থাকেন না। সেদিন তো বলেছি তোমাকে।

শবলা হেসে বললে—সে জেনেই তো আসছি গ। কাজ তো মোর তুমার সাথে।

—আমার সঙ্গে? বিস্মিত হলেন শিবরাম। মেয়েটার লাস্যময়ী রূপ তিনি সেদিন জমিদারবাড়ীতে দেখেছেন। কালো ক্ষীণাঙ্গী বেদের মেয়ে লাস্যময়ী রূপ যখন ধরে—তখন তাকে যেন আসব সরোবরে সগুস্নাতার মত মনে হয়। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন মদিরার ধারা বেয়ে নামে। মানুষ আত্মহারা হয়। ওই নির্জন দ্বিপ্রহরে ধূর্জটি কবিরাজ অনুপস্থিত জেনে মোহময়ী নাগিনী কন্যা কোন্ ছলনায় তাঁকে ছলতে এল! বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড তাঁর সঘন স্পন্দনে স্পন্দিত হতে শুরু হয়েছে তখন; মুখের সরসতা শুকিয়ে আসছে। চোখ দুটিতে বোধ হয় শঙ্কা এবং মোহ দুই-ই একসঙ্গে ফুটতে শুরু করেছে। শুষ্ককণ্ঠে তিনি বললেন—কেন, আমার সঙ্গে কি কাজ?

শবলা বললে—ভয় নাই গ ছোট কবিরাজ! তুমার সাথে দুপুর বেলা রঙ্গ করতে আসি নাই। বদন তুমার পসন্ন কর।

খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

সাপের ঝাঁপি নামিয়ে চেপে বসল শবলা। বললে—

কাল তুমি গেছিলা বুড়ার কাছে। কত টাকা দিছ বুড়ারে?

—টাকা?—

—হ্যাঁ। টাকা! পরশু—

—অ! হাঁ! পরশু যখন পুলিশ চলে গেল তখন বুড়ো আমাকে টাকা দিতে চেয়েছিল। আমি তো টাকা নিই নাই।

—হুঁ। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শবলা। তারপর বললে—ঘুষ দিবারে চেয়েছিল, লাও নাই, ধরমদেব তুমারে রক্ষা করেছেন গ! লিলে তুমারে নরহত্যের পাপের ভাগী হ'তে হ'ত। বুড়া জোয়ান বেদেটারে খুন করেছে।

চমকে উঠলেন শিবরাম। খুন? খুন করেছে?

—হাঁ গ। খুন! বুড়া রাজ-গোখুরাটারে কেড়ে লিলে, রাখলে ঝাঁপিতে ভর্য়া। মনে মনে মতলব কর্যাই ভর্য়া রেখেছিল। লইলে তো তখুনি যদি ছেড়ে দিত গাঙের ধারে—তবে ত ই বিপদ ঘটত না! মতলব করেছিল—রাতের বেলা ওই জোয়ানটা যখুন আড্ডা ছের্য়া—চুপিসারে বেরিয়ে যাবে আমার সন্ধানে—তখুনি পিছা পিছা গিয়া সাপটারে খোঁচা দিয়া দিবে পিছন থেকে ছেড়্যা! রাজগোখুরা—তারে আমারে দুজনারেই খাবে। ছোঁড়াটারে আমি বুলেছিলম গ! বারে বারে বুলেছিলম। কিন্তুক—

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে শবলা। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছলে। বললে—আমি লাগিনী কন্যে। আমার দিকে পুরুষকে তাকাইতে নাই। বেদের পুরুষের তো নাই-ই। তারে মোর ভাল লেগেছিল—সে মোর পিছা পিছা ঘুরছে বছর কালেরও বেশি। বুলেছিল, যা থাকে

মোর ললাটে তাই হবে, তবু তুর কামনা আমি ছাড়তে লারব; লারব, লারব, লারব। আমি তারে কত বুঝ বুঝাইছি—তবু সে মানে নাই, নিতুই রাতে গাঁয়ের ধারে—লয় তো গাঙের ধারে গিয়া বসে থাকত। আমি যেতাম না, তবু সে বসে থাকত। বলত, আসতে তুকে হবেই একদিন। যতদিন না আসবি—ততদিন ব'সে থাকব। বুড়া হব—সে দিন পর্যন্ত বসে থাকব। বুড়া জানত। বুড়াও তাই চেয়েছিল। আমার সাথে বুড়ার আর বনছে না। এই শহরে এসে মোর দেহেও কি হল কবরেজ! আমিও আর থকতে লারলম। আজ তিন দিন গাঙের ধারে তার সাথে দেখা আমিও করছিলম। মা-বিষহরির নাম নিয়া বুলছি কবরেজ—পাপ করি নাই, ধরম ছাড়ি নাই! শুধু গাঙের ধারে বস্যা বস্যা মা-বিষহরিরে ডেকেছি আর কেঁদেছি। কেঁদেছি আর বুলেছি, মা-গ—দয়া কর, আমার জীবনটা লাও—আমারে তুমি মুক্তি দাও। জোয়ানটাও পাপ ক'রে নাই কবিরাজ—মোর অঙ্গে হাত দেয় নাই, শুধু বুলেছে—শবলা, ই সব মিছা কথারে, সব মিছা কথা, মানুষ লাগিনী হয় না। চল্, আমরা দু জনাতে পালাই; পালাই চল্—দুই দেশান্তরে। দেশান্তরে গিয়া দুজনাতে ঘর বাঁধি। খাটি খাই, ঘর-কন্না করি। আমি শুনতম আর ভাবতম। ভাবতম আর কখুনও বা হাসতম, কখুনও বা কাঁদতম। কখুন মনে হ'ত—সে যা বুলছে সেই সত্যি, যাই—তার সাথেই চলে যাই, বিদেশে গিয়ে ঘর বাঁধি, সুখে থাকি! কখুনও বা মা-বিষহরির ভয়ে শিউরে উঠতম, বুকটা কেঁপ্যা উঠত, কাঁদতম। কাঁদতম আর বুলতম—না রে, না। না—ওরে না-না না। সাথে সাথে ডাকতম মা বিষহরিকে—বুলতম—ক্ষমা কর গ মা, দয়া কর গ মা—দয়া কর। দণ্ড যদি দিবা মা, তবে আমারে দাও। আমার জীবনটা তুমি নাও, বিষের

জ্বালায় জর-জর কর্যা আমার জীবনটা লাও। জোয়ান ছেলে, মরদ মানুষ—তারে কিছু বুলো না, তারে তুমি মাজ্জনা কর, দয়া কর, ক্ষমা কর।

বলতে বলতে চুপ ক'রে গেল শবলা; অকস্মাৎ উদাস হ'য়ে গেল—কথা বন্ধ ক'রে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। কার্তিকের মধ্যাহ্নের আকাশ। শরতের নীলের গাঢ়তা তখনও আকাশে ঝলমল করছে। কয়েক টুকরো সাদা মেঘও ভেসে যাচ্ছিল। বাতাসে শীতের স্পর্শ জেগেছে; গঙ্গার ওপারের মাঠে আউস ধান কাটা হ'য়ে গেছে, হৈমন্তী ধানের মাঠে—লঘু ধানে হলুদ রঙ ধরে আসছে, মোটা ধানের ক্ষেত সবুজ, শীষগুলি নুয়ে পড়েছে। রাস্তায় লোকজন নেই। মধ্যে মধ্যে গঙ্গার স্রোত বেয়ে দু-একখানা নৌকা চলেছে ভেসে।

শিবরাম বলেন—সে দিনের স্মৃতি আমার মনে এমন ছাপ রেখে গেছে যে, সে কখনও পুরানো হ'ল না। কালো মেয়ে শবলা সে কালের ছোপের মধ্যে মিলিয়ে যাবার নয়; সে কোনও দিনই যাবে না; কিন্তু সে দিনের আকাশ মাঠ গঙ্গা দুপুরের রোদ সব যেন আমার এই বুড়ো-বয়সের জরাচ্ছন্ন চোখের সামনেও সগু আঁকা ছবির মত টকটক করছে।

অনেকক্ষণ পর শবলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কথা বললে—তা—মা ক্ষমা করলে না। মায়ের ইচ্ছে ছাড়া তো কাজ হয় না কবিরাজ—তাই বুলছি এ কথা। লইলে—

ঝকমক ক'রে উঠল শবলার চোখ। সাদা দাঁতগুলি ঝিক্‌মিক্ করে উঠল—নিকষকালো নরম দুটি পাতলা ঠোঁটের ঘেরের মধ্যে। কণ্ঠস্বরের উদাসীনতা কেটে গেল—জ্বালা ধ'রে গেল কণ্ঠস্বরে, বললে—ওই—ওই বুড়া রাক্ষস উয়াকে খুন করেছে। অন্ধকারে চুপি চুপি গিয়া ছেড়ে দিলে রাজ-গোখুরাকে। ঝাঁপিটাকে ঝাঁকি দিলে লাগটারে

রাগায়ে দিয়া ঝাঁপিটার দড়ি টেনে ঢাকনাটা দিলে খুলে। সাপের আক্রোশ জান না কবিরাজ। বড় আক্রোশ। সে ছামুতে পেলে ছেলেটাকে! বুড়া ভেবেছিল, আমি সমেত আছি—খাবে আমারে উয়ারে দুজনারেই শেষ করবে লাগ। তা—

নিজের কপালে হাত দিয়ে শবলা বললে—তা আমার ললাটে এখুনও দুস্থু আছে, ভোগান্তি আছে, আমার জীবন যাবে ক্যানে!

ম্লান হাসি ফুটে উঠল তার মুখে—তারই মধ্যে ঢেকে গেল তার চোখের ঝকমকানির উগ্রতা। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

শিবরামও স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন।

মেয়েটার চোখের কয়ফোঁটা জলে যেন সব ভিজিয়ে দিয়েছিল। কার্তিকের দুপুরটা যেন মেঘলা হ'য়ে গিয়েছে মনের মধ্যে। মানুষের গভীর দুঃখ যখন স্বচ্ছন্দ প্রকাশের পথ পায় না, বুকের মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘোরে—তখন তার সংস্পর্শে এলে এমনিই হয়। কি বলবেন শিবরাম! চোরের মা যখন ছেলের জন্য ঘরের কোণে কি নির্জনে লুকিয়ে মৃদুগুঞ্জনে কাঁদে—তখন যে শোনে তার অন্তর শুধু বেদনায় বোবা হ'য়ে যায়, মুহ্যমান হ'য়ে যায়, সান্ত্বনা দিতেও পারা যায় না, অবজ্ঞা ক'রে তিরস্কারও করা যায় না। হতভাগিনী মেয়েটা ওদের সমাজধর্ম কুলধর্ম পালন করতে গিয়ে যে দুঃখ পাচ্ছে সে দুঃখকে অস্বীকার তো করা যায় না, আবার ওই কুলধর্ম অন্যায় মিথ্যে এ কথাই বা বলবেন কি ক'রে শিবরাম? ওই যে ছেলেটা ওর ওই যৌবনধর্মের আবেগে ওই নাগিনী কন্যাটির প্রতি আশক্তিই বা কি ক'রে সমর্থন করবেন? কিন্তু ছেলেটার মৃতদেহ মনে পড়ে এ কথাও মনে উঁকি মারতে ছাড়ছিল না যে, ওই কষ্টিপাথর-কেটে-গড়া মূর্তির মত ওই ছেলেটার পাশে এই নিকষকালো মেয়েটাকে মানাত বড় ভাল!

আচার্য ধূর্জটি কবিরাজকে লোকে বলে সাক্ষাৎ ধূর্জটি; পবিত্রচিত্ত কবিরাজ শিবের মতই কোমল—পরের দুঃখে বিগলিত হন এক মুহূর্তে, আবার অন্যায় অধর্মের বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষাৎ রুদ্র। তাঁরই শিষ্য শিবরাম। শবলাকে তিনি সান্ত্বনাও দিতে পারলেন না, তার দুঃখ বেদনাকে অস্বীকারও করতে পারলেন না। রোগযন্ত্রণায় অসহায় রুগ্নের দিকে যে বিচিত্র দৃষ্টিতে বিজ্ঞ চিকিৎসক তাকিয়ে থাকেন—সেই দৃষ্টিতে শবলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শবলা কিন্তু অতি বিচিত্র। অকস্মাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সব যেন ঝেড়ে ফেলে দিলে এক মুহূর্তে। বললে—দেখ, নিজের কথাই পাঁচ কাহন ক'রে বুলছি। যার লেগে এলম সে ভুলেই গেলম। এখন বুড়ার কাছে কাল তবে কেন গেছিলা বুল দেখি?

—সাপ চিনবার জন্যে! বুড়া বলেছিল সাপ চিনিয়ে দেবে।

—কত টাকা দিলা? বুড়া তুমাকে কত টাকা ঠকায়ে নিলে?

—টাকা?

—হাঁ গ! কত টাকা দিছ উয়াকে?

—টাকা কিসের? কি বলছ তুমি?

হেসে উঠল বেদের মেয়ে। ঠকেছ ঠকেছ—সি কথা আর জানাজানি করতে শরমে বাধছে কচি-ধন্বন্তরি? আঃ, হায় হায় কচি-ধন্বন্তরি, ঠকলে—ঠকলে, বুড়ার কাছে ঠকলে গ? আমার মতুন কালো সুন্দরীর হাতে ঠকলে যি দুস্ক থাকত না!

শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন শিবরাম। আবার মনে পড়ে গেল বেদের মেয়ের সেই জমিদারবাড়ীতে লাস্যময়ী রূপ। বললেন—না-না। কি যা-তা বলছ তুমি?

—বিদ্যে শেখার জন্যে টাকা দাও নাই তুমি? বুড়া তোমার

কাছে পাঁচকুড়ি টাকা চায় নাই? মিছা বলছ আমার কাছে? দাও নাই?

হঠাৎ মেয়েটার চেহারা একেবারে পালটে গেল। লাস্য না—হাস্য না, কঠিন ঋজু হ'য়ে দাঁড়াল কালো মেয়ে, চোখের দৃষ্টি স্থির, সর্ব অবয়বে ফণা ধ'রে দাঁড়ালো সাপিনীর দৃপ্ত ভঙ্গি। শিবরাম শুনেছিল নিয়তির আদেশ মাথায় নিয়ে দণ্ড ধ'রে সাপেরা দাঁড়ায় দণ্ডিত মানুষের শিয়রে, প্রতীক্ষা করে কখন দণ্ডিত মানুষটির আয়ুর শেষ ক্ষণটি আসবে, সঙ্গে সঙ্গে সে মারবে ছোবল। মনে মনে এরই একটি কল্পনার ছবি তার আঁকা ছিল। তারই সঙ্গে যেন মিলে গেল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ধীর মৃদুস্বরে শবলা বললে—রাজার পাপে রাজ্য নাশ, কত্তার পাপে গেরস্তের দুর্গতি, বাপের পাপে ছাওয়াল করে দণ্ড ভোগ। বুড়ার পাপে গোটা বেদেগুষ্টির ললাটে দুঃখভোগ হবে, বুড়ার পাপের ভাগ নিতে হবে, দুর্নামের ভাগী হ'তে হবে। তাই আমি ছুটে এলম আজ তুমার কাছে। তুমি কবিরাজ; বেদেদের বিষের ঠাঁই তুমাদের পাথরের খলে, আমাদের যজমান তুমরা। তুমার কাছে টাকা লিলে, লিয়ে তুমাকে বিষ্ণে দিলে না। অধম্ম হ'ল না? ই পাপ মা বিষহরি সইবেন ক্যানে গ? বিষ্ণের তরে টাকা লিয়া বিষ্ণে না দিলে, বিষ্ণে যে অফলা হ'য়ে যাবে! বুড়া করলে পাপ, আমি নাগিনী কন্যে, আমি এলম ছুটে—পেরাচিত্তি করতে। যত দিন নাগিনী কন্যা রইছি—তত দিন করতে হবে আমাকে বুড়ার পাপের পেরাচিত্তি।

হাঁপাতে লাগল শবলা। চোখ দুটোতে সেই স্থির দৃষ্টি। সে যেন সত্যি সত্যিই নাগিনী কন্যা হ'য়ে উঠেছে; শিবরাম সে নাগিনীকে শবলার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন।

বেদেনীর বিচিত্র ধর্মজ্ঞান এবং দায়িত্ব-বোধ দেখে শিবরাম অবাক

হ'য়ে গেলেন। তিনি বললেন—কিন্তু আমার কাছে তো টাকা নেয় নি মহাদেব।

—সত্যি বুলছ?

—সত্যি বলছি। কেন আমি মিথ্যে বলব তোমার কাছে?

—তুমাকে বিনি টাকাতে বিস্তে দিব বলেছিল?

শিবরাম বললেন—পরশু যখন পুলিশের সঙ্গে গিয়েছিলাম—তখন তো ছিলে তুমি শবলা। মনে নেই—পুলিশ চ'লে গেলে মহাদেবের সঙ্গে আমার কি কথা হয়েছিল?

ঘাড় নেড়ে বললে শবলা—না। কবিরাজ, শেষ বেলাটা আমার হুঁস ছিল না। পুলিশ চ'লে গেল। বুঝলাম—জোয়ানটার দেহ এইবার গাঙের জলে ভাসায়ে দিবে। ভেসে যাবে ঢেউয়ে ঢেউয়ে, কোথা চ'লে যাবে কোন দেশে দেশে। মনটাও যেন আমার ভেসে গেল। কানে কিছু শুনলম না আর, চোখে কিছু দেখলম না।

শিবরাম বললেন—পুলিশ চ'লে গেলে মহাদেব আমাকে দু টাকা প্রণামী দিতে এসেছিল, আমি তা নিই নি। বলেছিলাম, টাকা আমি নেব না, সত্যিই যদি কিছু দিতে চাও, তবে আমাকে সাপ চিনিয়ে দিয়ো। ব'লেছিল, দেব; তাই গিয়েছিলাম। তুমি তো দেখেছ, একেবারে নেশায় অজ্ঞান হ'য়ে র'য়েছে কি করব, ফিরে এলাম।

—মিছা, মিছা, সব মিছা কচি-ধন্বন্তরি, সব মিছা। নেশা উ করেছে। কিন্তু বেদের মরদের নেশা হয় কবরেজ? সাপের বিষ গিলে ফেলবার ঠাঁই না পেলে গাঁজার সাথে খাবার তরে রেখে দেয়। এমন বেদেও আছে ধন্বন্তরি, মুখে দাঁতের গোড়ায় ঘা না থাকলে বিষ চেটেই খেয়ে ফেলায়। উ তুমাকে বুলেছিল বিস্তে দিব, বিনা পয়সায় দিব, কিন্তুক বুলে আপসোস হল, বিনা টাকায় বিস্তে দিতে মন চাইল না, তাথেই

অমুনি ভান করলে গ! জান, তুমি চলে এলে খানিক পরেই বুড়া উঠে দাঁড়াল, তারপরে কি সে হা-হা হাসি! তোমারে ঠকায়েছে কি-না তাথেই খুশি, তাথেই আহ্লাদ। দেহটা মোর যেন আগুনের ছেঁকায় শিউরে উঠল ধন্বন্তরি; মনে মনে মা বিষহরিকে ডাকলম। বললম, মা, তুমি রক্ষে কর অধম্ম থেকে। বেদে কুলের যেন অকল্যেণ না হয়। তাথেই এলম তুমার কাছে। বলি, বুড়ো করলে পাপ, আমি তার খণ্ডন কর‍্যা আসি। কবিরাজকে বিত্তা দিয়া আসি।

শিবরাম বললেন, কি নেবে তুমি বল?

—কি নিব? বেদে বুড়া তুমাকে বাক্ দিছে, আমি সেই বাক্ রাখতে এসেছি। টাকা তো মুই চাই নাই কবরেজ। লাও বস। লাগ চিনায়ে দিই তুমাকে।

বেদেদের পুরুষ-পুরুষানুক্রমিক রহস্যময় সর্পবিত্তা। ওই আশ্চর্য কালো মেয়েটির সব যেন জন্মগুণে আয়ত্ত। রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে বোধ হয়।

নাগ দেখালে, নাগিনী দেখালে। নপুংসক সাপ দেখালে। আকার প্রকারের পার্থক্য দেখিয়ে দিলে। ফণার গড়নে চোখের দৃষ্টিতে প্রভেদ দেখালে। এই দেখ কচি-ধন্বন্তরি, দেখছ? ইটাতে ইটাতে তফাৎ?

শিবরাম দেখতে ঠিক পাচ্ছিলেন না। যমজ সন্তানের মায়ের চোখে ধরা পড়ে যে পার্থক্য, যে প্রভেদ, সে কি অন্য কারুর চোখে ধরা পড়ে? তিনি ধরতে ঠিক পারছিলেন না, শুধু অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছিলেন। সে কি অপরূপ বর্ণনা। মেয়েটা কিন্তু প্রভেদগুলি স্পষ্ট, অত্যন্ত স্পষ্ট রূপে চোখে দেখছে, আর বলে যাচ্ছে নাগ-নাগিনীর দেহ-বৈশিষ্ট্যের

কথা। আচার্য ধূর্জটি কবিরাজ যেমন ধ্যানময় আনন্দের সঙ্গে অসংকোচে নর-নারীর দেহ-গঠনতত্ত্ব বর্ণনা করে যান, ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেন, ঠিক তেমনি ভাবে শবলাও সাপকে উলটেপালটে তার প্রতিটি অঙ্গ দেখিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

বললে—কবরেজ, আমি যদি মাথায় পাগড়ি-বেঁধা মরদ সাজি—তবু কি তুমি হামরাকে দেখ্যা কন্যে বলে চিনবে না। ঠিক চিনবে! আমার মুখের মিঠা মিঠা ভাব দেখ্যাই চিনবে। সন্দেহ হলি পর বুকের পানে চাইলিই ধরা পড়বে। বুকে কাপড় যত শক্ত কর্যাই বাঁধি, মেয়ের বুক তো লুকানো যায় না। তেমনি কবরেজ, নাগিনীর নরম নরম গড়ন, বরনের চিকৃচিকে শোভা দেখলেই ধরা পড়বেক।

শিবরাম বললেন—হঁ্যা।

তিনি যেন মোহাবিষ্ট হয়ে গিয়েছেন।

শবলা বললে—বল, আর কি দেখবা?

—কি দেখব আর? কোন প্রশ্ন আর শিবরাম খুঁজে পেলেন না।

শবলা খিল খিল করে হেসে উঠল। রহস্যময়ী কালো মেয়েটা মুহূর্তে লাস্যময়ী হয়ে উঠেছে, কটাক্ষ হেনে বললে—তবে ইবার আমাকে দেখ খানিক। সাপের চোখে ভাল লাগে সাপিনী, তুমারও ভাল লাগবে বেদেদের লাগিনী কন্যে। লাগবে না?

শিবরামের বুকের ভিতরটায় যেন ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল। ধাক্কা দিয়ে সব যেন ভেঙে চুরে দিতে চাইলে। চোখ দুটির দৃষ্টিতে বুঝতে পারা গেল সে কথা। চোখের দৃষ্টি যেন ঝড়ের তাড়নায় জানালার মত কাঁপছে।

মেয়েটা আবার উঠল হেসে। বললে—কবরেজ, মনের ঘরে খিল আঁটো গ, খিল আঁটো।

শিবরাম মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠলেন। নিজেকে সংযত ক'রেও হেসেই বললেন—খিল আঁটলেও তো রক্ষে হয় না শবলা; লোহার বাসরঘরে সোনার লখিন্দর সাতটা কুলুপ এঁটে শুয়েও রক্ষে পায় নি, নাগিনীর নিশ্বাসে সর্ষে-প্রমাণ ছিদ্র বড় হয়ে নাগিনীকে পথ দিয়েছিল। আমি খিল আঁটব না। তোমার সঙ্গে মনসার কথার বেনে বেটী আর মহানাগের মত সম্বন্ধ পাতাব। জান তো সে কথা?

—জানি না? নাগলোকে থাকে নাগেরা, নরলোকে থাকে নরেরা। বিধেতার বিধান নরে নাগে বাস হবে না। কি কর‍্যা হবে? নাগের মুখে মৃত্যুবিষ, মানুষের হাতে অস্ত্র। এরে দেখলে ও ভাবে আমার মৃত্যুদূত, ওরে দেখলে এ ভাবে আমার মৃত্যুদূত। কখুনও মরে মানুষ, কখুনও মরে নাগ। বিধির বিধান—নরে নাগে বাস হয় না।

হাসল শবলা, বললে—মত্তে থাকে বণিক বুড়া, যত ধনী তত কৃপণ। বাড়ীতে আছে গিন্নী, বেটা আর বেটার বউ। আর আছে সিন্দুকে ধন, খামারে ধান, ক্ষেতে ফসল, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গাই। শ্যামলী ধবলী বুধি মঙ্গলার পাল। সেই পাল চরায় পাড়ার বাউরী ছেলে, বণিক বুড়োর রাখাল ছোঁড়া। কৃপণ বণিক বুড়োর ঘরে রাঁধুনী নাই, বেটার বউকে ভাত রান্না করতে হয়। বউটি যেমন সুন্দরী তেমুনি লক্ষ্মী, কিন্তু শিশু কালে মা-বাপ হারিয়েছে, বাপকুলে কেউ নাই। নাই বলেই বণিক-বুড়োর চাপ বউয়ের উপর বেশি। তাকে দিয়েই করায় রাঁধুনীর কাজ, ঝিয়ের কাজ। বউ রাঁধেন, শ্বশুরকে স্বামীকে খাওয়ান, নিজে খান, রাখাল ছোঁড়ার ভাত নিয়ে বসে থাকেন।

রাখাল ছোঁড়া গরুর পাল নিয়ে যায় মাঠে, গরুগুলি চরে বেড়ায়, সে কখুনও গাছতলায় বসে বাঁশি বাজায়, কখুনও-বা গাছের ডালে দোল খায়, কখুনও ঘুমায়, কখুনও আম জাম কুল পেড়ে আঁচল ভর্তি ক'রে নিয়ে

আসে। একদিন গাছের তলায় দেখে দুটি ডিম। ভারী সুন্দর ডিম। রাখালের সাধ হ'ল ডিম দুটি পুড়ায়ে খাবে। ডিম দুটি খুঁটে বেঁধে নিয়ে এল, বণিক-বউকে দিলে—বউ গ, বউ ঠাকরুণ, ডিম দুটি আমাকে পুড়ায়ে দিয়ো।

বউ ঠাকরুণ ডিম দুটি হাতে নিয়ে পোড়াতে গিয়েও পোড়াতে লারলে। ভারী ভাল লাগল। আহা, কোন্ জীবের ডিম, এর মধ্যে আছে তাদের সন্তান, আহা! ডিম দুটি সে এক কোনে একটি টুকুই-ঢাকা দিয়ে রেখে দিলে। তার বদলে দুটি কাঁঠাল বিচি পুড়িয়ে রাখালেকে দিলে—লে, খা।

রাখাল ছোঁড়া কাঁঠালবিচি পোড়া খেয়েই খুব খুশি।

বউও খুব খুশি, কেষ্টর জীব দুটি বাঁচল।

দিন যায় মাস যায়, রাখাল ছোঁড়া গরু চরায়, বউঠাকরুণ ভাত রাঁধে বাসন মাজে ঘরসংসারের কাজ করে, ডিম দুটি টুকুই-চাপা পড়ে থাকে। বউঠাকরুণ ভুলেই যায়, মনেই থাকে না ডিম দুটি ব'লে। হঠাৎ একদিন দেখে টুকুইটি লড়ছে। বউয়ের মনে পড়ে গেল, 'হরষপরশ' দিয়ে টুকুইটি তুলতেই দেখে দুটি নাগের বাচ্চা। লিক লিক করছে, ফণা তুলে দুলছে, মাথায় চক্ক দুটির পদ্ম পুষ্পের মত শোভা।

বউয়ের পেথমটা ভয় হল। তার পরে মায়া হল। আহা তাঁর যতনেই ডিম দুটি বেঁচেছে, ডিম ফুটে ওরা বেরিয়েছে। ওদের কি ক'রে মারবেন? ভগবানকে স্মরণ করলেন, নাগের বাচ্চা দুটিকে বললেন—তোদের ধম্ম তোদের ঠাঁই আমার ধর্ম্ম আমার কাছে, সে ধম্মকে আমি লঙ্ঘন করব না।

ব'লে ছোট একটি মাটির সরাতে দুধ এনে নামিয়ে দিলেন। নাগ দুটি মুখ ডুবিয়ে চুক চুক ক'রে খেলে। আবার টুকুই-ঢাকা দিলেন।

রোজ দুধ দেন, তারা খায় আর বাড়ে।

বণিক-বউয়েরও মায়া বাড়ে।

ঘরে আম আসে, আম গেলে রস ক'রে তাদের দেন। কাঁঠাল এলে কাঁঠালের কোয়া গেলে তাও দেন। লাগ দুটি দিনে দিনে বাড়ে লাউ-কুমড়ার লতার ডগার মত। বেশ খানিকটা বড় হল—তখন আর তারা থাকবে কেন টুকুই-চাপা—বেরিয়ে পড়ল, ঘুরতে লাগল ঘরের ভিতর, তারপরে বাইরে, ওই বণিক-বউয়ের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বণিক-বুড়ো বণিক-বুড়ী দু-জনে ভয়ে শিউরে ওঠেন। ও-মা—এ কি? এ কি কাণ্ড। এ কি বেদের কন্যে, না লাগিনী? এ কে? মার মার লাগের বাচ্চা দুটোকে মার!

বাচ্চা দুটিকে কপ কপ ক'রে কুড়িয়ে আঁচলে ভ'রে বেনে-বউ পালিয়ে গেলেন বাড়ীর পাদারে। লাগ দুটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—ভাইরে, তোমরা তোমাদের স্বস্থানে যাও, আমি শাশুড়ী নিয়ে ঘর করি, তাতেই গঞ্জনা সইতে পারি না! তোমাদের লেগে মনে দুঃখু আমার হবে, ডিম থেকে অত বড়টি করলম কিন্তু কি করব? উপায় নাই।

লাগ দুটি স্বস্থানে গিয়ে মা বিষহরিকে বললে—মা, ভাগ্যে বণিক-বেটী ছিল তাই বেঁচেছি, লইলে বাঁচতম না। সে আমাদের ভাই বলেছে, আমরা তাকে দিদি বলেছি। সে তোমার কন্যে মা। তাকে একবার আনতে হবে আমাদের এই লাগলোকে। মা বললেন—না বাবা, না। তা হয় না। নরে-লাগে বাস হয় না। বিধেতার নিষেধ! আমি বরং তাকে বর দিব এইখান থেকে, ধনে ধানে সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামী-পুত্রে তার ঘর ভ'রে উঠুক।

লাগেরা বললে—না মা, তা হবে না। তা হলে বিশ্ব বেহ্মাণ্ডে লাগেদের বলবে নেমকখারাম।

মা বললেন—তবে আন।

নাগেরা তখন নরের রূপ ধরলেন বণিক-বউয়ের মাসতুত ভাই সাজলেন, সেজে এসে দোরে দাঁড়ালেন—মাউই গো, তাউই ঘরে আছ? সঙ্গে ভার ভারোটায় নানান দব্য।

—কে? কে তোমরা?

—তোমাদের বেটার বউয়ের মাসতুত ভাই। দূর দেশে থাকতম। দেশে এসে খোঁজ নিয়ে দিদিকে একবার লিতে এলম।

—ও মাগো! বাপ-কুলে পিসী নাই মা-কুলে মাসী নাই শুনেছিলাম, হঠাৎ মাসতুত ভাই এল কোথা থেকে?

—বললম তো দূর দেশে বাণিজ্য করতম, ছেলে বয়স থেকে দেশ ছাড়া, তাই জান না।

বলে নামিয়ে দিলেন 'ভার ভারোটা' হাজারো দব্য। কাপড়-চোপড় আভরণ গন্ধ—নানান দব্য। মনি মুক্তার হার পয্যন্ত।

আবার চুপ করলে বুড়োবুড়ী। কেউ যদি না হবে তবে এত দব্য দেবে ক্যানে? জিনিস তো সামান্য লয়! এ যে অনেক! আর তাও যেমন তেমন জিনিস লয়—এ যে মনি মুক্তো সোনা রূপো।

নাগেরা বললেন—আমরা কিন্তু দিদিকে একবার নিয়ে যাব!

—নিয়ে যাবে? না বাবু, তা হবে না।

—হতেই হবে।

ও দিকে বণিক-বধূ কাঁদতে লাগলেন—আমি যাবই।

শেষ বুড়োবুড়ীকে রাজী হতে হল। নাগেরা বেহারা ভাড়া করলে, পালকি ভাড়া করলে, বণিক-বউকে পালকিতে চাপিয়ে চলল। কিছু দূর এসে বেহারাদিকে বললে—এই কাছে আমাদের গেরাম, ওই আমাদের

বাড়ী। আমাদের নিয়ম হল—কন্যে হোক বউ হোক, এইখান থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ী ঢুকতে হয়।

ভাল করে বিদেয় করলেন। দেখিয়ে দিলেন কাছের গেরামের রাজবাড়ী। বেহারারা খুশি হয়ে চলে গেল।

তখন নাগেরা বললেন, দিদি আমরা তোমার মাসতুত ভাইও নই মানুষও নই। আমরা হ'লম সেই দুটি নাগ, যাদের তুমি বাঁচিয়েছিলে, বড় করেছিলে। মা বিষহরি তোমার বিত্তান্ত শুনে খুশি হয়েছেন। তোমাকে নাগলোকে নিয়ে যেতে বলেছেন, আমরা তোমাকে সেইখানে নিয়ে যাব। মায়ের বরে তুমি বাঁটুলের মত ছোটটি হবে, তুলোর মতন হালকা হবে, আমাদের ফণার উপর ভর করবে, আমরা তোমাকে আকাশ-পথে নিয়ে যাব নাগলোকে। তুমি চোখ বোঁজ।

বণিক-কন্যে চোখ বুঁজলেন।

মনে হল আকাশ-পথে উড়ছেন। তার পর, মনে হল কোথা নামলেন। নাগেরা বললেন—এই বারে চোখ খোল।

চোখ খুললেন। সামনে দেখলেন, মা বিষহরি পদ্ম ফুলের দলের মধ্যে শতদলের মত বসে আছেন। অঙ্গে পদ্মগন্ধ, পদ্মের বরন। মুখে তেমুনি দয়া।

মা বললেন—মা, নাগলোকে এলে, থাক, দুধ নাড় দুধ চাড়, সহস্র নাগের সেবা কর। সব দিক দিয়ে চেয়ো মা, শুধু দক্ষিণ দিক দিয়ে চেয়ো না।

নির্জন দ্বিপ্রহরে মেয়েটার মনে চোখে যেন স্বপ্নের ছায়া নেমে এসেছিল। ওই ব্রতকথার গল্পের ওই স্বজনহীনা কন্যাটির বিবরণকে

আপনজন জ্ঞানে আঁকড়ে ধরার মত এই মেয়েটিও যেন শিবরামকে আঁকড়ে ধরার কল্পনায় বিভোর হয়ে উঠেছিল।

শিবরামের মনেও সে স্বপ্নের ছোঁয়াচ লেগেছিল। তিনি বললেন—হ্যাঁ, শবলা। ওই বেনে-বেটী আর নাগেরা যেমন ভাই-বোন হয়েছিল, আমরাও তেমনি ভাই-বোন হলাম।

—তবে লাও, ধর।

—কি ?

—বুন দিছে ভাইকে। যা দিছে তা হ'ল বেদেকুলের গোপন জিনিস। সাপের জড়ি। এ জড়ি তোমার হাতে নিয়া, বিষধরের ছামুতে হাত আগায়ে দিয়ো, বিষধর ফণা গুটায়ে লিবে। জড়িটা তার মাথায় দিয়ো, মুখে দিয়ো; দেখবা কাটা লতার মতুন এলায়ে পড়বে। বিদ্যা মন্তর দিব না। আমার ধরম যাবে, বিষবেদে ছাড়া এ বিদ্যা বাইরের কারুকে দিবার মানা আছে। তা ছাড়া, বিদ্যা আমাদের ভুল হয়ে গিয়েছে ধন্বন্তরি ভাই, মুখে মুখে পাপড়ি ভেঙে গিয়েছে, ছুট হয়েছে কথার, তাতে কাজও হয় না।

একটুকরা শিকড় তার গলার লাল সুতোর মালা থেকে খুলে তার হাতে দিয়েছিল। একটুকরা শিকড়—শিবরাম দেখছিলেন—চেষ্টা করছিলেন চিনতে—কিসের শিকড়। শবলা বললে—মনে লিছ নাই ? বিশ্বাস করবারে লারছ ? ধর শিকড়টা ধর!

ই হাতে নিয়া তুমি রাজ-গোখুরার ছামনে আগায়ে যাবা—রাজ গোখুরা ফণা নামায়ে—মাটির পরে গুটায়ে পড়বে—তুমারে পথ দিবে।

বলেই সে একটা সাপের ঝাঁপি খুললে।

বিষগালা সাপ অবশ্য। কিন্তু চোয়ালে হাতের চাপের যন্ত্রণায় বিষের থলির গোড়ায় তালপাতার নলির কিনারার খোঁচা খেয়ে সাপটা

যেন ক্ষেপে ছিল। ঝাঁপিটায় টোকা মারতেই গর্জাচ্ছিল; মানুষের বুক কেঁপে ওঠে সে গর্জনে। বেদের মেয়ে খিল খিল ক'রে হেসে বলেছিল—ভয় পেলা নাকি কচি-ধন্বন্তরি!

ধূর্জটি কবিরাজের তরুণ শিষ্য শিবরামকে শবলা বললে—কচি-ধন্বন্তরি।

শিবরাম বলেন—ওই মেয়ে ছাড়া এমন নাম আর কে দিতে পারবে।

শবলা শিবরামের হাতে শিকড়টা দিয়ে বললে—ধর। দেখায়ে দিই তুমাকে ওষুদের মহিমা!

সামান্য একটা শিকড়, শুধু একটা গন্ধ উঠছে। গন্ধটা তীব্র।

সাপটা ফোঁ শব্দ ক'রে ফণা তুলে দাঁড়াল এবং ছোবল মেরে বসল মুহূর্তে। বেদের মেয়ে আশ্চর্য নির্ভয় নিপুণতার সঙ্গে ফণার পিছন দিকে সাপটার চেয়েও ক্ষিপ্র ছোবল মেরে সাপটাকে ধ'রে শিবরামের হাতের উপরে আচমকা ফেলে দিলে—শিবরাম বলেন—আমি অসাড় হ'য়ে গেলাম। জানি বিষগালা কামানো সাপ, কিন্তু তাতে কি? সাপ সাক্ষাৎ মৃত্যু। কে জানে সামান্য একবিন্দু থলিতে কি দাঁতের নালীতে লেগে নেই। তার উপর সাপের আশ্চর্য শীতল স্পর্শ, শরীর যেন হিম হ'য়ে যায়। শুধু চেপে ধ'রে রইলাম শিকড়টা। মরণ সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে. ওই কুটোটুকুই আমার আশ্রয়। কিন্তু আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম—দেখলাম, শুধু আমিই অসাড় হইনি—সাপটাও অসাড় হ'য়ে গিয়েছে।

বেদের মেয়ে বললে—দেখলা? না, আরও দেখবে? বলেই সাপটাকে তুলে নিয়ে একটু দূরে ফেলে দিলে। বোধ করি কুড়ি গুণতে যতখানি সময় লাগে—সেই সময়টুকু যেতেই আবার সে উঠল ফণা তুলে দাঁড়িয়ে।

শিবরাম বলেন, সে জড়ি আমার হারিয়েছে। সে এক অদ্ভুত দ্রব্য। শুকনো শিকড়, কতকাল আগে তোলা কে জানে। কিন্তু শিকড়টার গন্ধটা যায় নি। এ কালের আইডোফর্ম-জাতীয় গন্ধ। তত তীব্র নয়—মৃদু। জল দিয়ে ভিজিয়ে একটু ছাল ছাড়ালে গন্ধটা তীব্রতর হ'য়ে ওঠে। হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেও সন্দেহ যায় নি। বলেছিলাম শবলাকে—বলেছিলাম, এই ওষুদ থাকতে তবে তোমাদের বেদেরা সাপের কামড়ে মরে কেন বেশি?

শবলা হেসে বলেছিল—কবিরাজ, তুমরা তো রোগের ওষুদ নিয়া ব'সে আছ, তবে তুমাদের মিত্যু রোগে ক্যানে হয় ক'বরেজ?

শিবরাম আজকাল বলেন—কিন্তু আজকাল আর আমার অবিশ্বাস নাই।

বিষবেদের মৃত্যু বিষেই হয় বেশি। সর্পদংশনেই মরে সাপের ওঝা। ওদের ওষুদ আছে। ওষুদ নেই এ কথা আমি মানি না। বরং মন্ত্র-তন্ত্রের কথায় অবিশ্বাস কর আপত্তি করব না। মন্ত্র আমিও সংগ্রহ করেছিলাম—ভাল ক'রে বুঝে দেখেছি ওতে মানুষকে সাহস দেয়। বলে বিষ নাই! বলে বিষ নেমে গেল। ওরা অবিশ্যি বলে ধন্বন্তরির মৃত্যুর সঙ্গে মন্ত্রগুলি পাপড়ি-ভাঙা হ'য়ে গিয়েছে। সে কথা থাক্। যারা সারাটা জীবন কৌশল আর সাহস আর জড়ি বুটি ওষুদ নিয়ে ওই সাক্ষাৎ কালের সঙ্গে খেলা করে নির্ভুল খেলা; হঠাৎ কখন এক মুহূর্তের চোখের পলকের এতটুকু ভুলের মধ্য দিয়ে শেষ হ'য়ে যায় সকল খেলা। সাপের দাঁত বেদের জীবনে দু-দশ-বার বসে, ভুল করতে করতেও ওরা ভুল সামলায়। সাপ দাঁত বসাতে বসাতেও বসাতে পারে না; পারলেও মৃত্যুদংশন না হ'লে ওরা ভয় পায় না। তখন ওদের ওষুদ কাজ করে। কিন্তু মৃত্যু-দংশন যখন হয়—তখন ভুলও সামলান যায় না, তখন ওষুদও কাজ করে

না। তুমি যদি বিষের পরিমাণ কষতে বস তবে আমি চুপ করছি। এইটুকু ব'লে চুপ করছি যে, সাপের বিষের ওষুদ ওদের আছে কিন্তু মৃত্যুরোধের ওষুদ ওদের নেই। আমরা কবিরাজ চিকিৎসক, আমাদেরও তাই। রোগের ওষুদ আছে, মৃত্যুর ওষুদ নাই।

যে জড়িটা শবলা শিবরামকে দিয়েছিল সে জড়িটা যে কি, কোন্‌ গাছের মূল—সে বিষবেদেরাও জানে না। যদি জানে তো মহাদেব জানে, কিন্তু সে তা স্বীকার করে না। বলে—সি কত কাল আগে—সি কালের শিরবেদে কি লাগিনী কন্যে স্বপনে পেয়েছিল এ জড়ি। রাতে স্বপন দিলেন মা বিষহরি কি, জড়ি দিলম, লাগ বিষের জড়ি, মাথার বালিশের তলায় রইল। ইয়ার আধখানা থাকবে শিরবেদের তাগায় আর আধখানা থাকবে লাগিনী কন্যের গলার ডুরিতে। ইয়াতে আর কারুর ভাগ নাই। ই জড়ি মন্তের নয়, মন্তধামে মেলে না। সাবধানে রাখবি।

শবলা এ জড়ি পেয়েছে—আগের লাগিনী কন্যার গলার ডুরি মালার সঙ্গে। এ সেই জড়ি।

শবলা বললে—পথে কুড়ায়ে পেলম ভাই। তুমি হামরার দেবতার দেওয়া ভাই—তোমারে দিলম ইয়ার একটি টুকরা। যতন ক'রে রেখো। ইহার গন্ধ নাকে যাবে, বেদেনী বহিন—লাগিনী কন্যের গায়ের গন্ধ মনে পড়বে।

হাসলে সে। এ হাসি শবলার মুখে কল্পনা করা যায় না। মনে হ'ল শবলা বুঝি কাঁদবে এইবার।

সে কিন্তু কাঁদল না, কাঁদলেন শিবরাম, গোপনে চোখের জল মুছে বললেন—তা হ'লে কিন্তু তোমাকেও নিতে হবে আমি যা দেব।

—কি?

শিবরাম বের করলেন দুটি টাকা। বললেন—বেশি দেবার তো সাধ্য আমার নাই। দুটি টাকা তুমি নাও। তুমি আমাকে বিদ্যাদান করলে, এ হল দক্ষিণা। গুরু-দক্ষিণা দিতে হয়।

গুরু-দক্ষিণা কথাটা শুনে চপলা মেয়েটার সরস কৌতুকে হেসে গড়িয়ে পড়ার কথা। শিবরাম তাই প্রত্যাশা করেছিলেন। প্রত্যাশা করেছিলেন হেসে গড়িয়ে পড়ে শবলা বলবে—ও মা গো! মুই তুমার গুরু হলাম! দাও—তবে দাও। দক্ষিণে দাও।

শিবরামের অনুমান কিন্তু পূর্ণ হল না। এ কথা শুনেও মেয়েটা হাসলে না। স্থির দৃষ্টিতে একবার তাকালে শিবরামের দিকে, তারপর তাকালে টাকা দুটির দিকে। শিবরামের মনে হ'ল চোখের দৃষ্টিতে রূপোর টাকা দুটোর ছটা বেজেছে, সেই ছটায় দৃষ্টি ঝকমক করছে! তবু সে স্থির হয়ে রইল। নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বললে—না। লিতে লারব ধরমভাই। লিলে বেদে কুলের ধরম যাবে। তুমাকে ভাই বুলেছি, ভাই বলা মিছা হবে। উ লিতে লারব। টাকা তুমি রাখ।

শিবরাম বললেন—আমি তোমাকে খুশি হয়ে দিচ্ছি। তা ছাড়া, ভাই কি বোনকে টাকা দেয় না!

—দেয়। ইয়ার বাদে যখুন দেখা হবে দিয়ো তুমি। মুই লিব। সকল জনাকে গরব কর‍্যা দেখিয়ে বেড়াব, বুলব—দেখ্ গো দেখ্, মোর ধরমভাই দিছে দেখ্।

তারপর বললে—বেদের কন্যে কাল লাগিনী বইন তুমার আমি। আমি তুমারে ভুলতে লারব, কিন্তুক ধন্বন্তরি, তুমি তো ভুল্যা যাবে। দাম দিয়া জিনিস লিয়া দোকানীরে কে মনে রাখে কও? জিনিসটা থাকে, দোকানীটারে ভুল্যা যায় লোকে। আমি তোমারে বিনা দক্ষিণায়

বিদ্যা দিলাম, এই বিদ্যার সাথে মুইও থাকলম তুমার মনে। দাঁড়াও, তুমাকে মুই আর একটি দব্য দিব।

মেয়েটা অকস্মাৎ ভাবোচ্ছ্বাসে উথলে উঠেছে বর্ষাকালের হিজল বিলের নদীনালার মত। আঁটসাঁট ক'রে বাঁধা তার বুকের কাপড়ের তলা থেকে টেনে বের করলে তার গলার লাল স্থতোর জড়ি পাথর মাদুলীর বোঝা। তার থেকে এক টুকরা শিকড় খুলে শিবরামকে বললে —ধর। হাত পাত ভাই। পাত হাত।

শিবরাম হাত পাতলেন। শিকরের টুকরাটা তার হাতে দিয়ে বেদের মেয়ে বললে—ইয়ার থেকে বড় ওষুদ বেদের কুলের আর নাই ধন্বন্তরি। লাগের বিষের 'অম্‌রেত', মা বিষহরির দান।

—কি এ জড়ি? কিসের মূল?

বেদের মেয়ে হাসলে একবার। বললে—সি কইতে তো বারণ আছে ধরমভাই। বেদে কুলের গুপ্ত বিদ্যা—এ তো পেকাশ করতে নিষেধ আছে।

মেয়েটা একটু চুপ করে থেকে বললে—যদি বিশ্বাস কর ধরমভাই, তবে বুলি শোন। এ যে কি গাছ তার নাম হামরারাও জানি না। বেদেরা বলে—সেই যখন সাঁতালী পাহাড় থেকে বেদেরা ভাসল নৌকাতে, তখুন ওই কাললাগিনী কন্যে যে আভরণ অঙ্গে পর‍্যা নেচেছিল, তাথেই একটুকরা মূল ছিল লেগে। সাঁতালী ছাড়ল বেদেরা সঙ্গে সঙ্গে ধন্বন্তরির বিদ্যা চাঁদো বেনের শাপে হল বিস্মরণ। লতুন বিদ্যা দিলেন মা বিষহরি। এখুন ধন্বন্তরির বিদ্যার ওই মূলটুকুই কন্যের আভরণে লেগে সঙ্গে এল, তাই পুঁতলে শিরবেদে নতুন সাঁতালী গাঁয়ে হিজল বিলের কূলে। গাছ আছে, শিকড় নিয়া ওষুধ করি কিন্তু নাম তো জানি না ধরমভাই। আর ই গাছ সাঁতালী ছাড়াও তো আর কুথাও দেখলম না, ধরমভাই! তা

হ'লে তুমাকে নাম বলব কি গাছ চিনায়ে দিব কি কর‍্যা কও? এইটি তুমি রাখ, লাগ যদি ডংশন করে আর সি ডংশনের পিছাতে যদি দেব-রোষ কি ব্রহ্মরোষ না থাকে ধন্বন্তরি—তবে ইয়ার একরতি জলে বেঁট্যা গোলমরিচের সাথে খাওয়াইয়া দিবা, পরানডা যদি তিল পরিমাণও থাকে, তবে সে পরানকে ফিরতে হবে, জাগতে হবে, এক পহরের মধ্যে মরার মত মনিষ্যি চোখ মেলে চাইবে।

আর একটি শিকড়ও সে দিয়েছিল শিবরামকে। তীব্র তার গন্ধ। শিবরাম বলেন—বাবা, সে গন্ধে নাক জ্বালা করে, নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের মধ্যে গিয়ে সে যেন আত্মার শ্বাস রোধ করে।

শবলা বললে—এই ওষুদ হাতে নিয়া তুমি রাজগোখুরার ছামনে গিয়া দাঁড়াইবা, তাকে মাথা নিচু কর‍্যা পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।

—দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমারে দেখায়ে দিই পরখ কর‍্যা।

খুলে দিলে সে একটা সাপের ঝাঁপি। কালো কেউটে একটা মুহূর্তে ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল। সগু ধরা সাপ বোধ হয়।

—ভয় নাই, বিষ দাঁত ভেঙে দিছি, বিষ গেলে নিছি। এসো এসো, তুমি জড়িটা হাতে নিয়া আগায়ে এসো।

বিষদাঁত ভাঙা, বিষও গেলে নেওয়া হয়েছে, সবই সত্যি কিন্তু শিবরাম কি ক'রে কোন্ সাহসে আগিয়ে যাবেন! দাঁতের গোড়ায় যদি থাকে একটা ভাঙা কণা? যদি থলিতে থাকে সূচের ডগাটিকে সিক্ত করতে লাগে যতটুকু বিষ ততটুকু? কি, বিষ গেলে নেওয়ার পর এরই মধ্যে যদি আবার সঞ্চিত হয়ে থাকে? সে আর কতটুকু? ওই দাঁতের ভাঙা কণার মুখটুকু ভিজিয়ে দিতে কতটুকু তরল পদার্থের দরকার হবে? পুরো এক বিন্দুরও প্রয়োজন হবে না। এক বিন্দুর ভগ্নাংশ!

বেদের মেয়ে শিবরামের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললে—ডর লাগছে?

দাও, জড়িটা হামরাকে দাও। জড়িটা নিয়ে সে হাতখানা এগিয়ে নিয়ে গেল।

আশ্চর্য, সাপটার ফণা সংকুচিত হয়ে গেল, দেখতে দেখতে সাপটা যেন শিথিলদেহ হয়ে ঝাঁপির ভিতর নেতিয়ে পড়ে গেল। মানুষ যেমন অজ্ঞান হয়ে যায় তেমনি, ঠিক তেমনি ভাবে।

—ধর, ইবার তুমি ধর।

শিবরামের হাতে শিকড়টা দিয়ে এবার শবলা যা করলে শিবরাম তা কল্পনাও করতে পারেন নি। আর একটা ঝাঁপি খুলে দিয়ে উদ্যত ফণা সাপটাকে ধরে শিবরামের হাতের উপর চাপিয়ে দিলে।

সাপের শীতল স্পর্শ। স্পর্শটা শুধু ঠাণ্ডাই নয়, ওর সঙ্গে আরও কিছু আছে। সাপের ত্বকের মসৃণতার একটা ক্রিয়া আছে। শিবরাম নিজেও যেন সাপটার মত শিথিলদেহ হয়ে যাচ্ছিলেন। তবু প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করলেন। শবলা ছেড়ে দিলে সাপটাকে; সেটা ঝুলতে লাগল শিবরামের হাতের উপর।

আশ্চর্য!

শিবরাম বলেন—সে এক বিস্ময়কর ভেষজ বাবা। সমস্ত জীবনটা এই ওষুদ কত খুঁজেছি, পাই নি। বেদেদের জিজ্ঞাসা করেছি—তারা বলে নি। তারা বলে—কোথা পাবেন বাবা এমন ওষুদ? আপনাকে কে মিথ্যে কথা বলেছে। শিবরাম শবলার নাম বলতে পারেন নি। বারণ করেছিল শবলা।

বলেছিল—ই ওষুদ তুমি কখুনও বেদে কুলের ছামনে বার ক'র নাই। তারা জানলি পর আমার জীবনটা যাবে। পঞ্চায়েত বসবে, বিচার ক'রে বুলবে, বেটীটা বিশ্বাস ভেঙেছে, বেদেদের লক্ষ্মীর ঝাঁপি খুলে পরকে দিয়েছে। এই জড়ি যদি অন্যে পায় তবে আর বেদের রইল কি?

বেদের ছামনে সাপ মাথা নামায়, তিল পরিমাণ পরান থাকলে বেদের ওষুদে ফিরে, সেই জন্যেই মান্যি বেদের। লইলে আর কিসের মান্যি। কুলের লক্ষ্মীকে যে বিলায়ে দেয়, মরণ হল তার সাজা! মেরে ফেলাবে আমাকে।

শিবরাম কোন বেদের কাছে আজও নাম করেন নি শবলার। কখনও দেখান নি সেই জড়ি।

ওদিকে বেলা পড়ে আসছিল; গঙ্গার পশ্চিম কূলে ঘন জঙ্গলের মাথার মধ্যে সূর্য হেলে পড়েছে। দ্বিপ্রহর শেষ ঘোষণা করে দ্বিপ্রহরে স্তব্ধ পাখীরা কল কল ক'রে ডেকে উঠল; গাছের ঘনপল্লবের ভিতর থেকে কাকগুলো রাস্তায় নামছে। শিবরাম চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আচার্য ফিরবেন এইবার।

—তুমি এমন করছ ক্যানে? এমন চঞ্চল হল্যা ক্যানে গো?

—তুমি এবার যাও শবলা, কবিরাজ মশাই এবার ফিরবেন। কবিরাজ বারণ ক'রে দিয়েছেন শিষ্যদের—সাবধান বাবা, বেদেদের মেয়েদের সম্পর্কে তোমরা সাবধান। ওরা সাক্ষাৎ মায়াবিনী।

শবলা ঝাপি গুটিয়ে নিয়ে উঠল। চলে গেল বেরিয়ে। কিন্তু আবার ফিরে এল।

—কি শবলা?

—একটি জিনিস দিবা ভাই?

—কি বল?

শবলা ইতস্তত করে মৃদুস্বরে প্রার্থিত দ্রব্যের নাম করলে।

চমকে উঠলেন শিবরাম।

সর্বনাশ। ঐ সর্বনাশী বলে কি?

শিবরাম শিউরে বলে উঠলেন—না—না—না। সে পারব না! সে পারব না। সে আমি—

মিথ্যে কথাটা মুখ দিয়ে বের হল না তাঁর। বলতে গেলেন—সে আমি জানি না—কিন্তু জানি না কথাটা উচ্চারণ করতে পারলেন না।

শবলা তাঁর কাছে নরহত্যার বিষ চেয়েছে ওষুদের নামে। মাতৃ-কুক্ষিতে সত্যসমাগত সন্তান হত্যার ভেষজ চেয়েছে সে। যে চোখে স্বপ্ন দেখা মানা, সে চোখে অবাধ্য স্বপ্ন এসে যদি নামে, সে স্বপ্নকে মুছে দেবার অস্ত্র চায় সে। সে ওষুদ সে অস্ত্র তাদেরও আছে কিন্তু তাতে তো শুধু স্বপ্নই নষ্ট হয় না, যে-চোখে স্বপ্ন নামে সে চোখও যায়। তাই সে ধন্বন্তরির কাছে এমন ওষুদ চায়, এমন সূক্ষ্মধার শাণিত অস্ত্র চায় যাতে ওই চোখে-নামা স্বপ্নটাকেই বোঁটা-খসা ফুলের মত ঝরিয়ে দেওয়া যায়। যেন চোখ জানতে না পারে স্বপ্ন ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে মিশে গেল!

শিবরাম জানেন বেদের মেয়েদের অনেক গোপন ব্যবসার কথা। এটাও কি তারই মধ্যে একটা? বশীকরণ করে তারা। কত হতভাগিনী গৃহস্থ বধূ স্বামী বশ করবার আকুলতায় এদের ওষুদ ব্যবহার করে স্বামীঘাতিনী হয়েছে সে শিবরামের অজানা নয়।

কি চতুরা মায়াবিনী এই বেদের মেয়েটা! শিবরামের টাকা না নেওয়ার সততার ভান করে, তার সঙ্গে ভাই সম্বন্ধ পাতিয়ে তাকে কেমন বেঁধেছে পাকে পাকে! ঠিক নাগিনীর বন্ধন!

বেদের মেয়ে মায়াবিনী, বেদের মেয়ে ছলনাময়ী, বেদের মেয়ে সর্বনাশী, বেদের মেয়ে পোড়ার মুখী! পোড়ামুখ নিয়ে ওরা হাসে, নির্লজ্জা, পাপিনী!

শবলা শিবরামের মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শিবরামের মুখ দেখে তার আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে সে যেন মাটির পুতুল হয়ে গিয়েছিল কয়েকটা মুহূর্তের জন্য। কয়েক মুহূর্ত পরে তার ঘোর কাটল। মাটির পুতুল যেন জীবন ফিরে পেলে। সে জীবন

সঞ্চারের প্রথম লক্ষণ একটি দীর্ঘশ্বাস। তারপর ঠোঁটে দেখা দিল ক্ষীণ-রেখায় একটুকরা হাসি।

অতি ক্ষীণ বিষণ্ণ হাসি হেসে সে বললে—যদি দিবারে পারতে ধরম-ভাই, তবে বইনটা তুমার বাঁচত।

শিবরাম বুঝতে পারলেন না শবলার কথা। কি বলছে সে?

শবলা সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললে—সি ওষুদ যদি না জান ধরমভাই, যদি দিতে না পার, তুমার ধরমে লাগে—তবে অঙ্গের জ্বালা জুড়ানোর কোন ওষুদ দিতে পার? অঙ্গটা মোর জ্বল্যা যেছে গো, জ্বল্যা যেছে। মনে হ-ছে হিজল বিলে, কি, মা গঙ্গার বুকের পরে অঙ্গটা এলায়ে দিয়া ঘুমায়ে পড়ি। কিম্বা—লাগগুলাকে বিছায়ে তারই শয্যে পেতে তারই পরে শুয়ে ঘুমায়ে যাই। কিন্তুক তাতেও তো যায় না মোর ভিতরের জ্বালা। সেই ভিতরের জ্বালা জুড়াবার কিছু ওষুদ দিতে পার?

ও দিকে রাস্তায় উঠল বেহারার হাঁক। আচার্য ধূর্জটি কবিরাজের পালকি আসছে।

শিবরাম স্তব্ধ হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন। গুরুর পালকির বেহারাদের হাঁকেও তাঁর চেতনা ফিরল না। বেদের মেয়ে কিন্তু আশ্চর্য। মানুষের সাড়া পেয়ে সাপিনী যেমন চকিতে সচেতন হয়ে উঠে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়, তেমনি ভাবেই ক্ষিপ্র লঘু পদক্ষেপে আচার্যের বাড়ীর পাশের একটি গলিপথ ধরে বেরিয়ে চলে গেল।

আচার্যের পালকি এসে ঢুকল উঠানে। আচার্য নামলেন। শিব-রামের তবু মনের অসাড়তা কাটল না। হাতের মুঠোয় জড়ি দুটি চেপে ধরে তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরেই শিবরামের কানে এল—চপল মিষ্টি কণ্ঠের সুরেলা কথা।

জয় হোক গো রানী মা, সোনাকপালী, চাঁদবদনী, স্বামী-সোহাগী, রাজার রানী, রাজজন্থনী, রাজার মা। ভিখারিণী পোড়াকপালী কাঙালিনী বেদের কন্যে তুমার দুয়ারে এসে হাত পেতে দাঁড়ালছে! লাগলাগিনীর লাচন দেখ! কালামুখী বেদেনীর লাচন দেখ! মা—গো!

সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল হাতের ডম্বরুর মত বাদ্যযন্ত্রটি!

দ্বিতীয় পর্ব

পরের দিন শিবরাম নিজেই গেলেন বেদেদের আস্তানায়। শহর পার হয়ে সেই গঙ্গার নির্জন তীরভূমিতে বট-অশথের ছায়ায় ঘেরা স্থানটিতে।

কে কোথায়? কেউ নাই। পড়ে আছে কয়েকটা ভাঙা উনোন, দু-একটা ভাঙা হাঁড়ি, কিছু কুচো হাড়—বোধ হয় পাখীর হাড় ছড়িয়ে পড়ে আছে। বেদেরা চলে গিয়েছে। গঙ্গার জলের ধারে পলি মাটিতে অনেকগুলি পায়ের ছাপ জেগে রয়েছে। কতকগুলো কাক মাটির উপর বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, কুচো হাড়গুলো ঠোকরাচ্ছে। দুটো শহরের পথের কুকুর বসে আছে গাছতলায়। ওরা বোধ হয় বেদেদের উচ্ছিষ্টের লোভে শহর থেকে এখানে এসে কয়েকদিনের জন্য বাসা গেড়েছিল। বেদেরা চলে গিয়েছে, সেকথা ওরা এখনও ঠিক বুঝতে পারে নাই। ভাবছে—গেল কোথাও, আবার এখুনি আসবে।

শিবরামও একটু বিস্মিত হলেন। বেদেরা চলে যায় এমনিভাবে—ওরা থাকতে আসে না, ওই ওদের ধারা, একথা তিনি ভাল করেই জানেন, তবুও বিস্মিত হলেন। কই, কাল দুপুরবেলা শবলা তো কিছু বলে নাই। তার কথাগুলি এখনও তাঁর কানে বাজছে।

—ধরমভাই, তুমি আমার ধরমভাই, ধন্বন্তরি ভাই, বেদের বেটী কালনাগিনী বইন। নরে নাগে বাস হয় না চিরকালের কথা। হয়েছিল বণিককন্যে আর পদ্মনাগের দুটি ছাওয়ালের ভালবাসার জোরে, ভাইফোঁটার কল্যেনে। বিষহরির কৃপায়। এবারে হ'ল তুমাতে আমাতে। তুমি মোরে বইন কইলা, মুই কইলাম ভাই।

আরও কানে বাজছে—যদি দিবারে পারতে ধরমভাই, তবে বইনটা তুমার বাঁচত।

শিবরাম গত কাল সারাটা রাত্রি ঘুমাতে পারেন নাই। ওই কথাগুলিই তাঁর মাথার মধ্যে প্রশ্ন তুলে ঘুরেছে।

সেই কথাই তিনি জানতে এসেছিলেন শবলার কাছে। জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন—এ কথা কেন বললি আমাকে খুলে বল্ শবলা বোন। আমাকে খুলে বল্।

নস্তব্ধ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন জনহীন নদীকূলে।

* * *

এক বৎসর পর আবার এল বেদের দল।

এর মধ্যে শিবরাম কত বার কামনা করেছেন—আঃ কোনক্রমে যদি এবারও সূচিকাভরণের পাত্রটা মাটিতে পড়ে যায়! তা হ'লে গুরু আবার যাবেন সাঁতালী গাঁয়ে। ঘাস বনের মধ্য থেকে হাঙরমুখী খালের বাঁকে—বেরিয়ে আসবে কালনাগিনী বেদের মেয়ে। নিকষ কালো সুকুমার মুখখানির মধ্যে আলোর শিখা জ্বলে উঠবে তার চোখের দৃষ্টিতে ঠোঁটের হাসিতে।

কিন্তু সে কি হয়?

আচার্য ধূর্জটি কবিরাজ শিবরামের পাংশু মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারবেন—সূচিকাভরণের পাত্রটি দৈবাৎ মাটিতে পড়ে চূর্ণ হয় নি—হয়েছে—। শিবরাম শিউরে উঠেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের মুঠি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে।

যাক সে কথা। বেদেরা এসেছে। বৎসরেরও বেশি সময় চলে গিয়েছে। প্রায় এক সপ্তাহ বেশি। অন্য হিসেবে আরও বেশি। এ বৎসর পর্ব-পার্বণগুলি অপেক্ষাকৃত এগিয়ে এসেছে। মলমাস এবার

দুর্গাপূজারও পরে। নাগপঞ্চমী গিয়েছে ভাদ্রের প্রথম পক্ষে। শারদীয়া পূজা গেছে আশ্বিনের প্রথমে, সে হিসেবে ওদের আরও অনেক আগে আসা উচিত ছিল।

বাইরে চিমটের কড়া বাজছে—ঝনাৎ ঝন—ঝনাৎ ঝন—ঝনাৎ ঝন।

তুমড়ী বাঁশী বাজছে—একঘেয়ে মিহিস্বরে। সঙ্গে বাজছে বিষম-ঢাকিটা: ধুম-ধুম! ধুম ধুম!

ভারী কণ্ঠস্বরে বিচিত্র উচ্চারণে হাঁকছে—জয় মা বিষহরি! জয় বাবা ধন্বন্তরি! জয়জয়কার হোক—তুমার জয়জয়কার হোক!

শিবরাম ঘরের মধ্যে বসে ওষুধ তৈরি করছিলেন। ধূর্জটি কবিরাজ আজ বাইরেই আছেন। একটি বিচিত্র রোগী এসেছে দূরান্তর থেকে, পরিপূর্ণ আলোর মধ্যে আচার্য রোগীটিকে দেখছেন। শিবরাম চঞ্চল হয়ে উঠলেন বেদেদের কণ্ঠস্বর শুনে। কিন্তু গুরুর বিনা আহ্বানে নিজের কাজ ছেড়ে তাঁর বাইরে যেতে সাহস হচ্ছে না।

—পেনাম বাবা ধন্বন্তরি। জয় জয়কার হোক। ধন্বন্তরির আটন হামরাদের যজমানের ঘর, ধনে-পুত্রে উথলি উঠুক। তুমার দয়ায় হামরাদের প্যাটের জ্বালা ঘুচুক।

ভারী গলায় আচার্যের কথা শুনতে পেলেন শিবরাম। —কি, মহাদেব কই? বুড়ো? সে?

—বুড়া শয়ন নিছে বাবা। বুড়া নাই!

—মহাদেব নাই? গত হয়েছে? শান্ত কণ্ঠস্বরেই বললেন আচার্য! মানুষের মৃত্যু-সংবাদে আচার্য ধূর্জটি কবিরাজের তো বিস্ময় নাই। ক্ষীণ বেদনার একটু আভাস শুধু ভারী কণ্ঠস্বরকে একটু সিক্ত করে দিয়েছে। আবার বললেন—কি হয়েছিল? নাগদংশন?

—লাগিনী বাবা, লাগিনী! কাললাগিনী—শবলা—তাকে নিয়েছে!

এবার শিবরাম আর থাকতে পারলেন না, দ্রুতপদে এসে বাইরে দাঁড়ালেন। সেই অর্ধ-উলঙ্গ রুক্ষ ধূলিধূসর মূর্তি পুরুষের দল, কালো পাথর কেটে গড়া মূর্তির মত মানুষ উঠানে সারি দিয়ে বসেছে। পিছনে কালো ক্ষীণ দেহ দীর্ঘাঙ্গী মেয়ের দল। কই—শবলা কই ?

আচার্য আবার একবার মুখ তুলে তাকালেন ওদের দিকে। বললেন—গতবারের ঝগড়া তা হ'লে মেটে নাই ? আমি বুঝেছিলাম, বিষগালতে গিয়ে মহাদেবের হাতটা বেঁকে গেল—সেই দেখেই বুঝেছিলাম। তা হ'লে দু'জনেই গিয়েছে ?

অর্থাৎ শবলার প্রাণ নিয়েছে মহাদেব, মহাদেবের প্রাণ নিয়েছে শবলা।

নূতন সর্দার সবে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়েছে। মহাদেবের মতই জোয়ান। তার দেহখানায় বহুকালের পুরানো মন্দিরের গায়ে শ্যাওলার দাগের মত দাগ পড়ে নাই, এত ধূলিধূসর হয়ে ওঠে নাই। সে মাথা হেঁট করে বললে—না বাবা, সে পাপিনী কালনাগিনীর জানটা লিতে লেরেছি হামরা। লোহার বাসর ঘরে লখিন্দরকে খেয়ে নাগিনী পলায়েছিল, বেহুলা তার পুচ্ছটা কেটে লিয়েছিল ; হামরারা তাও লেরেছি। বুড়ার বুকের পাঁজরে লাগদন্ত বসায়ে দিয়া পড়ল গাঙের বুকে ঝাঁপায়ে—ডুবল, মিলায়ে গেল। শেষ রাতের গাঙ, চারিপাশ আকাশের বুক থেক্যা গাঙের বুক পর্যন্ত আঁধার—দেখতে পেলম না কুন্ দিকে গেল। রাতের আঁধারে—কালো মেয়েটা যেন মিশায়ে গেল।

* * *

নতুন সর্দারের নাম গঙ্গারাম।

গঙ্গারাম মহাদেবের ভাইপো। গঙ্গারাম বেদেকুলে বিচিত্র মানুষ। সে এরই মধ্যে বার তিনেক জেল খেটেছে। অদ্ভুত জাদুবিদ্যা জানে সে।

ওই জেলখানাতেই জাদুবিদ্যায় দীক্ষা নিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়েও সে বড় একটা গ্রামে থাকত না। এখান ওখান ক'রে বেড়াত, ভোজ-বিদ্যা জাদুবিদ্যা দেখাত, দেশে দেশে ঘুরত। এবার ওকে বাধ্য হয়ে সর্দারী নিতে হয়েছে। মহাদেবের ছেলে নাই। সে মরেছে অনেক দিন। বিধবা পুত্রবধূ—শবলা—নাগিনী কন্যা—মহাদেবকে নাগদন্তে দংশন করে তাকে হত্যা করে পালিয়েছে। এই মাত্র এক পক্ষ আগে। সাঁতালী থেকে বেরিয়েছে ওরা যথাসময়ে; হাঙরমুখীর খাল বেয়ে নৌকার সারি এসে গাঙে পড়ল; মহাদেব বললে—বাঁধ নৌকা রাতের মতুন।

ভাদ্রের শেষ, ভরা গঙ্গা। গঙ্গার জল ভাঙনের গায়ে ছলাৎ ছল—ছলাৎ ছল শব্দে ঢেউ মারছে। মধ্যের বালুচর—যেটা প্রায় সাত-আট মাস জেগে থাকে—সেটার চিহ্ন দেখা যায় না। ভাঙা গাঙের পাড় থেকে মধ্যে মধ্যে ঝুপ ঝাপ করে মাটি খসে পড়ছে। মধ্যে মধ্যে পড়ছে বড় বড় চাঙড়। বিপুল শব্দ উঠছে, গাঙ দুলে উঠছে। দুলে দুলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত চলে যাচ্ছে।

মাথার উপরে কটা গগনভেরী পাখী কর-কর কর-কর শব্দ তুলে উড়ছিল। দূরে বোধ হয় আধক্রোশ তফাতে ঝাউবনে ফেউ ডাকছিল। বাঘ বেরিয়েছে। হাঁসখালির মোহনার কাছাকাছি—ঘাসবনে বিশ্রী তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ চীৎকার উঠছে, দুটো জানোয়ারে চেঁচাচ্ছে। দুটো বুনো দাঁতাল শূয়োরে লড়াই লেগেছে। আশেপাশে মধ্যে মধ্যে কোন জলচর জল তোলপাড় করে ফিরছে। কোন কুমীর হবে। নৌকাগুলি এরই মধ্যে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছিল। ছইয়ের মধ্যে প্রায় সবগুলি ডিবিয়ার আলোই নিভে গিয়েছে। ছইয়ের মাথায় জন চারেক জোয়ান বেদে বসে ছিল। পাহারা দিচ্ছিল। কাছে কুমীরটা এলে হৈ হৈ করে উঠবে।

তা-ছাড়া, পাহারা দিচ্ছিল বেদের মেয়েরা না এ-নৌকো থেকে ও-নৌকায় যায়।

এরই মধ্যে মহাদেবের নৌকা থেকে উঠল মর্মান্তিক চীৎকার। নৌকাখানা যেন প্রচণ্ড আলোড়নে উলটে যায়-যায় হল—কি হল?

—কি হইছে? সর্দার? দাঁড়িয়ে উঠল বেদে পাহারাদারেরা ছইয়ের উপর। সর্দার!

সর্দার সাড়া দিলে না, একটা কালো উলঙ্গ মূর্তি বেরিয়ে পড়ল সর্দারের ছই থেকে, ঝপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গার জলে। দূরে জলচর জীবটাও একবার উথল মেরে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিলে। আরও বার দুই উথল মারলে, আর মারলে কি-না দেখার অবকাশ ছিল না।

সর্দারের চীৎকার তখনও উঠছে। গোঙাচ্ছে সে!

নৌকায় নৌকায় আলো জ্বলল। সর্দারের পাঁজরায় একটা লোহার কাঁটা বিঁধে ছিল। দেখে শিউরে উঠল সকলে।

নাগিনী কন্যের 'নাগদন্ত'। কন্যেদের নিজস্ব অস্ত্র। বিষমাখা লোহার কাঁটা। এ যে কি বিষ তা কেউ জানে না। নাগিনী কন্যেরাও জানে না। বিষের একটি চুঙি আদি বিষকন্যে থেকে—হাতে হাতে চলে আসছে। ওই কাঁটা থাকে তাতেই বন্ধ। সেই কাঁটা। সর্দারের চোখ দুটি আতঙ্কে যেন বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

গঙ্গারাম ডাকলে—কাকা! কাকা!

সর্দার কথা বললে না। হতাশায় ঘাড় নাড়লে শুধু। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর বললে—জল।

জল খেয়ে হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—শুধু হামরার পরানটাই লিলে না লাগিনী, হামরাকে নরকে ডুবায়ে গেল। অন্ধকারে মুই ভাবলাম—এল বুঝি—দধিমুখী, মুই—

হতাশায় মাথা নাড়লে যেন মাথা ঠুকতে চাইলে মহাদেব।

শিউরে উঠল সকলে।

দধিমুখী মহাদেবের প্রণয়িনী, সমস্ত বেদে পল্লীর মধ্যে এ প্রণয়ের কথা সকলেই জানে।

মেঝের উপর শবলার পরিত্যক্ত কাপড়খানা পড়ে রয়েছে। সর্বনাশী নাগিনী কন্যা এসেছিল নিঃশব্দে। নৌকার দোলায় জেগে উঠল মহাদেব, সে ভাবলে—দধিমুখী এল বুঝি। সর্বনাশী বুড়ার আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা দিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিয়েছে নাগদণ্ড। শুধু তাকে হত্যা করারই অভিপ্রায় ছিল না তার, তাকে ধর্মে পতিত ক'রে—পরকালে তার অনন্ত নরকের পথ প্রশস্ত করে দিয়ে উলঙ্গিনী মূর্তিতে ঝাঁপ খেয়েছে গঙ্গায়।

গঙ্গারাম বললে—এ সব তো বাবার কাছে লতুন কথা লয়। ই সব তো আপুনি জানেন। কন্যেটার এ মতি অ্যানেক দিন থেক্যাই হয়েছিল বাবা। অ্যানেক দিন থেক্যা! ঐ কন্যেগুলানেরই ওই ধারা!

* * *

কন্যেগুলির এই ধারাই বটে।

চকিতে শিবরামের মনে পড়ল শবলা তাকে বলেছিল—সে ওষুদ যদি না জান ধরমভাই, যদি দিতে না পার—তবে অঙ্গের জ্বালা জুড়াবার ওষুদ দাও। হিজল বিলের জলে ডুবি, মা গঙ্গার জলে ভাসি, বাহির জুড়ায় ভিতর জুড়ায় না। তেমান কোন ওষুদ দাও, আমার সব জুড়ায়ে যাক।

গঙ্গারাম বলে—ওই নাগিনী কন্যারা চিরটা কাল ওই ক'রে আসছে। ওই উয়াদের ললাট, ওই উয়াদের স্বভাব। বিধেতার নির্দেশ। বেহুলা সতীর অভিশাপ।

সতীর পতিকে দংশন করলে কালনাগিনী।

সতীর দীর্ঘশ্বাসে কালনাগিনীর কালনাগেরাও শেষ হয়ে গেল। বেহুলা সতী মরা পতি কোলে নিয়ে কলার মাঞ্জাসে অকূলে ভাসলে, দিন গেল, রাত্রি গেল, গেল কত বর্ষা, কত ঝড়, কত বজ্রাঘাত, এল কত পাপী, কত রাক্ষস, কত হাঙ্গর, কত কুম্ভীর, সে সবকে সহ্য ক'রে উপেক্ষা করে সতী মরাপতির প্রাণ ফিরিয়ে আনলে, মা বিষহরি মর্তধামে নিজের পূজা পেলেন, চাঁদ-সাধুকে ফিরিয়ে দিলেন হারানো ছয় পুত, হারানো সপ্তডিঙা মধুকর কিন্তু ভুলে গেলেন হতভাগিনী কালনাগিনীর কথা। সতীর অভিশাপে যে কালনাগ সৃষ্টি থেকে বিলুপ্ত হল—তারা আর ফিরল না। কালনাগিনী নরকুলে জন্মায় কিন্তু কালনাগিনীর ভাগ্য নিয়েই জন্মায়, তার স্বামী নাই; তাই যে বেদের ছেলের সঙ্গে তার সাদী হয় শিশুকালে নাগদংশনে তার প্রাণটা যায়। তারপর নাগিনী-কন্যার লক্ষণ ফোটে তার গায়ে—তখন সে পায় মা মনসার বারি—পায় তাঁর পূজার ভার কিন্তু পতি পায় না, ঘর পায় না, পুত্র পায় না হতভাগিনী। তারপর নাগিনী স্বভাব বেরিয়ে পড়ে। হঠাৎ বাধে তার সর্দারের সঙ্গে কলহ।

গঙ্গারাম বলে—বাবা, ওইটি হ'ল পেথম লক্ষণ। বুঝলে না। বাপের উপর পড়ে আক্রোশ। বাপের ঘরে ধরে অরুচি।

* * *

গতবার মহাদেব এই ধন্বন্তরি বাবার উঠানে বিষ গালতে বসে এই কথাই বলেছিল; বলতে গিয়ে এমন উত্তেজিত হয়েছিল যে, হঠাৎ তার সাপের মুখধরা হাতখানা চঞ্চল হয়ে বেঁকে গিয়েছিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বেদের মেয়ে শবলা ঠিক মুহূর্তে তার হাত সরিয়ে নিয়েছিল, তাই রক্ষা পেয়েছিল, নইলে সেদিন শবলাই যেত। মহাদেব বলেছিল—মেয়েটার রীতিচরিত্র

বিচিত্র হয়ে উঠেছে। মনে তার পাপ ঢুকেছে। সেও সেদিন বলেছিল—জাতের স্বভাব যাবে কোথা বাবা, ও জাতের ওই স্বভাব—ওই ধারা। মুহূর্তের জন্য নাগিনী কন্যা শবলার চোখ জ্বলে উঠেছিল, সে জ্বলে-ওঠা এক আধ জনের চোখে পড়েছিল, অধিকাংশ মানুষের চোখেই পড়ে নাই, তাদের দৃষ্টি ছিল মহাদেবের মুখের দিকে। শিবরাম দেখেছিলেন। বোধ করি তারুণ্যধর্মের অমোঘ নিয়মে তাঁর দৃষ্টি ওই মোহময়ী কালো বেদের মেয়ের মুখের উপরই নিবদ্ধ ছিল, তাই চোখে পড়েছিল। না হলে তিনিও দেখতে পেতেন না; কারণ মুহূর্ত মধ্যেই সে দীপ্তি নিভে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল মেয়েটার নারীরূপের ছদ্মরূপ ভেদ ক'রে মুহূর্তের জন্য তার নাগিনীরূপ ফণা ধরে মুখ বের করেই আবার আত্ম-গোপন করলে।

আচার্য বলেছিলেন—শির বেদে আর বিষহরির কন্যে বাপ আর বেটী। বাপবেটীর ঝগড়া মিটিয়ে নিয়ো।

বাপের উপর আক্রোশ পড়েছিল নাগিনী কন্যের।

পড়বে না? কত সহ্য করবে শবলা? কেন সহ্য করবে? সাধে বাপের উপর আক্রোশ পড়ে কন্যের? কম দুঃখে পড়ে?

সাপের বিষকে পৃথিবীতে বলে হলাহল, মানুষের রক্তে একফোঁটা পড়লে মানুষের মৃত্যু হয়, দুর্গম পাহাড়ের মাথায় ঘন অরণ্যের ভিতর যাও, দেখবে পাথর ফাটিয়ে গাছ জন্মেছে, সে গাছ আকাশ ছুঁতে চলেছে; জন্মেছে দেখবে, লোহার শিকলের মত মোটা লতা, একটি গাছে জড়িয়ে মাথার উপর উঠে সে গাছ ছাড়িয়ে গাছের মাথায় মাথায় লতার জাল তৈরি করেছে; জন্মেছে দেখবে পাহাড়ের বুক ছেয়ে বিচিত্র ঘাসের বন.; তারই মধ্যে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে দেখবে—স্থানে স্থানে জেগে

রয়েছে এক একখানা পাথর—ঘাস না, শ্যাওলা না, কঠিন কালো তার রূপ! ভাল করে দেখলে দেখতে পাবে, তার চারি পাশে জমে রয়েছে মাটির গুঁড়োর মত কিছু; মাটির গুঁড়ো নয় পিঁপড়ে জাতীয় কীট। তোমরা জান না, বেদেরা জানে, ও পাথর বিষশৈল—বিষপাথরে পরিণত হয়েছে। এই পাহাড়ের মাথায় ঘন বনে বাস করে শঙ্খচূড় নাগ। সাত-আট হাত লম্বা কালো রঙের ভীষণ বিষধর। তারা রাত্রে এসে দংশন করে বিষ ঢালে ওই পাথরের উপর। পাথরটা মরে গিয়েছে, গাছ তো গাছ, ওতে শ্যাওলাও ধরবে না কখনও। সাপের বিষের এক ফোঁটায় মানুষ মরে, এক ফোঁটা পাথরের বুকে পড়লে পাথরের বুকও জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় চিরদিনের মত। পিপড়েগুলো ওই পাথরের বুকে চটচটে বিষকে রস মনে করে দলবেঁধে ছেয়ে ধরেছিল; বিষে জ'রে ধুলো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে ভীষণ হল একটুকরো রূপো—এক বিন্দু সোনা। তারও চেয়ে ভীষণ হল আটন গো আটন!

নাগিনী কন্যার আটনে বসে—মা বিষহরির বারিতে ফুল জল দিয়ে কি ক'রে সে সহ্য করবে বুড়ার অনাচার? প্রথম যখন নাগিনী কন্যা থাকে বয়সে কচি, ওদিকে পুরানো নাগিনী কন্যে তার পরানটা নেবার চেষ্টা করে তখন অগাধ বিশ্বাসে শিরবেদেকে আঁকড়ে ধরে নাগিনী কন্যা; মেয়ে যেমন বাপকে আশ্রয় করে ঠিক তেমনি করেই ধরে। তারপর সে আপনার আসনে শক্ত হয়ে বসলেই তখন সে হয় দোষী।

গত বার যখন এই ধন্বন্তরি বাবার এখানেই তারা এল বিষবিক্রী করবার জন্য তখন কি সকলে শবলাকে বলে নি, বলে নি—কন্যে তু বুল্ সদ্দারকে—যার বা পাওনা—সব ওই ঠাঁইয়েই মিটিয়ে দিক। লইলে—

নোটন-যে নোটন—মহাদেবের অতি অনুগত লোক—সেই নোটনও বলেছিল সি—গেলবারের হিসাবটা—সেও মিটল না ই বছর তাকাত।

সেই কথাতে বিবাদ। নাগিনী কন্যা বিষহরির পূজারিনী, বেদে-কুলের কল্যাণ করাই তার কাজ; সেই তার ধর্ম—এ কথা সে না বললে বলবে কে? এই বলতে গিয়েই তো বিপদ। ঝগড়ার শুরু! সে সবারই অধরম দেখে বেড়াবে কিন্তু সে অধরম করবে তাতে কেউ কিছু বললে সে-ই হবে বজ্জাত!

বিষহরি পূজার প্রণামী—পূজার সামগ্রী ভাগও করবে নাগিনী কন্যা। কন্যের এক ভাগ, শিরবেদের এক ভাগ, বাকী দুভাগ সকল বেদের। কন্যের ভাগ আবার হয় দুভাগ—পুরানো নাগিনী কন্যে পায়, যে বেদের ঘরে বেদে নাই সে ঘরের মেয়েরা পায়। সেই ভাগ নিয়ে বিবাদ। সমস্ত ভাল সামগ্রীর উপর দাবি ওই সর্দারের। হবে না—হবে না বিবাদ!

এ বিবাদ চিরকালের। চিরকাল এ বিবাদ হয়ে আসছে। কখনও জেতে শিরবেদে, কখনও জেতে ও কন্যে। কন্যে জেতে কম; জিতলেও সে জয় শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় পরাজয়ে। মা বিষহরির পূজারিনী ওই কন্যে, ও যে অন্তরে অন্তরে নাগিনী, ওকে দংশন করেই পালাতে হয়; না পারলে ঘটে মরণ। তা ছাড়া বেহুলার অভিশাপ ওদের ললাটে, হঠাৎ একদিন সেই অভিশাপের ফল ফলে। দেহে মনে ধরে জ্বালা। রাত্রে ঘুম আসে না চোখে, মাটির উপর পড়ে অকারণে কাঁদে। হঠাৎ মনে হয় যেন কে কোথায় শিস দিচ্ছে।

শিবরামের সঙ্গে শেষ যেদিন দেখা হয়েছিল—সেই দিন রাত্রে শবলা তাদের আড্ডায় শুয়েছিল বিনিদ্র চোখে। ঘুম আসছিল না চোখে। মধ্যরাত্রের শেয়াল ডেকে গেল। গঙ্গার কূলের বড় বড় গাছ থেকে বাদুড়েরা কালো ডানা মেলে উড়ে গেল এপার থেকে ওপার, ওপার

থেকে এপার; গাছে গাছে প্যাচা ডেকে উঠল। বেদেনীর মাথার উপরে গাছের ডালে ঝুলানো ঝাঁপির মধ্যে বন্দী সাপগুলো ফুঁসিয়ে উঠল। বেদেনীর অন্তরটাও যেন কেমন ক'রে উঠল। গভীর রাত্রে ডাইনীর বুকের ভিতর খলবল ক'রে ওঠে, শ্মশানে কালীসাধক মা-মা ব'লে ডেকে ওঠে, চোরডাকাতের ঘুম ভেঙে যায় শেয়ালের ডাকে, বিছানায় ঘুমন্ত রোগী একবারও ছটফট করে উঠবে এই ক্ষণটিতে, ঠিক এই ক্ষণটিতে নাগিনী কন্যার অন্তরের মধ্যে কালনাগিনী স্বরূপ নিয়ে জেগে ওঠে; নিত্যই ওঠে। কিন্তু বিছানার খুঁট ধ'রে দাঁতে দাঁত টিপে নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকতে হয় নাগিনী কন্যাকে। এই নিয়ম। কিছুক্ষণ পর বন্ধ করা নিশ্বাস যখন বুকের পাঁজরা ফাটিয়ে বেরিয়ে আসবে মনে হয়—তখন ছাড়তে হয় নিশ্বাস। তারপর হাপরের মত হাঁপায় যখন বুকের ভিতরটা তখন উঠে বসতে হয়। চুল এলিয়ে থাকলে চুল বেঁধে নিতে হয়, এঁটেসেঁটে নতুন ক'রে কষে কাপড় পরতে হয়। বিষহরির নাম জপ করতে হয়। তারপর আবার শোয়। নাগিনী কন্যের অন্তরের নাগিনী তখন চোয়াল-টিপে-ধরা নাগিনীর মত হার মানে, তখন সে খোঁজে ঝাঁপি, অন্তরের ঝাঁপিতে ঢুকে নিস্তেজ হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। তা না ক'রে যদি নাগিনী কন্যে বিছানা ছেড়ে ওঠে, বেরিয়ে আসে—তবে তার সর্বনাশ হয়।

রাত্রের আঁধার তার চোখে মনে নিশির নেশা ধরিয়ে দেয়।

'নিশির নেশা'—নিশির ডাকের চেয়েও ভয়ঙ্কর। নিশির ডাক মানুষ জীবনে শোনে কালে কস্মিনে। 'নিশির নেশা' রোজ নিত্য-নিয়মিত মানুষকে ডাকে। ওই হিজল বনের চারিপাশে জ্বলে আলেয়ার আলো। ঘন বনের মধ্যে বাজে বাঁশের বাঁশী। হিজলের ঘাস বনে এখানে ডাকে বাঘ, ওখানে ডাকে বাঘিনী। বিলের এ মাথায় ডাকে

চকা ওমাথায় ডাকে চকী। 'বনকুকী' পাখীরা পাখিনীদের ডাকে—পাখিনীরা সাড়া দেয়—

—কুক্!

—কুক্!

—কুক্!

—কুক্!

নাগিনী পাগল হয়ে যায়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভুলে যায়। ভুলে যায় মা-বিষহরির নির্দেশ, ভুলে যায় বেহুলার অভিশাপের কাহিনী, ভুলে যায় তার নিজের শপথের কথা। বেদের শিরবেদের শাসন ভুলে যায়, মান সম্মান—পাপ পুণ্য সব ভুলে যায়; ভুলে গিয়ে সে ঘর ছেড়ে নামে পথে। তারপর ওই ঘন ঘাসবনের ভিতর দিয়ে চলে—সন সন ক'রে কালনাগিনীর মতই চলে। সমস্ত রাত্রি উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘোরে: ঘাসবনের ভিতর দিয়ে, কুমারীখালার কিনারায় কিনারায়, হিজলের চারিপাশে—ঘুরে বেড়ায়।

বাঁশী? কে বাঁশী বাজায় গ! কোথায় গ!

রাত্রির পর রাত্রি ঘোরে নাগিনী কন্যা। একদিন বেরিয়ে এলে আর নিস্তার নাই। রোজ রাত্রে নিশির নেশা ধরবে, যেন চুলের মুঠো ধরে টেনে নিয়ে যাবে।

এক নাগিনী কন্যেকে ধরেছিল এই নেশা—তার প্রাণ গিয়েছিল বাঘের মুখে। এক নাগিনী কন্যের দেহ পাওয়া গিয়েছিল হিজল বিলের জলে। এক কন্যের উদ্দেশ মেলে নাই। হাঙরমুখী খালের জলে পাওয়া গিয়েছিল তার লাল কাপড়ের ছেড়া খানিকটা অংশ। কুমীরের পেটে গিয়েছিল সে।

জন দুই-তিন পাগল হয়ে গিয়েছিল। হিজল বিলের ধারে সর্বাঙ্গে

কাদামেখে বসেছিল, চোখ দুটি কুঁচের মত লাল। কেউ কেবলি কেঁদেছে, কেউ কেবলি হেসেছে।

জন চারেকের হয়েছে চরম সর্বনাশ। সর্বনাশীরা ফিরেছে—ধর্ম বিসর্জন দিয়ে। কিছুদিন পরই অঙ্গে দেখা দিয়েছে মাতৃত্বের লক্ষণ। তখন ওই সন্তানকে নষ্ট করতে গিয়ে—নিজে মরেছে। কেউ পালাতে চেয়েছে। কেউ পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়েও তো রক্ষা পায় নি তারা! রক্ষা পায় না, পেতে পারে না। হয় মরেছে বেদে সমাজের মন্ত্রপূত বাণের আঘাতে—নয় তো—নাগিনী-ধর্মের অমোঘ নির্দেশে প্রসবের পরই নখ দিয়ে টুঁটি টিপে সন্তানকে হত্যা করেছে। ডিম ফুটে সন্তান বের হবা মাত্র নাগিনী সন্তান খায়—নাগিনী কন্যাকেও সেই ধর্ম পালন করতেই হবে। নিষ্কৃতি কোথায়? ধর্ম ঘাড়ে ধ'রে করাবে যে!

নিশির নেশা! নাগিনী কন্যের মৃত্যুযোগ। রাত্রির দ্বিপ্রহর ঘোষণার লগ্নে চোখ বন্ধ ক'রে, শ্বাস রুদ্ধ ক'রে, দাঁতে দাঁত টিপে দু হাতে খুঁট আঁকড়ে ধরে পড়ে থেকো নাগিনী কন্যে।

•

গঙ্গার কূলে বটগাছের তলায় খেজুর চাটাইয়ের খুঁট চেপে ধরতে গিয়েও সে দিন শবলা তা ধরলে না। কি হবে ও? কি হবে? কি হবে? এতবড় জোয়ানটাই তার জন্যে প্রাণটা দিয়েছে। না হয় সেও প্রাণটা দেবে। তার প্রেতাত্মা যদি ওই গঙ্গার ধারে এসে থাকে? বুকের ভিতরটা তার হু-হু করে উঠল। উঠে বসল সে খেজুর চাটাইয়ের উপর।

আকাশ থেকে মাটির বুক পর্যন্ত থম থম করছে অন্ধকার! আকাশে সাতভাই তারারা ঘুরপাক খেয়ে হেলে পড়বার উদ্যোক করছে। চারিদিকটায় দুপহর ঘোষণার ডাক ছড়িয়ে পড়ছে। নিশির ডাক এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে। বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠল। শব্দ শুনতে

পাচ্ছে সে ধ্‌ক—ধ্‌ক–ধ্‌ক—ধ্‌ক। চোখে তার আর পলক পড়ছে না। অন্ধকারের দিকে চেয়ে রয়েছে। গাছ পালা মিশে গিয়েছে অন্ধকারের সঙ্গে, শহর ঢেকে গিয়েছে অন্ধকারে মধ্যে, ঘাট, মাঠ, ক্ষেত খামার, বন, বসতি, বাজার হাট, মানুষ জন—সব—সব—সব অন্ধকারের মধ্যে মিশে গিয়েছে! যেন কিছুই নাই কোথাও; আছে শুধু অন্ধকার—জগতজোড় এক কালো পাথা—র—

সে উঠল; এগিয়ে চলল। এগিয়ে চলল গঙ্গার দিকে। গঙ্গার উঁচুপাড় ভেঙে সে নেমে গিয়ে বসল—সেই খানটিতে, যেখানটিতে সে দিন সেই জোয়ান ছেলেটা তার জন্যে বসে ছিল। একটানা ছল ছল—ছল ছল শব্দ উঠছে গঙ্গার স্রোতে, মধ্যে মধ্যে গঙ্গার স্রোত পাড়ের উপর ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়ছে। পাশেই একটু দূরে তাদের নৌকা গুলি দোল খাচ্ছে। ভিজে মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে সে কাঁদতে লাগল!

মা গঙ্গা! মোর অঙ্গের জ্বালা তুমি জুড়িয়ে দিয়ো, মুছিয়ে দিয়ো। মা গঙ্গা! আমার জন্যে—শুধু আমার জন্যে সে দিলে তার পরানটা। হায়রে! হায়রে!

ইচ্ছে হ'ল সেও ঝাঁপ দেয় গঙ্গার জলে।

তার বুকে জ্বালাও তো কম নয়। জ্বালা কি শুধু বুকে? জ্বালা যে সর্বাঙ্গে!

হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজে চমকে উঠল সে। চিনতে পারলে সে এ কার গলার আওয়াজ। বুড়ার! বুড়া ঠিক জেগেছে। ঠিক বুঝতে পেরেছ। দেখেছে, শবলার বিছানায় শবলা নাই।

মুহূর্তে শবলা নেমে পড়ল গঙ্গার জলে। একটু পাশেই তাদের নৌকাগুলি গাঙের ঢেউয়ে অল্প অল্প দুলছে। সে সেই নৌকাগুলির

ধারে ধারে ঘুরে একটি নৌকায় উঠে পড়ল। এটি তারই নৌকা। নাগিনী কন্যের লা। মা বিষহরির বারি আছে এই নৌকায়। উপুড় হয়ে সে পড়ে রইল বারির সামনে। রক্ষা কর মা, রক্ষা কর! বুড়ার হাত থেকে রক্ষা কর। নিশির নেশা থেকে শবলারে তুমি বাচাও! বেদে কুলের পুণ্যি যেন শবলা থেকে নষ্ট না-হয়। জোয়ানটার প্রাণ গিয়েছে—তুমি যদি নিয়েছ মা, তবে শবলার বলবার কিছু নাই। কিন্তু মা গ, জননী গ, যদি মানুষে ষড়যন্ত্র করে নিয়ে থাকে—তবে তুমি তার বিচার ক'রো। সূক্ষ্ম বিচার তোমার মা—সেই বিচারে দণ্ড দিয়ো।

"তুমি তার বিচার ক'রো মা বিচার ক'রো।"

কখন যে সে চীৎকার করে উঠেছিল সে নিজেই জানে না। কিন্তু সে চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল নৌকার পাহারাদারদের। তারা সভয়ে সন্তর্পণে এসে দেখলে—শবলা পড়ে আছে বিষহরির বারির সম্মুখে। চীৎকার করছে—বিচার করো! বেদের ছেলেরা জানে, নাগিনী কন্যার আত্মা—সে মানুষের আত্মা নয়, নাগকুলের নাগ-আত্মা। বিষহরি তার হাতে পূজো নেবেন বলে তাকে পাঠান বেদেকুলে জন্ম নিতে। তার 'ভর' হয়। চোখ রাঙা হয়ে ওঠে—চুল এলিয়ে পড়ে—সে তখন আর আপনার মধ্যে আত্মস্থ থাকে না। সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে তার তখন যোগাযোগ হয়। বেদেকুলের পাপপুণ্যের পট খুলে যায় তার লাল চোখের সামনে। সে অনর্গল ব'লে যায়। এই পাপ, এই পাপ, এই পাপ! হবে না—এমন হবে না?

বেদের ছেলেরা শিউরে উঠল ভয়ে। ভিজে কাপড়ে ভিজে চুলে উপুড় হয়ে পড়ে আছে নাগিনী কন্যে। হাত জোড় ক'রে চীৎকার করছে—বিচার করো।

তারা নৌকাতে উঠেছে, নৌকা দুলছে—তবু হুঁশ নাই। এ নিশ্চয় ভর। এই নিশীথ রাত্রে এই চীৎকার! উঃ চীৎকারে অন্ধকারটা যেন চিরে যাচ্ছে!

দেখতে দেখতে ঘুমন্ত বেদেরা জেগে উঠল। এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল গঙ্গার কূলে। হাত জোড় ক'রে সমবেত স্বরে চীৎকার ক'রে উঠল—রক্ষা কর মা, রক্ষা কর।

কিন্তু সর্দার কই? সর্দার? বুড়া? বুড়া কই?

ভাদু বেদে হাঁকলে—সর্দার! অ—গ! কই? কই?

কোথায় বুড়া? বুড়া নাই!

ভাদু শবলার কাকা। ভাদু বললে—শবলার মাকে। প্রৌঢ়া সুরধুনী বেদেনীকে বললে—ভাজ বউ গ, তুমি দেখ একবার। কন্যেটারে ডাক।

বেদেনী ঘাড় নাড়লে—না দেওর! লারব। ওরে কি এখুন ছোঁয়া যায়?

—তবে?

—তবে সবাই মিল্যা একজোট হয়ে চিল্লায়ে ডাক দাও। দেখ কি হয়?

—সেই ভাল। লে গ,—সবাই মিল্যা একসাথে লে। হে—মা—

সকলে সুর মিশিয়ে দিলে একসঙ্গে।—হে—মা—বিষহরি গ! স্তব্ধ নিশীথ রাত্রির সুষুপ্ত সৃষ্টি চকিত হয়ে উঠল। ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠল—গঙ্গার কূলে, ও পাশের ঘন বৃক্ষসন্নিবেশে, ছুটে গেল এ পারের প্রান্তরে, ছড়িয়ে পড়ল দিগন্তরে। শবলার চেতনা ফিরে এল। সে মাথা তুললে।—কি?

পরমুহূর্তেই সে সব বুঝতে পারলে। তার ভর এসেছিল। দেবতা

তার পরান-পুতলীর মাথার উপর হাত রেখেছিলেন। শরীরটা এখনও তার ঝিম্-ঝিম করছে। তবু সে উঠে বসল।

—উঠেছে, উঠে বসিছে, কন্যে উঠে বসিছে গ। বললে জটাধারী বেদে।

বেদেরা আবার ধ্বনি দিলে—জয় মা বিষহরি!

টলতে টলতে বেরিয়ে এল শবলা!

—ধর গ! ভাজ বউ, কন্যেরে ধর। টলছে।

সুরধুনী বেদেনী এবার জলে নামল।

—কি হল্‌ছিল কন্যে? বেটী?

শবলা বললে—মা দেখা দিলেন গ। পরশ দিলেন।

—কি কইলেন?

—কইলেন? চোখ দুটো ঝকমক করে উঠল তার। সে বললে—সূক্ষ্ম বিচার করবেন মা। সুতার ধারে সূক্ষ্ম বিচার!

হঠাৎ কুকুরের চীৎকারে সকলে চমকে উঠল।

কি গলার আওয়াজ কুকুরের! এক সঙ্গে দু-তিনটে চীৎকার করে ছুটে আসছে। কাউকে যেন তাড়া ক'রে আসছে!

ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল দৈত্যের মত একটা মানুষ।

সর্দার! শিরবেদে!

ছুটে এল দুটো মুখ থ্যাবড়া সাদা কুকুর।

—লাঠি! ভাদু লোটন—লাঠি! খেয়ে ফেলাবে, ছিঁড়ে ফেলাবে। সঙ্গে সঙ্গেই এল লাঠি, লোহার ডাণ্ডা, চীৎকার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে মহাদেবকে।

—হুই বড় বাড়ীটার পোষা বিলাতী কুকুর! হুই!

মহাদেব গিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে লাফিয়ে পড়বামাত্র তাড়া করেছে। পাচিল ডিঙিয়েই সে পালিয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে তারাও এসেছে। সারাটা পথ মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে ঢেলা ছুঁড়ে রুখতে চেষ্টা করেছে কিন্তু পারে নাই। ঢেলা তারা মানে নাই। হাতে অস্ত্র ছিল না, লাফ দিয়ে পড়বার আগে সে হাতের লোহার ডাণ্ডাটাকে ছুঁড়ে ভিতরে ফেলেছিল, সেটা আর কুড়িয়ে নেবার অবকাশ হয় নাই। তার আগেই কুকুর দুটো এসে পড়েছিল।

—কিন্তুক হোথাকে গেলছিলি ক্যানে—তু?

—ক্যানে? মহাদেবের ইচ্ছে হল—শবলার টুঁটিটা হাতের নখে বিঁধে ঝাঁঝরা করে দেয়। সে তাকাল শবলার দিকে।

শবলার চোখ দুটি ফুঁ-দেওয়া আঙরার মত ধ্বক ধ্বক করে উঠল। সে বললে—কুকুরের কামড়ে মরবি না তু। মরবি তু লাগিনীর দাঁতে। মা বুলেছে হামরাকে। আজ তার সাথে হামরার বাত হল্‌ছে। সূক্ষ্ম বিচার করবেন জমুনী!

মহাদেব চীৎকার করে উঠল—পাপিনী—

—সর্দার! হাত চেপে ধরলে ভাদু।

—এ্যাই! হাত ছাড়্‌। পাপিনীরে হামি—

—আঃ! মুখ খস্যা যাবে তুর। সারা বেদেপাড়া দেখিছে—কন্যের পরে আজ জমুনীর ভর হলছিল! উ সব বুলিস না তু! তু দেখলি না—তুর ভাগ্যি!

শবলা বললে—উ গেলছিল হামরাকে খুঁজতে। সে দিনে হামি উই বাড়ীর রাজাবাবুকে নাচন দেখালছি—গায়েন শোনালছি, বাবু হামরাকে—টকটকে রাঙাবরণ শাড়ী দিছে, তাই উ গেলছিল হামরার

সন্ধানে হোথাকে। ইয়ার বিচার হবে! মা হামরাকে কইলেন—বিচার হবে, সূক্ষ্ম বিচার হবে।

স্তব্ধ হ'য়ে রইল গোটা দলটা। শঙ্কা যেন চোখে মুখে থম থম করছে।

স্থির দৃষ্টিতে মহাদেব তাকিয়ে রইল শবলার মুখের দিকে। সত্যিই শবলা মা বিষহরির বারির পায়ের তলায় ধ্যান করছিল? মা তাকে ডেকেছিলেন? তার হাত-পায়ের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। পায়ের ক্ষতটাই বেশি। খানিকটা মাংস যেন তুলে নিয়েছে। তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

শবলা বললে—রক্ত গুলান ধুয়ে ফেলা বুড়া, হামরার মুখের দিকে তাকায়ে থেক্যা কি করবি? কি হবেক? লে, ধুয়ে ফেলা, খানিক রেড়ীর তেল লাগায়ে লে। বিলাতী কুকুরের বিষ নাই, কুকুরের মতুন ঘেউ ঘেউ কর‍্যা চেঁচায়ে মরণও নাই তুর ললাটে, কিন্তুক ডাঁটুরে পাকলি পর কষ্ট পাবি। আর—

ভাদুর মুখের দিকে চেয়ে বললো—আর মরা কুকুর দুটারে লায়ে ক'রে নিয়া মাঝগাঙে ভাসায়ে দাও। সকালেই বাবুর বাড়ীতে কুকুরের খোঁজ হবেক। চারিদিকে লোক ছুটবেক। দেখতে পেলে—মরণ হবে গোটা দলের। বুঝ্‌লা না? ভাসায়ে দিয়া এস।

—আর শুন। ভোর হ'তে হ'তে—আস্তানা গুটাও। লায়ে লায়ে তুল্যা দাও চিজবিজ। ইখানে আর লয়।

মহাদেব স্তব্ধ হয়েই রইল। কোন কথা সে বললে না। কিন্তু দুপহরের সেই ঘোরালো লগনটিতে,—প্যাচার ডাকে, শিবাদের হাঁকে, গাছের সাড়ায়, বাদুড়ের পাখার ঝাপটানিতে, ঠিক নিশি যখন জাগল —ইসারা পাঠালে পরানে পরানে, ঠিক তখনই, সেই মুহূর্তটিতেই যে

তারও ঘুম ভেঙেছিল। নিত্যই যে ভাঙে। শিরবেদের ঘুম ভাঙে মা বিষহরির আজ্ঞায়, শিরবেদে উঠে তার লোহার ডাণ্ডা হাতে—দণ্ডধরের মত বেদেকুলের পথ রক্ষা ক'রে। লগনটি পার হয়—তখন মহাদেব ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় দধিমুখি বেদেনীর ঘরের ধারে। দধিমুখীও জাগে, সেও বেরিয়ে আসে। তখন শিরবেদে আর দণ্ডধর নয়; সে তখন সাধারণ মনিষ্যি!

এখানেও আজ ক'দিন এসেছে। মহাদেবের ঠিক লগনে ঘুম ভেঙেছে,—ঘুম ভেঙেছে নয়, মহাদেব এ লগনের আগে এখানে ঘুমায় নাই। সে সতর্ক হয়ে লক্ষ্য রেখেছিল—ওই জোয়ানটার দিকে। পাপিনী কন্যের দিকে তো বটেই। জোয়ানটা গিয়েছে। মা বিষহরির আজ্ঞায় সে ছেড়েছিল ওই রাজ গোখুরাটাকে। বলেছিল—পাপীর পরান তু লিবি, তু লাগকুলের রাজপুত্তুর, বিচারের ভার তোরে দিলাম; জোয়ানটার পিছনে ছেড়ে দিয়েছিল। বাঁশের চোঙায় পুরে দড়ি টেনে খুলে দিয়েছিল মুখের ন্যাকড়ার পুঁটুলিটা।

পাপী জোয়ানটা গিয়েছে। কিন্তু —। সে ভেবেছিল—একসঙ্গে দুজনে যাবে। পাপী-পাপিনী দুজনে। কিন্তু জোয়ানটা একা গেল।

আজ সেই লগনে উঠে সে স্পষ্ট দেখেছে নাগিনী উঠল—কালো নাগিনী—বটগাছটাকে বেড় দিয়ে ওপাশে গেল। সেও সন্তর্পণে তার পিছনে পিছনে বটগাছটার এপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। চোখে পড়েছিল অন্ধকারের মধ্যে বড় বাড়ীটার মাথার জলজলে আলোটা। মনে পড়েছিল ওই বাড়ীতে শবলা রাঙা শাড়ী—ষোল আনা বকশিশ পাওয়ার কথা, তাকে রাঙাবরণ সোনার রাজপুত্রের কথা অন্য বেদেনীদের কাছে বলতে সে নিজের কানে শুনেছে। পাপিনীর চোখে নিশির নেশার ঘোরের মত ঘোর জমতে দেখেছে।

পাপিনী নাগিনী কন্যের বুকে তা হলে জেগেছে কাঁটালীচাঁপার বাসের ঘোর! সে নিশ্চয় গিয়েছে ওই পথে। শুধু তাই নয়, সে অন্ধকারের মধ্যে ওই পথের দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ একসময় ঠিক মনে হল—সাদা কাপড়পরা কালো পাতলা মেয়েটা লঘুপায়ে ছুটে চলে যাচ্ছে। হাঁ, ওই—ওই—ওই যে!

সে কোন দিকে চোখ ফেরায় নি। সাদা কাপড় পরা কালো পাতলা মেয়েটাকে—সে যেন হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে চলতে দেখেছে। নাগিনীর পায়ে পাখা গজায়—এই লগ্নে; সে হাঁটে না, উড়ে চলে। ঠিক তাই, পিছনে সাধ্যমত দ্রুত পায়ে তাকে অনুসরণ করছে, সে ছুটেছে। ওই পাচিলের কোল পর্যন্ত আসতে ঠিক দেখছে।

তবে? তবে এ কি হল?

বেদেদের কাছে তার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নাগিনী তার মাথার উপর ফণা তুলে দুলছে। যে-কোন মুহূর্তে ওকে দংশন করতে পারে।

—উঠ্ বুড়া। উঠ্। লা ছাড়বে।

বললে শবলা।

ভোর হতে না হতে বেদেদের নৌকা ভাসল মাঝ গঙ্গায়।

দক্ষিণে—দক্ষিণে। স্রোতের টানে ভাসবে লা। দক্ষিণে।



(দুই)

এ কথাগুলি শিবরামের নয়। এ-কথা 'পিঙ্‌লা' অর্থাৎ পিঙ্গলার; পিঙ্গলাই হ'ল শবলার পরে সাঁতালী গাঁয়ের বেদেকুলের নতুন নাগিনী কন্যা।

পিঙলা বলে—মায়ের লীলা। বেদেকুলের মা বলতে বিষহরি, বেদেদের অন্য মা নাই। কালী না, দুর্গা না; কেউ না। বেদেদের বাপ বলতে শিব। শিব মানস থেকে মা বিষহরির জনম গ। পদ্মবনের মধ্যে শিবের মনের থেকে জন্ম নিয়া পদ্মপাতের মধ্যে ধীরে ধীরে মা বড় হয়্যা উঠলেন। মায়ের আমার পদ্মবনে বাস—অঙ্গের বরণ পদ্মফুলের মত। শিবঠাকুরের মধুপান কর‍্যা নেশা হয় না, তাই শিবের কন্যে পদ্মবনে পদ্মমধু পান করলেন, সেই কন্যের কণ্ঠে—অমৃতের থেক্যা মধুর হইল; তখন সেই মধু খাইলেন শিব। সেই মধুতে তাঁর কণ্ঠ হ'ল নীল বরণ, মধুর পিপাসা মিট্যা গেল চিরদিনের তরে; চক্ষু দুটি আনন্দে হইল ঢুলুঢুলু। শিবের কন্যে—পদ্মাবতী—পদ্মের মত দেহের বরণ তেমনি তার অঙ্গের সৌরভ, মা হইলেন চিরযুবতী।

এই মায়ের পূজোর ভার যার উপরে তার কি বুড়ো হইবার উপায় আছে গ? যুবতী মায়ের পূজা—করবে যুবতী কন্যে। তবে সে কালনাগিনী বলে তার অঙ্গের বরণ হবে কালো। চিকণ চিক-চিকে কালো; মনোহরণ করা কালোবরণ। সেই কারণে এক নাগিনী কন্যে বর্তমানেই নতুন নাগিনী কন্যের আবির্ভাব হয়। সে আবির্ভাব শিরবেদের চক্ষে ধরা পড়ে। কন্যে অনাচার করে—কন্যে বুড়ী হয়—কত কারণ ঘটে; তখন শিরবেদে মনে মনে মায়েরে ডাকে। আঁধার বর্ষার রাত্রে কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে আকাশে ঘনঘটা করে মেঘ ওঠে; থমথম করে চারি

দিক, শিরবেদে আকাশপানে তাকায়। মিলিয়ে নেয়—যে রাত্রে বেদে-দের সর্বনাশ হয়েছিল সেই রাত্রির সঙ্গে। ওগো,—যে রাত্রে লোহার বাসর ঘরে লখিন্দরকে কালনাগিনী দংশন করেছিল—সেই রাত্রের সঙ্গে, গ! মেঘের ঘনঘটার মধ্যে মা বিষহরির দরবার বসে। সামনে আসছে বর্ষা; পঞ্চমীতে পঞ্চমীতে নাগজননীর পূজা; মা দরবার করে খবর নেন—নতুন কালের পৃথিবীতে কে আছে চাঁদসদাগরের মত অবিশ্বাসী। কোথায় কোন্ ভক্তিমতী বেনেবেটীর হল আবির্ভাব। তেমনি কৃষ্ণা-পঞ্চমীর রাত্রি পেলে শিরবেদে বসবে মায়ের পূজায়। ঘরে খিল কপাট দিয়া পূজায় বসবে। মাকে ডাকবে—মা-মা-মা-মা! প্রদীপ জ্বালবে—ধূপ পুড়াবে, ধূপের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। ধারালো ছুরি দিয়া বুকের চামড়া চিরে রক্ত নিয়া সেই রক্ত নিবেদন করবে মাকে। তখন মেঘলোকে মা বিষহরির আটন একটু টলে উঠবে—মায়ের মুকুটের রাজগোখুরা ফণা তুলায়ে হিসহিস করবে। মা বলবেন তাঁর সহচরীকে—দেখ্ তো বহিন নেতা, আসন কেন টলে, মুকুট কেন নড়ে? নেতা খড়ি পাতবে, গুণে দেখবে, দেখে বলবে—সাঁতালী গাঁয়ে শিরবেদে তোমাকে পূজা দিতেছে, স্মরণ করতেছে তার হয়েছে সংকট। নাগিনী কন্যে অবিশ্বাসিনী হয়েছে। নয়তো বলবে—কন্যের চুলে ধরেছে পাক, দাঁত হয়েছে নড়োবড়ো, এখন নতুন কন্যে চাই। মা তখন বলবেন—ভয় নাই। অভয় দিবেন সঙ্গে সঙ্গে—নাগিনী কন্যের নাগমাহাত্ম্য হরণ করে লিবেন আর ওদিকে নতুন কন্যের মধ্যে সঞ্চার করে দিবেন সেই মাহাত্ম্য; কন্যের অন্তরে অঙ্গে সেই মাহাত্ম্য ফুটে উঠবে।

পিঙলা বলে—সেবার শহরে কন্যে শবলা বললে, মা বিষহরি সূক্ষ্ম বিচার করবে। কন্যের উপর ভর হ'ল মায়ের।

মহাদেব শিরবেদে কুকুরের কামড় খেলে। সবার সামনে তার মাথা হেঁট হল। কথা বলতে পারলে না।

শবলা বললে—চল্, এই ভোরেই ভাসায় দে লায়ের সারি! কুকুর দুটার খোঁজে যদি বাবুরা বুঝতে পারে কি এটা বেদেদের কারুর কাম, তবে আর কারুর রক্ষে থাকবে না। মা গঙ্গার সোতের টানে নৌকা ছেড়ে দে, তার সঙ্গে ধর দাঁড়, পাঁচদিনের পথ একদিনে পারায়ে যাবি।

মহাদেব লায়ের ভিতর পাথর হয়ে পড়ে রইল।

—মাগো! শ্যাযে অপরাধ হইল হামরার? হামি শিরবেদে—তুর চরণের দাস, আমি যে তুমার চরণ ছাড়া ভজি নাই, তিন-সন্ধ্যা তুমারে ডাকতে কোন দিন ভুলি নাই—আমার দোষ নিলি মা জননী?

* * *

শেষ রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে বড়নগরের রানীভবানীর বাড়ী-মন্দির পড়ে রইল পিছনে—নৌকা বালুচর আজিমগঞ্জের শেঠদের সোনার নগর ছাড়িয়ে গেল, তারপর নসীপুরে ভাঙা জগৎশেঠের বাড়ী। সে সব পার হয়ে লালবাগের নবাবমহল। ওপারে খোসবাগ। হিরাঝিলের জঙ্গল। ওই—ওইখানেই রাজগোখুরা ধরেছিল শবলার ভালবাসার মানুষ!

পিঙলা বলে—যাই বল্যা থাকুক শবলা, সে তার ভালবাসার মানুষই ছিল গ কবিরাজ মশাই। ভালবাসার মানুষ, পরানের বঁধু। হোক নাগিনী কন্যে—তবু তো দেহটা মনটা তার মানুষের কন্যের। মানুষের কন্যে ছেলে বয়সে ভালবাসে তার বাপকে মাকে। লাগিনীর সন্তান হয়, ডিম ফোটে, ডেঁকা বার হয়, পুরাণে আছে—প্রবাদে আছে লাগিনী আপন সন্তানের যতটারে পায় মুখের কাছে—খেয়ে ফেলায়। বড় সাপে ছোট সাপ খায়—দেখেছ কি-না জানি না, হামরারা দেখেছি খায়। লাগিনী সেখানে নিজের সন্তান খাবে তার আর আশ্চয্যি কি গ।

সেই লাগিনী মানুষের গভ্যে জনম নেয়—মনুষ্য ধরম নিয়া, সেই ধরম সে পালন করে। মা বাপেরে ভালবাসে—তাদের না-হলে তার চলে না। তা পরেতে বাড়ে সে—বড় হয়, যৌবন আসে—তখন পরান চায় ভালবাসার মানুষ। লাগিনীর নারীধরমের কাল আসে—তার অঙ্গ থেকে কাঁঠালী চাঁপার বাস বাহির হয়, সেই বাস ছড়ায়ে পড়ে চারি পাশে। লাগ সেই গন্ধের টানে এসে হাজির হয়। দুজনে মিলন হয়, খেলা হয়, জীবধরমের অভিলাষ মেটে: লাগ-লাগিনী অভিলাষ মিটায়ে চলে যায় আপন আপন স্থানে। ভালবাসা তো নাই সেখানে। কিন্তু লাগিনী কন্যে যখন মানুষের রূপ ধরে—মানুষের মন পায়—তখন দেহের অভিলাষ মিট্‌লেই মনের তিয়াস মেটে না, মন চায় ভালবাসা। সে তো ভাল না বেসে পারে না। সেই ভালোবাসাই সে বেসেছিল ওই জোয়ান-টাকে। তারে ছুঁতে সে পারে নাই, ভয় তার তখনও ভাঙে নাই, ভাঙলে পরে সে কিছু মানত না, গাঙের ধারে রাতের আঁধারে সন্‌সনিয়ে গিয়া ঝাঁপায়ে পড়ত তার বুকে, গলাটা ধরত জড়ায়ে, লাগিনী যেমন লাগেরে পাকে পাকে জড়ায় তেমনি কর‍্যা জড়ায়ে লেগে যেত তার অঙ্গে অঙ্গে।

হিরাঝিলের ধারে এস্যা শবলা আপন লায়ে মায়ের ছামনে আবার আছড়ে পড়ল। কি করলি মা গ! তোর শাসনই যদি নিয়া এসে-ছিল রাজগোখুরা তবে হামরার বুকে কেনে ছোবল দিলে না?

* * *

নাগিনীর মতই গর্জন করে ওঠে পিঙলা। সে বলে—শবলা হামরাকে বলেছিল। বলেছিল, পিঙলা, বহিন, চিরজনমটা বুকের কথা মুখে আনতে পারলাম না, বুকটা হামরার জল্যা পুড়্যা খাক হয়ে গেল। দোষ দিব কারে? কারেও দিব না দোষ। অদেষ্ট না, ললাট না,

বিষহরিকে ন', দোষ ওই বুড়ার—আর দোষ হামরার। মুই নিজেরে নিজে ছলনা করলাম চিরজীবন। পরান ভালবাসলে, মোর সকল অঙ্গ ভালবাসলে, হামরার মন বললে—না-না-না। ও কথা বলতে নাই। ও পাপ—পাপ—মহাপাপ! মুছে ফেল্, মুছে ফেল্ বিষহরির কন্যে ও অভিলাষ তু মন থেক্যা মুছে ফেল্।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাঙা চোখ দু'টো মেলে কালো কেশের মত আঁধার রাতের দিকে চেয়ে থাকত আর ওই কথা বলত। শবলার অঙ্গে অঙ্গে তখন যেন কালো রূপের বান ডেকেছে। সে-যেন তখন বান থৈ থৈ কালিন্দী নদীর কালীদহের মত পাথার হয়ে উঠেছে, কদম তলায় কানাই নাই তবু সেথায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে উথল পাতল করে আছাড় খেয়ে পড়ছে। কন্যে যদি সত্যিই নাগিনী হয়, তবে শবলার অঙ্গ ভরে তখন চাঁপার সুবাস ফুটেছে। লোকে কইল—শবলার মাথা খারাপ হইছে।

পিঙলা গঙ্গারাম শিরবেদেকে মুখের উপর বললে—হামরার মাথা খারাপ হবে না সে তুকে বল্যা রাখলম, সে তু শুন্যা রাখ। পিঙলা কন্যে শবলা নয়। শবলা হামরাকে বলে গিয়েছে—পিঙলা, বহিন, এই কালে কালে হয়্যা আসছে নাগিনী কন্যের কপালে। মুই তুরে সকল কথা খুল্যা বলে গেলম। তু যেন হামরাদের মত পড়্যা পড়্যা মার খাস না। শিরবেদেকে ডরাস না। মুই তুকে ডরাব না।

নতুন নাগিনী কন্যা পিঙলা আর শিরবেদে গঙ্গারামের মধ্যে চির-কালের বিবাদ ঘনিয়ে উঠেছে। যা হয়েছিল শবলা আর মহাদেবের মধ্যে—তাই। মহাদেব মরেছে আজ সাত বছরের ওপর। পিঙলা নাগিনী কন্যা হয়েছিল যখন, তখন তার বয়স পনের পার হয়েছে,

ষোল পূর্ণ হয় নাই। পিঙলা এখন পূর্ণ যুবতী। কালো মেয়ে পিঙলার চোখ দুটো পিঙ্গলাভ; সে চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের স্থির। মানুষের দিকে সে নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে থাকে, পলক ফেলে না; মনে হয় একেবারে ভিতরের ভিতরে থাকে যে আঙুল-প্রমাণ আত্মা, সেই যেন চোখ দুটার দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তার তো ভয় নাই, ডরও নাই। তা ছাড়া, পিঙলার ওই চোখ দুটা অন্ধকারের মধ্যে বনবিড়ালের চোখের মত জ্বলে। যে অন্ধকারে অন্য মানুষের দৃষ্টি চলে না, পিঙলা সেই অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পায়। পিঙলার চোখের দিকে চাইলে ভয় পায় সকলে। গঙ্গারাম যে গঙ্গারাম সেও ভয় পায়। যখন এমনি স্থির-দৃষ্টিতে সে তাকায়, গঙ্গারাম তখন দু পা পিছন হটে দাঁড়ায়। পিঙলা তাতে কৌতুক বোধ করে না, তার ঠোঁট দুটো বেঁকে যায়, সে বাঁকের একদিকে ঝরে পড়ে আক্রোশ—অন্যদিকে ঝরে ঘৃণা।

গঙ্গারামও ভীষণ।

মহাদেবের মত সে ভয়ঙ্কর নয় কিন্তু সে ভীষণ। পাথরের পুরানো মন্দিরের মত কঠিন নয় কিন্তু সে কুটিল। সমস্ত সাঁতালীর বেদেরা তাকে ভয় করে ডোমন করেতের মত। মহাদেব ছিল শঙ্খচূড়—সে তেড়ে এসে ছোবলে ছোবলে ক্ষতবিক্ষত করে দিত, প্রাণটা চলে যেত সঙ্গে সঙ্গে। হার মেনে অঙ্গের বেশবাস ফেলে দিয়ে পাশ কাটিয়ে পালালে সে সেই বেশবাসকে ছিঁড়ে খুঁড়ে আক্রোশ মিটিয়ে নিরস্ত হত। ডোমন করেতের কাছে সে নিস্তারও নাই। সে অন্ধকার রাত্রের সঙ্গে তার নীলচে দেহটা মিশিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে তোমার অনুসরণ করে লুকিয়ে থাকবে। দিনের আলোতে অনুসরণ করতে যদি নাই পারে তবে আক্রোশ পোষণ করে অপেক্ষা ক'রে থাকবে। আসবে সে ঠিক খুঁজে খুঁজে। তারপর করবে দংশন। সে দংশনে নিস্তার নাই। ব্রাহ্মণেরা

বলে, খেলে ডোমনা, ডাক বাম্‌না। অর্থাৎ ডোমন করেতের দংশন যখন তখন বিষবৈদ্য ডেকো না, মিথ্যা চিকিৎসা করাতে যেয়ো না,—শ্মশানে শব নিয়ে যাবার জন্য ব্রাহ্মণ ডাক। সৎকারের আয়োজন কর।

ডোমন করেতের মতই ধীর আর বাইরে দেখতে নিরীহ গঙ্গারাম। দেহের শক্তি তার অনেকের চেয়ে কম কিন্তু সে কামরূপের বিদ্যা জানে, জাদুবিদ্যা জানে। তিরিশ বছর আগে ওই শহরে থেকেই সে মহাদেবের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে নিরুদ্দেশ হয়েছিল; দোষ মহাদেবের ছিল না, দোষ ছিল গঙ্গারামের। জোয়ান হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মতিগতি অতি মাত্রায় খারাপ হয়েছিল। শহরে এসে সে একা একা ঘুরে বেড়াত। মদ খেয়ে রাস্তায় লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে ফিরত। গলায় একটা গোখুরা সাপ জড়িয়ে বেড়াত রাস্তায় রাস্তায়। গোখুরাটাকে সে খুব বশ করেছিল। গলায় জড়ালে সেটা মালার মতই ঝুলত, মুখটা নিয়ে কখনও কাঁধে, কখনও কানের কাছে, কখনও বুকের উপর অল্প অল্প ঘুরত। এর জন্যে লোকে তাকে ভয় করত। গায়ে হাত তুলতে সাহস করত না। একদিন কিন্তু ভিড়ের মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ভিড়ের মধ্যে একজন হঠাৎ তার ঠিক সামনেই গঙ্গারামের গলায় সাপটাকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে চীৎকার করে গঙ্গারামকে ঠেলে দিতে গিয়েছিল, ভয় পেয়ে সাপটাও তাকে কামড়ে দিয়েছিল। একেবারে ঠিক বুকের মাঝখানে খানিকটা মাংস খাবলে তুলে নিয়েছিল। তারপর সে এক ভীষণ কাণ্ড। যত নির্যাতন গঙ্গারামের, তত লাঞ্ছনা সমস্ত বেদেকুলের। পুলিশ এসে বেদেদের নৌকা আটক করেছিল। মহাদেবকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল।

গঙ্গারাম অনেক বলেছিল—কিছু হবে না হুজুর, মুই বিষহরির কিরা খায়্যা বলছি উয়ার বিষ নাই। উয়ার দাঁত বিষের থলি সব মুই কেটে

তুলে দিছি। মানুষটার যদি কিছু হয় তবে দিবেন, দিবেন হামারাকে ফাঁসি।

সে গোখুরার মুখটাকে নিজের মুখের মধ্যে পুরে চক চক শব্দ তুলে চুষে দেখিয়েছিল—বিষ নাই। মুখ থেকে সাপটাকে বের করার পর সেটা গঙ্গারামকেও কয়েকটা কামড় দিয়েছিল।

মহাদেবও শপথ করে গঙ্গারামের কথা সমর্থন করেছিল। কিন্তু তবুও লাঞ্ছনা অপমান থেকে পরিত্রাণ পায় নাই। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আটক রেখেছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেও যখন লোকটির দেহে কোন বিষক্রিয়া হ'ল না, যখন ডাক্তারেরা বললেন, না আর কোন ভয় নাই। তখন পরিত্রাণ পেয়েছিল তারা। সেই নিয়ে বিবাদ হল মহাদেবের সঙ্গে। একা মহাদেব কেন, বেদেদের সকলের সঙ্গেই ঝগড়া হয়েছিল গঙ্গারামের। দারুণ প্রহার করেছিল মহাদেব। দুদিন পরেই গঙ্গারাম একটু সুস্থ হয়ে উঠেই দল ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল।

মহাদেব বলেছিল—যাক্ পাপ গেলছে, মঙ্গল হল্‌ছে। যাক্!

গঙ্গারাম গেলে মঙ্গল হবে একথায় কারুর সংশয় ছিল না, কিন্তু মহাদেবের পরে শিরবেদে হবে কে?

মহাদেব বলেছিল—মুই পুষ্যি নিব।

হঠাৎ দীর্ঘ তের-চৌদ্দ বৎসর পর গঙ্গারাম এসে হাজির হল। সে বললে কাঁউর কামিক্ষে থেকে কত ঠ্যাশে ঠ্যাশে ঘুরলম, জেহেলেও ছিলম বছর চারেক। তা পরেতে এলম বলি দেখ্যা আসি, সাঁতালীর খবরটা নিয়া আসি।

বেদেদের আসরে সে তার জাদুবিদ্যা দেখালে।

কত খেলা। বিচিত্র খেলা। জিভ কেটে জোড়া দেয়। কাঠের পাখী হুকুম শোনে, জলে ডোবে, ওঠে। পাথরের গলি থেকে পাখী বের

হয়; সে পাখীকে ঢাকা দেয়, পাখী উড়ে যায়; বাতাস থেকে মুঠো বেঁধে এনে মুঠো খোলে—টাকা বের হয়। আরও কত!

বেদেরা সম্মোহিত হয়ে গেল। সন্ধ্যায় বসে সে গল্প করত দেশ দেশান্তরের। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই শবলা আর মহাদেবের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা হয়ে গেল। মহাদেবের বুকে বিষকাঁটা বসিয়ে দিয়ে শবলা ভেসে গেল গঙ্গার বানে। গঙ্গারাম হল শিরবেদে।

পিঙলা বলে—পাপী—উ লোকটা মহাপাপী।

হেসে বলে—উয়ার দোষ কি? পুরুষ জাতটাই এমুনি। ভোলা-মহেশ্বরের কন্যে হলেন মা বিষহরি। ভোলা ভাঙড় চণ্ডীরে ঘুম পাড়ায়ে এলেন মর্ত্তধামে। বিষহরিরে দেখ্যা কামের পীড়াতে লাজ হারালেন—বললেন, কন্যে হামরার বাসনা পূর্ণ কর। মা বিষহরি তখন রোষ করে বিষ দিষ্টিতে তাকালেন পিতার পানে, শিব ঢলে পড়লেন। দোষ শুধু নাগিনী কন্যেরই নাই, শবলার নামে দোষটা দিলি কি সে শিরবেদের ধরম নিয়া—কাঁটা বুকে বিধে দিয়া পালালছে; কিন্তু দোষটা শিরবেদেরও আছে। ওই গঙ্গারাম শিরবেদেকে দেখ।

নেশায় চক্ষু লাল ক'রে গঙ্গারাম ঘুরে বেড়ায় সাঁতালীর বাড়ী বাড়ী। রসিকতা করে বেদেনীদের সঙ্গে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। গঙ্গারাম ডাকিনীবিদ্যা জানে। মানুষকে সে বান মেরে খোঁড়া করে রেখে দেয়; শুধু তাই নয়, প্রাণেও মেরে ফেলতে পারে গঙ্গারাম। ডাকিনী-সিদ্ধ গঙ্গারামের ধর্ম নাই, অধর্ম নাই। কিছু মানে না সে।

গঙ্গারাম ভয় করে শুধু পিঙলাকে।

পিঙলাও ভয় করে কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে যেন ক্ষেপে ওঠে।

ফাল্গুনের তখন শেষ। ফাল্গুনেও গঙ্গাতীরে ঘাসবনের ভিতর পলিমাটিতে বর্ষার জলের ভিজে আমেজ থাকে। পাকা ঘাস শুকিয়ে যায়, কাশ ঝাড় আগেই কেটে নিয়েছে বেদেরা। এই সময় একদিন ঘাসবন ধোঁয়াতে শুরু করে। শুকনো ঘাসে আগুন দেয় বেদেরা। শুকনো ঘাস পুড়ে যাবে, তলার মাটি আগুনের আঁচ পাবে, তারপর পাবে সূর্য্যের তাপ, সাঁতালীর বসুন্ধরা নব কলেবর ধরবেন। চৈত্রের পর বৈশাখে আসবে কাল-বৈশাখী; ঝড় জল হবে, সেই জলে মাটি ভিজবে, সঙ্গে সঙ্গে ওই পুড়িয়ে দেওয়া ঘাসের মুড়ো অর্থাৎ মূল থেকে আবার সবুজ ঘাস বের হতে আরম্ভ হবে। বর্ষা আসতে আসতে একটা ঘন চাপ-বাঁধা সবুজ বন হয়ে উঠবে। গঙ্গার জলকে রুখবে, সাঁতালী গাঁয়ের বেদেদের বাঁশ আর কাশের ঘরগুলির ছাওয়ার কাশের সংস্থান হবে।

এদিকে পৌষমাস পর্যন্ত সফর সেরে সাঁতালীতে ফিরবার পথে শীতে জরজর অঙ্গ নাগ-নাগিনীদের মুক্তি দিয়ে এসেছে; বিষহরির পুত্র-কন্যা সব, বেদের ঝাঁপিতে তাদের মৃত্যু হলে বেদের জীবনে পাপ অর্শাবে। মাঘ থেকে ফাল্গুন চৈত্র পর্যন্ত বেদেদের ঝাঁপিতে সাপ নাই। সতেজ নাগ, শীতে যাকে কাবু করতে পারবে না—তেমনি দুটো একটা থাকে। ফাল্গুনের শেষে ঘাস পুড়িয়ে দিলে আগুনের আঁচে—রোদের তাপে মাটি শুকোলে নাগেরা মাটির নীচে তাপের স্পর্শে শীতের ঘুম থেকে জেগে উঠবে। আশ্বিনের শেষ থেকে কার্তিকের শেষ পর্যন্ত নাগেরা রাত্রে খোলা মাঠে নিথর হয়ে পড়ে থাকে, বেদেরা বলে—শিশির নেয় অঙ্গে। ওই শিশির অঙ্গে নিয়ে শীত শুরু হতেই তারা মাটির নিচে কালঘুমে ঢলে পড়ে। লোকে বলে—সাপেরা 'মুদ' নেয়। এই কালঘুমই বল, আর মুদই বল, এ ভাঙে ফাল্গুন-চৈত্রে। বেদে যেখানে নাই সেখানে ঘুম ভাঙায় কাল। যেখানে বেদে আছে সেখানে

এ ঘুম ভাঙানোর ভার বেদেদের। ঘুম ভাঙানোর পর শুরু হবে নতুন ক'রে নাগ ধরে আনার পালা।

এই আগুন দেওয়ার ক্ষণ ঘোষণা করে হিজল বিলের পাখীরা। সাপেদের মৃদ নেবার কাল হলেই পাখীরা কোন দেশান্তর থেকে আকাশ ছেয়ে কলকল শব্দ তুলে এসে হাজির হয় হিজল বিলে। সকলের আগে আসে 'গগনভেরী' পাখী। আকাশে যেন নাকাড়া বাজে।

গড়ুর পাখীর বংশধর। নাগকুলের জননী আর গড়ুর পক্ষীর জননী—দুই সতীন। সৎভাইয়ের বংশে বংশে কালশত্রুতা সেই আদিকাল থেকে চলে আসছে। সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত চলবে। তাই এ মীমাংসা হয়তো দেবকুলের করে দেওয়া মীমাংসা। শীতের কয়েক মাস পৃথিবীতে অধিকার গড়ুর বংশের। তারা আকাশ ছেয়ে ভেরী বাজিয়ে এসে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, বিলে নদীতে পুকুরে; ধানভরা মাঠে ধান খাবে, তারপর ফাল্গুন যাবে, চৈত্রের প্রথমে গরমের আমেজ ভরা বাতাস আসবে দক্ষিণ দিক থেকে; মাঠের ফসল শেষ হবে; তখন তারা আবার উড়বে—গগনভেরী পাখীরা নাকাড়া বাজিয়ে চলবে আগে আগে। তখন আবার পড়বে নাগেদের কাল।

যেদিন ওই গগনভেরীরা উড়বে, উড়ে গিয়ে আর ফিরবে না, সে দিন থেকে তিনদিন পরে এই আগুন লাগানো হবে ঘাসবনে।

* * *

সাঁতালীর চরে ঘাসবনে সেই আগুন লাগানো হয়েছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে আকাশে। ঘাসের ডাঁটা আগুনের আঁচে চটপট শব্দে ফাটছে। আকাশে উড়ছে কাক ফিঙের দল। ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা মাকড় উড়ে পালাচ্ছে। পা লম্বা গঙ্গা ফড়িংয়ের দল লাফিয়ে উঠছে। আগুন চলছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। দখনে বাতাস বইতে শুরু করেছে।

বইবেই তো। গগন ভেরী পাখীরা গড়ুরের বংশধর, তারা দক্ষিণ থেকে উত্তর দেশে চলেছে—তাদের পাখসাটে পবনদেবকেও মুখ ফেরাতে হয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

বিলের ঘাটে দাঁড়িয়েছিল পিঙলা। দেহ মন তার ভাল নাই। দুনিয়া যেন বিষ হয়ে উঠেছে। সাঁতালী, বিষহরি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—সব বিষ হয়ে গিয়েছে। সে নাগিনী কন্যে—তাই বোধ হয় এত বিষ তার সহ্য হয়, অন্য কেউ হলে পাথরে মাথা ঠুকে মরত, গলায় দড়ি দিত, নয় তো কাপড়ে আগুন লাগাত।

বিলের দক্ষিণ দিকে সদ্য জল থেকে জেগে-ওঠা জমিতে চাষীরা চাষ করছে। এরপর লাগাবে বোরো ধান। আর উপরে তিল ফসলে বেগুনে রঙের ফুল দেখা দিয়েছে। বড় বড় শিমুলগাছগুলায় রাঙা শিমুল ফুল ফুটেছে। ওই ওদিকে এসেছে ঘোষেরা। মাঠান দেশে ঘাসের অভাব হয়েছে। সামনে আসছে গ্রীষ্মকাল, তারা তাদের গরু মহিষ নিয়ে এসেছে হিজলের কূলে। হিজলের কূলে ঘাসের অভাব নাই। তা ছাড়া আছে হাজারে হাজারে বাবলা গাছ। বাবলার শুঁটি বাবলার পাতা খাওয়াবে।

কিছুদিন পরেই আসবে দুঃসাহসী একদল জেলে। মাছ ধরবে হিজল বিলে। বর্ষার একটা হিজল বিল এখন জল শুকিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। আরও যাবে। তখন এই মাছ ধরার পালা। মূল পদ্মার বিল অর্থাৎ মা মনসার আটন—মাঝের বিল বাদ দিয়ে বাকী সব বিলে মাছ ধরবে।

অকস্মাৎ একটা বন্য জন্তুর চীৎকারে সে চমকে উঠল।

ওদিকে হৈ হৈ শব্দ করে উঠল বেদেরা। গুলবাঘা—হুলবাঘা!

আগুনের আঁচ, ধোঁয়ায়, গাছপাতা পোড়া গন্ধে, কোথায় কোন্

ঝোঁপে ছিল বাঘা, সে বেরিয়ে পড়েছে। কালো ছাপওয়ালা হলদে জানোয়ারটা ছুটছে। কাউকে বোধ হয় জখম করেছে। কিন্তু বাঘা আজ মরবে। সে যাবে কোথায়। পূবে গঙ্গা, উত্তরে বেদেরা, তারা ছুটে আসছে পিছনে পিছনে, দক্ষিণে মহিষের পাল নিয়ে রয়েছে ঘোষেরা সেখেনে মহিষের শিঙ, ঘোষেদের লাঠি। পশ্চিমে হিজলের জল, যাবার পথ নাই। বাঘা আজ মরবে।

পিঙলার মনের অবসাদ কেটে গেল এই উত্তেজনায়। সে হিজলের ঘাট থেকেই মাথা তুলে দেখতে লাগল। কিন্তু কই? কোথায় গেল বাঘা? এদিকের ঘাসের বন আড়াল দিয়ে গঙ্গার গর্ভে নামল না কি? পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে মাথা তুললে সে। ওই ছুটেছে বেদেরা—ওই। হৈ হৈ শব্দ করছে। উল্লাসে যেন ফেটে পড়ছে। পিঙলারও ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে যায়। কিন্তু উপায় নাই। তাকে থাকতে হবে এই হিজল বিলের বিষহরির ঘাটে। ওদিকে বনে আগুন লাগানো হয়েছে নাগিনী কন্যে এসে বসে আছে বিষহরির ঘাটে। তাকে ধ্যান করতে হবে মায়ের। মায়ের ঘুম ভাঙাতে হবে, বলতে হবে,—মাগো নাগকুলের জ্ঞাতিশত্রু—গড়ুর পক্ষীর বংশের গগন ভেরীরা—নাকাড়া বাজিয়ে উত্তরে চলে গেল; নাগেদের দখলের কাল এল। উত্তরের দক্ষিণ মুখো বাতাস—দক্ষিণ থেকে উত্তর মুখী হয়েছে; নাগ-চাঁপার গাছে কলি ধরেছে; তুমি এইবার নয়ন মেল; মা গো, তুমি জাগ।

ওদিকে বন পোড়ানো শেষ ক'রে বেদেরা আসবে; শিরবেদে থাকবে সর্বাগ্রে; এসে ঘাটের অদূরে হাত জোর ক'রে দাঁড়াবে। শির-বেদে ডাকবে—কন্যে গ—কন্যে!

হাঁটু গেড়ে হাত জোর ক'রে কন্যে বসে থাকবে ধ্যানে। উত্তর দেবে না।

আবার ডাকবে শিরবেদে। বার বার তিনবার। তারপর কন্তে সাড়া দেবে।—হাঁ গ!

—মা জাগল? ঘুম ভাঙিছে জন্নুনীর?

—হাঁ। জাগিছে মা জন্নুনী।

তখন নাকাড়া বেজে উঠবে, জয়ধ্বনি দেবে বেদেরা। পূজা হবে। হাঁস বলি হবে, বন পায়রা বলি হবে। তারপর তারা গ্রামে ফিরবে। ফিরবার আগে চর খুঁজে—বিলের কূল খুঁজে একটিও অন্তত নাগ ধরতে হবে।

বিলের ঘাটে সেই জন্যই একা এসেছে সে। কিন্তু এসে অবধি কোন প্রার্থনা—কোন ধ্যানই করে নাই। চুপ চাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ইচ্ছা হয় নাই, দেহও যেন ভাল মনে হচ্ছিল না। যেন ঘুম আসছিল। হঠাৎ এই উত্তেজনায় সে চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু উপায় নাই। যাবার তার উপায় নাই। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। বাঘা মরবে। আঃ বাঘা—তুই যদি গঙ্গারাম শিরবেদেকে জখম ক'রে তবে মরিস —তবে পিঙলা তোকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করবে। তোর মরণে বুক ভাসিয়ে কাঁদবে। তোর নখ পিতল দিয়ে বাঁধিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখবে। তোর পাঁজরার ছোট হাড়খানি নিয়ে সে সযত্নে রেখে দেবে, সৌভাগ্যের সম্পদ্ হবে সেখানি।

ওই থমকে দাঁড়িয়েছে বেদের দল। কোন দিকে বাঘা গিয়েছে—ঠাওর পাচ্ছে না। পর মুহূর্তেই তার সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল। সামনে হাত পনেরো দূরে ঘাসের জঙ্গল ঠেলে বেরিয়েছে একটা হলুদ রঙের গোল হাঁড়ির মত মুখ, তাতে দুটো নিষ্পলক—গোল চোখ—লম্বা দুটো কালো রেখার মত তারা দুটো—যেন ঝলসে উঠছে। চোখে চোখ পড়তেই—দাঁত বের করে ফ্যাঁস শব্দ করে উঠল। গুঁড়ি

মেরে দেহটাকে যথাসাধ্য খাটো ক'রে সে আত্মগোপন করে এইদিকে চলে এসেছে।

সাঁতালী গাঁয়ের চারিপাশে ঘাস বনের ফালিপথ বেয়ে বেড়ায় যে বেদের কন্যে, যার গায়ের গন্ধে ঘাসের বনে—মুখ লুকিয়ে কুণ্ডলী পাকায় বিষধর সাপ, সেই কন্যে—পিঙলা। যে কন্যেরা—জীবনে দু-চার বার বাঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে নিরাপদে গ্রামে ফিরেছে, সেই কন্যের কন্যে পিঙলা। কুমীরখালার খালে—কুমীরের মুখে প্রতিবছরই যে বেদের মেয়েদের দু-একজন যায়—সেই বেদের মেয়ে পিঙলা। পিঙলার পিসীর একটা পা নাই। কুমীরে ধরেছিল। পিঙলার পিসী গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে চীৎকার করেছিল। বেদেরা ছুটে এসে—খোঁচা মেরে, বাঁশ মেরে—কুমীরটাকে ভাগিয়েছিল। কুমীরটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল—কিন্তু একখানা পায়ের নিচের দিকটা রাখে নি। খোঁড়া পিসী তার আজও বেঁচে আছে। পিঙলার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎশিহরণ খেলে গেল কিন্তু সে বিবশ হয়ে গেল না।

ওরে বাঘা! ওরে চতুর। ওরে শঠ সয়তান! ওরে গঙ্গারাম!

দুপা, এক পা, তিন পা চার পা পিছন হটে—সে অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েই—ঝাঁপ দিয়ে পড়ল হিজলের বিলে।—জয় বিষহরি!

ঘাটে লম্বা দড়িতে বাঁধা—তাল গাছের ডোঙাটা ভাসছে খানিকটা দূরে। সাঁতরে গিয়ে সেটার উপর উঠে বসল সে। বাঘাটা উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেজ আছড়াচ্ছে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে পিঙলার দিকে। পিঙলার মুখে দাঁতগুলি ঝলকে উঠল। ইসারা করে সে ডাকলে বাঘাকে। আয়! আয়! আয়! সাঁতার তো জানিস। আয় না রে!

বাঘটা এবার বেরিয়ে এল ঘাসবন থেকে। ঘাটের মাথায় এসে

দাঁড়াল। কোলাহল ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে, চতুর বাঘা সেটুকু বুঝে নিরাপদ আশ্রয় এবং আহারের প্রত্যাশায় জেঁকে দাঁড়িয়েছে ঘাটের মাথায়। ওরে মুখ-পোড়া, তুই কি মা বিষহরির জামাই হবার সাধ করেছিস না কি? কন্যাকে নিয়ে যাবি মুখে তুলে—বনের ভিতর ঘর সংসার পাতবি? বাঘিনীর বদলে নাগিনী কন্যে? আয় না ভাই, আয় না; গলায় তোর মালা দিব—গলা জড়ায়ে চুমা খাব—আয় না? বিলের জলের তলে মা বিষহরির সাতমহলা পুরী—মোর মায়ের বাড়ী—আয় শাশুড়ীর বাড়ী যাবি। আয়!

কথাগুলি পিঙলা বাঘাটাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলছিল। একেবারে কথা কইছিল। বাঘাটা—দাঁত বের করে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করছে। হঠাৎ সেটা উপরের দিকে মুখ তুলে ডাক দিয়ে উঠল—আঁ—উ! লেজটা আছড়ালে মাটির উপর।

এবার খিল-খিল করে হেসে উঠল পিঙলা।

হিজল বিলের চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ল সে হাসি।

ওদিকে বাঘার পিছনে—ঘাসবন পুড়িয়ে আগুন এগিয়ে আসছে। বাঘা এমন নিরস্ত্র নিরীহ শিকারের সুযোগ কিছুতে পরিত্যাগ করতে পারছে না। নইলে সে পালাত। পালাত দক্ষিণ মুখে—যেদিকে ওই চাষীরা চাষ করছে; ঘোষেরা গরু মহিষের বাথান দিয়ে বসে আছে। মহিষের শিংয়ে—ঘোষেদের লাঠিতে, দাওয়ের কোপে বাঘা মরত।

সরস কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিঙলা। ডোঙার উপরে বসে সে মৃদুস্বরে গান ধরে দিলে;—ঠিক যেন বাঘটার সঙ্গে প্রেমালাপ করছে গান গেয়ে।

বঁধু তুমি—আইলা যোগীর ব্যাশে।
হায়—অবশ্যাষে!

মরণ আমার হায় গ—মরণ
লয়ন জলে ধোয়াই চরণ
সযতনে মুছায়ে দি আমার কালো ক্যাশে !
যদি আইল্যা অবশ্যাষে—হে !
হায়—হায় গ ! আইলা যোগীর ব্যাশে !
চাঁচর চুলে জট বাঁধিছো লয়ানে নাই কাজল—
অধরে নাই হাসির ছটা—চক্ষে ঝরে বাদল !

গানের স্বর তার উত্তেজনায় উঁচু হয়ে উঠল। বাতাসে জোর ধরেছে। আগুন দ্রুত আগিয়ে আসছে। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া এই দিকে আসছে এবার ; বাতাস ঘুরেছে। আগুনের সঙ্গে বাতাসের বড় ভাব। ইনি এলেই—উনি একেবারে ধেয়ে আসবেন। বাঘা পড়ল ফাঁদে ! "হায় রে বন্ধু আমার, হায়রে। এইবার ফাঁদে পড়লা !" গান থামিয়ে আবার সে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল !

বন্ধু এবার বুঝেছে।

একেবারে রাগে আগুন হয়্যা—আয়ান ঘোষ আসছে হে ! এই বারে ঠেলা সামলাও ! বাঘা এবার ফিরল—আগুন দেখে সচকিত হয়ে দ্রুত চলতে শুরু করলে—দক্ষিণ মুখে। ও দিক ছাড়া পথ নাই। কিন্তু ও পথেও—তোমার কাঁটা বন্ধু ! হায় বন্ধু !

চেঁচিয়েই কথাগুলি বলছিল পিঙলা। তার আজ মাতন লেগেছে। সেও হাতে জল কেটে—ডোঙাটাকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু হঠাৎ কি হল। বাঘটা একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে—থমকে দাঁড়াল ; দু পা পিছিয়ে গেল। সেই প্রচণ্ড চীৎকারে—তার হাত থেমে গেল, মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বাঘের হুঙ্কার সমস্ত চরটাকেই যেন চকিত করে দিলে।

আ—হায়—হায়—হায়! উল্লাসে উত্তেজনায় যেন থরোথরো কাঁপন বয়ে গেল পিঙলার সর্বদেহ মনে। সে চীৎকার করে উঠল—আ!

বাঘার সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—মস্ত এক পদ্মনাগ।

আ—! হায়—হায়—হায়, মরি—মরি—মরিরে!

ওদিকে আগুনের আঁচ পেয়ে বেরিয়েছে পদ্মনাগ। সেও পালাচ্ছিল, এও পালাচ্ছিল, হঠাৎ দুজনে পড়েছে সামনা সামনি! নাগে-বাঘে লাগল লড়াই। হায়-হায়-হায়!

সে ডোঙাটাকে নিয়ে চলল তীরের দিকে। ভাল ক'রে দেখতে হবে। মরি-মরি-মরি কি বাহারের খেলা রে! সোজা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দুলছে পদ্ম নাগ। চোখে তার স্থিরদৃষ্টি। কালো দুটি মটরের মত চোখ। তাতে কোন ভাব নাই—কিন্তু বিষমাখা তীরের মত তীক্ষ্ণ এবং সোজা। বাঘা যে দিকে ফিরবে—সে চোখও সেই দিকে ঘুরবে—তার ফণার সঙ্গে। মরি-মরি-মরি পদ্মফুলের মত চক্রটির কি বাহার! লিক্ লিক্ ক'রে চেরা জিভ মুহুর্মুহু বের হচ্ছে আগুনের শিখার মত। বাঘাও হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর। —চোখ দুটো যেন জ্বলছে—লম্বা কালো কাঠির মত তারা দুটো চওড়া হয়ে উঠেছে। গোঁফগুলো হয়ে উঠেছে খাড়া সোজা; হিংস্র দুপাটি দাঁত বের করে সে গর্জাচ্ছে; গায়ের রোঁয়া যেন ফুলছে—লেজটা আছড়ে আছড়ে পড়ছে মাটির উপর। কিন্তু তার নড়বার উপায় নাই। নড়লেই ছোবল মারবে পদ্মনাগ। নাগও নড়ছে না, সুযোগ পেলেই বাঘা মারবে তার থাবা নাগের মাথার উপর। বাঘা মধ্যে মধ্যে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে—সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে পিছিয়ে আসছে। মাটির উপর ছোবল পড়ছে নাগের। বাঘা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পড়তে চায়—নাগের উপর কিন্তু তা পারছে না, লাফ দিবার উদ্যোগ করতে করতে নাগ যেন বিদ্যুতের মত উঠে দাঁড়াচ্ছে। তখন

যদি বাঘা লাফ দেয়—তবে রক্ষা থাকবে না—একেবারে ললাটে দংশন করবে নাগ। সেটা বুঝছে বাঘা। তাই লাফ না দিয়ে ব্যর্থ ক্রোধে উঁচু দিকে মুখ তুলে চীৎকার ক'রে উঠছে।

ডোঙার উপর উঠে দাড়াল—পিঙলা।

আ—। আ—মরি মরিরে! আ—।

চারিদিকের একদিকে গঙ্গা—একদিকে বিল। আর দুদিক থেকে ছুটে এল বেদেরা, ঘোষেরা চাষীরা। বিলের দিকে—ডোঙার উপর দাঁড়িয়ে নাগিনী কন্যা পিঙলা।

গঙ্গারাম দাঁড়িয়েছে বাঘটার ঠিক ওদিকে। তারও চোখ জ্বলছে। তার হাতে শড়কি দুলছে। সে মারবে বাঘটাকে।

—না। চীৎকার ক'রে উঠল পিঙলা।

থমকে গেল গঙ্গারাম। সে তাকালে পিঙলার দিকে। বাঘটার মতই দাঁত বার করে বললে—লাগ মরবে বাঘার হাতে?

—কে কার হাতে মরে দেখ ক্যানে!

—তা পরেতে? লাগ যদি মরে—

—বাঘাকে রেখ্যা যাবে না!

—না। বিষহরির দাস হামরারা—। বলতে বলতে হাতের সড়কিটা তুলে উঠল। পিঙলা মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে। সড়কিটা সাঁ করে ডোঙাটার উপরের শূন্য লোক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল বিলের জলে। পিঙলার বুঝতে ভুল হয় নাই। বাঘাকে বিধঁবে তো—পিঙলার চোখে চোখ কেন গঙ্গারামের? পর মুহূর্তেই আর একটা সড়কি বিধঁল বাঘটাকে। গর্জন করে লাফিয়ে উঠল বাঘটা। যে মুহূর্তে সে পড়ল মাটিতে সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে এসে পদ্মনাগ তাকে মারলে

ছোবল। আহত বাঘটা থাবা তুলতে তুলতে সে এঁকেবেঁকে—তীব্র গতিতে গিয়ে পড়ল বিলের জলে। মুখ ডুবিয়ে এখন সে চলেছে সোজা তীরের মত, তার নিঃশ্বাসে পিচকারির ধারার মত জল উৎক্ষিপ্ত করে চলেছে। কিন্তু জলে রয়েছে নাগিনী কন্যা। একবুক জলে দাঁড়িয়ে—সে লক্ষ্য করছিল। ডোঙার উপর উঠে বসল সে। খপ ক'রে চেপে ধরল নাগের মাথায়। অন্য হাতে লেজে। নাগ বন্দী হল।

বেদেরা ধ্বনি দিয়ে উঠল।

গঙ্গারাম ঘাটে এসে দাঁড়াল। ডোঙাটা ঘাটে এসে লাগতেই সে বললে—ঘাটে ধেয়ান না কর‍্যা তু ডোঙায় বস্যা থাকলি? খ্যানত করলি?

পিঙলা হেসে বললে—ইটা লাগিনী গ বাবা। বাঘাটা লাগিনীর হাতে মরিছে।

চীৎকার করে উঠল গঙ্গারাম—খ্যানত ক্যানে করলি? ঘাটে বস্যা ধেয়ান না কর‍্যা—ইটা কি হইল?

পিঙলা স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। এ তার বিচিত্র দৃষ্টি। মনে হয় ওর প্রাণটাই যেন আগুনে জ্বলতে জ্বলতে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

ভাদু এবার এগিয়ে এসে বললে—ইটা তুই কি কইছিস গঙ্গারাম। বাঘের মুখে পরানটা যেত না?

পিঙলা হেসে বললে—সে ভালই হইত রে ভাদু মামা। লাগিনীর হাত হইতে বাঘটা বেঁচ্যা যেত।

তারপর বললে—লে নাকাড়া বাজা—পূজা আন। মা তো জাগিছেন রে। চাক্ষুষ পেমান তো মোর হাতেই রইছে। পদ্মলাগিনী। অরে হাবু, লে তো—সড়কিটা জলে পড়িছে—তুল্যা আন্‌ তো। দে—শির-

বেদেকে ফিরায়ে দে। আঃ—কি রকম সড়কি ছুড়িস তু শিরবেদে হয়্যা —ছি-ছি-ছি! ভাম হয়ে দাঁড়ায়ে ক্যানে গ? লে-লে পূজা আন্। বাঘাটার চামড়াটা ছাড়ায়ে লিবি তো নে। আর দাঁড়ায়ে থাকিস না। বেলা দু পহর চলে গেল। তিন পহর হয় হয়। জম্নীর ঘুম ভাঙিছে খিদা লাগে না! বাজা-গ—তুরা বাজা।

বাজতে লাগল নাকাড়া।

গঙ্গারাম যাই বলুক, বেদেপাড়ার লোক এবার খুব খুশি। এবার শিকার হয়েছে প্রচুর। খরগোশ, সজারু, তিতির অনেক পাওয়া গিয়েছে। তার উপর হাঁস বলি হবে। হিজল বিলের ধারে সাঁতালীগ্রাম, সেখানে মাংস দুর্লভ নয়। ফাঁদ পাতলেই সরালি হাস, জল মুরগি পাওয়া যায়। কাদাখোঁচা, হাঁড়িচাঁচা, শামকল দল বেঁধে বিলের ধারে ধারে লম্বা পা ফেলে ঘুরছে। বাঁটুল মেরে তীর ছুঁড়ে তাও মারা যায় অনায়াসে। কিন্তু তা বলে আজকের খাওয়ার সঙ্গে সে খাওয়ার তুলনা হয়! আজিকার এই দিনটির জন্য আজ দু-তিন মাস ধ'রে আয়োজন সংগ্রহ করছে। কাত্তিক মাসে হিজল বিলের পশ্চিমের মাঠ রবি ফসলে সবুজ হয়ে ওঠে। গম, যব, ছোলা, মসুরি, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, হরেক রকম ফসল। ফসল পাকলে বেদেরা সেই ফসল কুড়িয়ে সংগ্রহ করে, চুরি ক'রে সংগ্রহ করে। পেঁয়াজ, রসুন, মসুরি তারা সযত্নে রেখে দেয় এই দিনটির জন্য। পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা মরিচ দিয়ে পরিপাটি করে রান্না করবে মাংস; আজ খাবে পেট ভরে; কাল পরশুর জন্য বাসি ক'রে রেখে দেবে। বাসি মাংস রাঁধবে মসুরি কলাই মিশিয়ে। এমন অপরূপ খাদ্য কি হয়! কাজেই আজ শিকার বেশি হওয়ায় সকলেই খুশি। তার উপর মা বিষহরির মহিমায় নাগ মেরেছে বাঘ। বাঘের চামড়াটা ছাড়ানো হচ্ছে। ওটাকে নুন মাখিয়ে শুকিয়ে নিয়ে মায়ের থানের

আসন হবে। জয় বিষহরি! জয় পদ্মাবতী! জয় জয় বেদেকুলের জয়নী!

জয় বিষহরি গ! জয় বিষহরি গ!
সকল দুস্ক হইতে মোরা তুমার কৃপায় তরি গ!
অ—গ!

উৎসব আরম্ভ হয়ে গেল। বাজতে লাগল নাকাড়া, বিষমঢাকি। বাজতে লাগল তুমড়ী বাঁশী—চিমটের কড়া। পিঙলা বসেছে মাঝখানে—ছেড়ে দিয়েছে সদ্য ধরা পদ্মনাগিনীকে। অবশ্য এরই মধ্যে তার বিষ দাঁত ভেঙে তাকে কামিয়ে নিয়েছে। সদ্যধরা নাগিনী, বন্দিনীদশার ক্ষোভে, মুখের ক্ষতের যন্ত্রণায় অধীর হয়ে মাথা তুলে ক্রমাগত ছোবল মারছে। পিঙলার হাতের মুঠা—ঘুরিয়ে—হাঁটু দুলিয়ে—তাকে বলছে—নে—দংশা—দংশা না দেখি। ঠিক ছোবলের সময় হাঁটু হাত এমন ভাবে সরে যাচ্ছে যে, নাগিনী মুখ আছড়ে পড়ছে মাটিতে। পিঙলা—গাইছে—

নাগিনী তুই ফুঁসিস না!
ও কালামুখী নাগিনী লো—এমন কর্যা ফুসিস না
ও-দেখলে তারে পাগল হবি—তাও কি লো তুই বুঝিস না!
এমন কর্যা ফুঁসিস না!

ওদিকে গঙ্গারাম বসেছে মদের আসর পেতে। চোখ দুটো রাঙা কুঁচের মত লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে আজ গম্ভীর! অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও ভাদু সেটা লক্ষ্য করেছে। গঙ্গারামকে ভাদু ভাল চোখে দেখে না। ভাদু বেদের দেহখানা যেমন প্রকাণ্ড—সাহসও তেমনি প্রচণ্ড। সাপ ধরতে সাপ চিনতেও সে তেমনি ওস্তাদ। গঙ্গারাম ডাকিনী-সিদ্ধ—হোক ডাকিনী-সিদ্ধ—কিন্তু বিষবিদ্যায় ভাদুর

কাছে সে লাগে না। মহাদেবের কাছে সে বিদ্যাগুলি শিখে নিয়েছে পিঙলার মামা ভাদু। মা-বাপ মরা কন্যেটিকে সে-ই মানুষ করেছিল। তাকে নাগিনী কন্যারূপে আবিষ্কার প্রকৃতপক্ষে করেছিল ভাদু। শবলার সঙ্গে যখন মহাদেবের বিবাদ চরমে উঠেছিল—যখন মহাদেব মা বিষহরিকে ডাকছিল—মা গো, জননী গো, নতুন কন্যে পাঠাও। বেদেকুলের জাতধরম বাঁচাও। পুরানো কন্যের মতি মলিন হল মা, সর্বনাশীর পরানে সর্বনাশের তুফান উঠিছে। সর্বনাশ হবে। তুমি বাঁচাও। নতুন কন্যে পাঠাও।

তখন ভাদুই বলেছিল—পিঙলার পানে তাকায়ে দেখিছ ওস্তাদ? দেখো দেখি ভাল করে! কেমন কেমন লাগে যেন আমার!

—কেমন লাগে?

—ললাটে—নাগচক্র দেখবার দিষ্টি মুই কোথা পাব? তবে—ইদিকের লক্ষণ দেখ্যা যেন মনে লাগে—নতুন কন্যে আসিছে, ফুটিছে কন্যেটির অঙ্গের লক্ষণে।

এই জাগরণের দিনে—এই আগুনের আঁচে যেদিন নাগেরা ঘুম থেকে জাগে—এই দিনের উৎসবেই ভাদু পিঙলার হাত ধরে মহাদেবের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেছিল—দেখ দেখি ভাল কর‍্যা।

—হুঁ! হুঁ! হুঁ!

চীৎকার ক'রে উঠেছিল মহাদেব—জয় মা বিষহরি। নাগচক্র—নাগচক্র! কন্যের ললাটে নাগচক্র। এলেন—এলেন। নতুন কন্যে এলেন।

পিঙলা হল নতুন নাগিনী কন্যা। ভাদু হ'ল মহাদেবের ডান হাত। শবলা পিঙলাকে বলেছিল—তুর ভয় নাই পিঙলা। তুর অনিষ্ট মুই করব না। তুরে মুই সব শিখিয়ে যাব, বল্যা যাব গোপন কথা। ভাদুকে কিন্তু সাবধান। তুর মামা হলি কি হয়,—শিরবেদের

মনরেখে—তুরে নাগিনী কন্তে করে দিলে। শিরবেদের পরে উই হবে শিরবেদে! উকে সাবধান। নাগিনী কন্তে আর শিরবেদে। সাপ আর নেউল। ই বিবাদ চিরদিনের। উরে সাবধান!

গঙ্গারাম ফিরে না এলে ভাদুই হ'ত শিরবেদে। ভাদুর মন্দকপালের জন্তই গঙ্গারাম ফিরল। প্রথম প্রথম গঙ্গারাম ভাদুর কথা শুনেই চলত। কিন্তু ডাকিনী-সিদ্ধ গঙ্গারাম কিছুদিনের মধ্যেই ভাদুকে ঝেড়ে ফেলে দিলে। ভাদুও বিষবিদ্যার ওস্তাদ, সে ও তো সামান্ত জন নয়, ঝেড়ে ফেলতে গেলেই কি ফেলা যায়। সে বিদ্যার জোরে নিজের আসন রেখেছে, সেই আসনে বসে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে গঙ্গারামের উপর।

গঙ্গারাম আজ গম্ভীর, সেটা ভাদু লক্ষ্য করেছে। সে জিজ্ঞাসা করলে—কি ভাবিছ গ শিরবেদে?

—আঁ? —কি ভাবিব?

—তবে? আনন্দ কর—আনন্দের দিন। দিন গেল্যা—তো চল্যাই গেল। হাস খানিক।

—হাসিব কি? তু কইলি—খ্যানত হয় নাই কিন্তু হামরার মনে তা লিছে না। কন্যাটা খ্যানত করিছে। উটা হইছে সাক্ষাৎ পাপ।

—তবে মায়েরে ডাক। লতুন কন্তে দিবেন জননী! পাপ বিদায় হবে। নয় তো—। হাসলে ভাদু।

—হাসিলি যে? নয় তো কি, না বল্যা চুপ করলি? বল্, কথাটা শ্যাষ কর্!

কথা শেষ হবার অবকাশ হ'ল না। এসে দাঁড়াল দুজন বেদে।—লোক আসিছে গ!

—লোক?

—হঁ। লোক আসিছে ডাক নিয়া।

—ডাক নিয়া ?

অর্থাৎ আহ্বান এসেছে বিষবৈদ্যের। কোথাও নাগ-আক্রমণ হয়েছে। মানুষ শরণ মেগেছে—বিষহরির সন্তানদের। সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। এই নিয়ম।

দংশন হয়েছে বড় জমিদার-বাড়ীতে। সাঁতালী থেকে ক্রোশ তিনেক পশ্চিমে। পুরানো জমিদার বাড়ীতে গত বৎসর থেকেই নাগের উপদ্রব হয়েছে। গত বৎসর বর্ষায় সাতাশটা গোখুরার বাচ্চা বেরিয়েছিল। বাড়ীর দরজায় উঠানে আশে পাশে—ঘরের মেঝেতে পর্যন্ত। বাবুরা ডেকেছিলেন—মেটেল বেদেদের। ওখানে ক্রোশ খানেকের মধ্যেই আছে মেটেল বেদে। মেটেল বেদেরা বিষহরির সন্তান নয়। ওরা সাধারণ বেদে। ওরা জলকে এড়িয়ে চলে। মাটিতে কারবার। হাঁটা-পথে ওরা ঘুরে বেড়ায়। ওরা সাপ বিক্রী করে। ওরা চাষ করে, লাঙল ধরে। সাঁতালীর বিষবেদেদের সঙ্গে ওদের অনেক তফাৎ।

ওরা অবশ্য বলে—তফাৎ আবার কিসের ?

সাঁতালীর বেদেরা হাসে। তফাৎ কি ? নিয়ে এস মাটির সরায় জীবের তাজা রক্ত। ফেলে দাও গোখুর কি কালনাগিনীর এক ফোঁটা বিষ। কি হবে ? বিষের ফোঁটা পড়বামাত্র রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠবে, আগুনের আঁচে ফুটন্ত জলের মত। তারপর খানা খানা হয়ে ছানার মত কেটে যাবে। খানিকটা জল টলটল করবে—তার উপর ভাসবে জলের উপর তেলের মত নাগগরল। তারপর—আয়রে মেটেল বেদে! নিয়ে আয় তোর জড়ি-বুটি-শিকড়-পাথর, মন্ত্র তন্ত্র। নে—ওই জমাট বাঁধা রক্তকে কর—আবার তাজারক্ত।

নাই—নাই, সে বিছে, তোদের নাই। সে বিদ্যা আছে সাঁতালীর বিষবেদেদের। তারা পারে—তারা পারে। তাদের সাঁতালীতে এখনও আছে সাঁতালী পাহাড় থেকে আনা এক টুকরা মূলের লতা। সেই লতার রস, তাজা লতার রস ফেলে দিবে সেই জমাট বাধা রক্তে; হাঁকবে, মা বিষহরিকে স্মরণ করে তাদের মন্ত্র। দেখবি—তেলের মত সাপের বিষ মিলিয়ে যেতে থাকবে, জমাট বাঁধা রক্তের ঢেলা আর জল মিশে যাবে। মনে হবে—গলে গেল, আগুনের আঁচের ননীর মত।

ঝাঁপান খেলা দেখে যাস সাঁতালীর বিষবেদেদের। তাদের সঙ্গে তোদের তুলনা! হা—হা ক'রে হাসে বিষবেদেরা।

গতবছর সেই মেটেল বেদেদের ডাক দিয়েছিলেন বাবুরা। তারা এসে হাত চালিয়ে গুণে বলেছিল—এ উপদ্রব ঘরের নয়, বাইরের। বাড়ীর বাইরে কোথাও নাগের বংশবৃদ্ধি হয়েছে; সেই বংশের কাচ্চা বাচ্চারা বড় বাড়ীর শুকনো তকতকে মেঝেতে ঘর খুঁজতে এসেছে। তারা জড়ি দিয়ে বিষহরির পুষ্প দিয়ে মন্ত্র পড়ে বাড়ীর চারিপাশে গণ্ডি টেনে দিয়েছিল, গৃহবন্ধন করে দিয়েছিল; বাবুরাও বিলাতী ওষুদ ব্যবহার করেছিলেন; ওদিকে আশ্বিন শেষ হতেই কার্তিকে নাগেরা কালঘুমে—মুদ নিয়েছিল। এবার এই ফাল্গুন মাসেই নাগ দেখা দিয়েছেন তিন দিন। বাড়ীর পুরানো মহলে রান্নাবাড়ী ভাঁড়ার ঘর; সেই ভাঁড়ারে গিন্নী দুদিন দেখেছেন নাগকে। প্রকাণ্ড গোখুরা। আজি ভোর রাত্রে পাচক ব্রাহ্মণ উঠেছিল বাইরে; ঘর থেকে বাইরে দু পা দিতেই তাকে দংশন করেছে। মেটেল বেদেদের ডাকা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষবেদেদের কাছেও লোক এসেছে। যেতে হবে।

ভাদু উঠে দাঁড়াল। কানে নাকে হাত দিয়ে মাকে স্মরণ করে বললে—গঙ্গারাম!

—হঁ।

গঙ্গারাম জননীকে স্মরণ করে উঠেই চলে নাচ-গানের আসরে।

আজিকার দিন, কন্যাকেও সঙ্গে যেতে হবে। কন্যা নইলে মা বিষহরির পুষ্প দিয়ে গৃহবন্ধন করবে কে?

সাঁতালী গ্রামের বেদে-বেদেনীরা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এমন শুভ লক্ষণ পঞ্চাশ বছরে হয় নাই। জাগরণের দিনে এসেছে এমন বড় একটা ডাক।

নিয়ে আয় ঝাঁপিঝুলি—তাগা, শিকড়, বিশল্যকরণী, ঈশের মূল, সাঁতালী পাহাড়ের সেই লতার পাতা, পাতা যদি না দেখা দিয়ে থাকে তবে একটুকরো মূল। মূল খুঁজে না পাস, নিয়ে আয় ওখানকার খানিকটা মাটি। বিষহরি পুষ্প সঙ্গে নে, আর নে বিষপাথর। ঝাঁপি নে, খালি ঝাঁপি, আর খস্তা নিয়ে চল।

সাঁতালী পাহাড়ের মূল থেকে পাতা আজও গজায় নাই। নতুন বছরের জল না পেলে গজায় না। মূলও তার পুরানো হয়েছে। তার উপর কেটে কেটে মূলও হয়ে পড়েছে দুর্লভ।

ভাদু বললে—ওতেই হবে। মানুষটা বাঁচবে লাগছে না। ভোর রাতের কামড়—সাক্ষাৎ কালের কামড়। ওতে বাঁচে না। যদি পরানটা থাকেও এতক্ষণ, তবুও ফিরবে না। তবে জমিদার-বাড়ীর নাগ বন্দী করলে শিরোপা মিলবে।

পিঙলা বললে—তুরা যা, মুই যাব না।

—ক্যানে?

—না। অধরমের শিরোপা নিয়া মোর কাজ নাই।

—কন্যে ! গম্ভীর স্বরে শাসন ক'রে উঠল গঙ্গারাম।

সঙ্গে সঙ্গে ভাদুও যোগ দিলে—পিঙলা !

পিঙলা হাসলে বিচিত্র হাসি। বাবুদের বাড়ীর লোক দুটি পাশেই দাঁড়িয়েছিল, তারা বললে—গিন্নী-মা বারবার ক'রে বলে দিয়েছেন—ওদের কন্যেকে আসতে বলবি। বিষহরির পূজা করাব।

কি বলবে পিঙলা এদের সামনে ? কি ক'রে বলবে ?

ভাদু বললে—হোথাকে বিষ লহমায় এক যোজন ছুটছে কন্যে—নরের রক্তে নাগের বিষ পাথার হয়্যা উঠছে। সে পাথারে পরান পুতুল ডুব্যা গেলে আর শিবের সাধ্যি হবে নাই। চল্—চল্। দেরি করলে অধরম হবে।

—অধরম ? হাসলে পিঙলা।—মুই অধরম করছি ?

—হাঁ করছিস।

—তবে চল্। তোর ধরম তোর ঠাঁই। তোর ললাটও তোর ঠাঁই। মুই কিন্তুক সাবধান কর‍্যা দিছি তুকে। তু সাবধান হয়্যা লাগ বন্দী করিস।

তীর্যকদৃষ্টিতে চাইলে তার দিকে—ভাদু-গঙ্গারাম দুজনেই।

তাতেও ভয় পেলে না পিঙলা। বললে—মহিষের শিঙ দুটা বাঁকা, ইটা ইদিকে যায় তো উটা উদিকে যায়। কিন্তু কাজের বেলায়—যুঝবার বেলা—দুটার মুখই এক দিকে।

গঙ্গারাম উত্তর দিলে না। ভাদু হাসলে। বললে—কন্যের হামরাদের বড় খর দিষ্টি গ। দিষ্টিতে এড়ায় না কিছু।

—গামছাটা কোমরে ভাল কর‍্যা জড়ায়ে লে গ।

গঙ্গারাম চমকে উঠল।

ভাদু বললে—অঃ—খুব বলেছিস গ কন্যে। বেঁচ্যা থাক গ বিটী! বেঁচ্যা থাক্।

—ললাট করবার লেগ্যা? তা মুই বাঁচিব অনেক কাল। বুঝলা না মামা। বাঁচিব মুই অনেক কাল। আজ যখন সড়কিটা বাঘ না বিঁধ্যা—বাতাস বিঁধ্যা জলে পড়িছে—তখুন বাঁচিব মুই অনেক কাল।

হেসে উঠল সে।

গঙ্গারাম পিছিয়ে পড়েছিল। সে কাপড় সেঁটে, গামছা কোমরে ভাল ক'রে বেঁধে নিচ্ছিল। এগিয়ে এসে সঙ্গ নিয়ে সে বললে—কি? হাসিটা কিসের গ?

—সড়কির কথা বুলছে কন্যে।

—হুঁ। মুই ও বুঝতে লারি—কি ক'রে ফসকায়ে গেল।

—কাকে রে? বাঘটাকে না—পাপিনীটাকে?

—কি বুলছিস তু গ?

—বুলছি, চাল সিদ্ধ করলি পর ভাত হয়। এমুন আশ্চয্য কথা শুনেছিস কখুনও? সে আবার হেসে উঠল।

(তিন)

জনহীন হিজলের পশ্চিম কূল তার হাসিতে যেন শিউরে উঠল। ঘন গাছপালার মধ্য থেকে একটা কোকিল পিক্-পিক্ শব্দ করে উড়ে চলে গেল; এক ঝাঁক শালিক বসেছিল মাঠের মধ্যে, তারা কিচ কিচ্ কলরব ক'রে পাখায় ঝরঝর শব্দ তুলে উড়ল আকাশে। সে হাসি যেন পাতলা লোহার কতকগুলো ছুরি কি পাত ঝনঝনিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

গঙ্গারাম আবার তার দিকে ফিরে চাইলে। ভাদুও তাকালে আবার।

আবারও হেসে উঠল পিঙলা।

গঙ্গারাম এবার বললে—হাসিস না তুকে বলছি মুই।

ভাদু মৃদু স্বরে বললে—সাথে লোক রইছে গ কন্যে। ছিঃ! ঘরের কথা লিয়ে পরের ছামুতে—না, ইটা করিস না।

পিঙলার তখন খানিকটা পরিতৃপ্তি হয়েছে। অনেক কাল হেসে এমন সুখ সে পায় নাই। এবার তার খেয়াল হ'ল সঙ্গে বাবুদের বাড়ীর লোক রয়েছে। তাদের সামনে একথার আলোচনা সঙ্গত হবে না। মনে পড়ল মা-মনসা ও বেনেবেটীর কাহিনীর কথা। মা বেনেবেটীকে বলেছিলেন—কন্যে, সবদিক পানে চেয়ো, কেবল দক্ষিণ দিক পানে চেয়ো না। বেনেবেটীর অদৃষ্ট, আর নরেনাগে বাস হয় না, একদিন সে নাগেদের দুধ জ্বাল না দিয়ে পড়ল ঘুমিয়ে। নাগেরা গিয়েছিল বিচরণ করতে। পাহাড়-অরণ্যে সমুদ্রে-নদীতে বিচরণ করে তারা ফিরল। ফিরে তারা দুধ খায়—দুধের জন্ত এল; এসে দেখে বেনে বোন ঘুমুচ্ছে, তারা কেউ তার হাত চাটলে—কেউ গা চাটলে—কেউ পা চাটলে—কেউ ফোঁস-

ফুঁসিয়ে বললে—ও বেনেবোন, খিদে পেয়েছে, তুই ঘুমুবি কত? বেনে বেটীর ঘুম ভাঙল, লজ্জা হল, ধড়মড়িয়ে উঠে বললে—এই ভাইয়েরা, একটু সবুর কর, এখুনি দিচ্ছি। হুড়মুড়িয়ে খড় তালপাতা নিয়ে উনোন জ্বাললেন—হুড়হুড়িয়ে জ্বাল দিলেন, টগবগিয়ে দুধ ফুটল; বেনেবেটী কড়া নামালেন। তারপর হাতায় দুধ মেপে কাউকে দিলেন বাটীতে, কাউকে গেলাসে, কাউকে খোরায়, কাউকে পাথরের কটোরায়, কাউকে কিছুতে অর্থাৎ হাতের কাছে যা পেলেন তাতেই দুধ পরিবেশন করে বললেন—খাও ভাই।

আগুনের মত গরম দুধ, সে দুধে মুখ দিয়ে কারুর ঠোঁট পুড়ল, কারুর জিভ কারুর গলা কারুর বা বিষের থলি পুড়ে গেল। যন্ত্রণায় সহস্র নাগ গর্জে উঠল। তারা বললে—আজ বেনে কন্যেকে খাব।

মা-মনসার টনক নড়ল—আসন টলল, তিনি এলেন ছুটে। বললেন—থাম থাম।

—না, খাব আজ বেনে কন্যেকে। সহস্র নাগের বিষে মরুক জ্বলে—আমরা জ্বালায় মরে গেলাম।

মা বললেন—দশ দিনের সেবা মনে কর, একদিনের অপরাধ ক্ষমা কর। দশ দিন সেবা করতে গেলে একদিন ভুলচুক হয়—অপরাধ ঘটে। ক্ষমা করতে হয়।

নাগেরা ক্ষান্ত হল সেদিন, বললে—আর একদিন হলে ক্ষমা করব না কিন্তু।

মা বললেন—তার দরকার নাই বাবা। কন্যেকে স্বস্থানে রেখে এস গিয়ে। নরে নাগে বাস হয় না। আমি বলছি রেখে এস।

বেনে কন্যে মর্ত্যে স্বস্থানে আসবেন। উদ্যুগ হল, আয়োজন হল। বেনে কন্যে ভাবলেন—এই তো যাব আর তো আসব না। তা সব

দিক দেখেছি, কেবল দক্ষিণ দিক দেখি নাই। মায়ের বারণ ছিল। এবার দেখে যাই দক্ষিণ দিক।

ঘরের বন্ধ করা দক্ষিণের দুয়ার খুললেন। দেখেই শিউরে উঠলেন। মা-বিষহরি—সেই রূপে বসে আছেন—যে রূপ দেখে স্বয়ং শিব ঢলে পড়েছিলেন! নাগ-আসনে বসেছেন, নাগ-আভরণে সেজেছেন, বিষের পাথার গণ্ডূষে পান করছেন আবার উগরে দিচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে সে পাথার সহস্র গুণ বিশাল হয়ে উথলে উঠছে। সে বিষপাথারের স্পর্শ লেগে নীল আকাশ কালো হয়ে গিয়েছে, বাতাস বিষের গন্ধে ভরে উঠেছে, সে বাতাস অঙ্গে লাগলে জ্বলে যায়, নিশ্বাসে নিলে জ্ঞান হারায়। দেখেই ঢলে পড়ে গেলেন বেনে কন্যে। ওদিকে অন্তর্যামিনী মা জানতে পেরেছেন; তিনি বিষহরির বিষময়ী মূর্তি সম্বরণ করে অমৃতময়ী রূপ ধরে এসে তার গায়ে অমৃত স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—ও বেনেবেটী, কি দেখলি বল্?

—না মা, আমি কিছু দেখি নাই।

—ও বেনেবেটী, কি দেখলি বল্?

—না মা, আমি কিছু দেখি নাই।

—ও বেনেবেটী, কি দেখলি বল্?

—না মা, আমি কিছু দেখি নাই।

মা তখন প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন—তুই আমার গোপন কথা ঢাকলি স্বর্গে—তোর কথা আমি ঢাকব মর্ত্যে। গোপন কথা ঢাকতে হয়, যে ঢাকে তার মহাপুণ্য, মহাপুণ্য হবে তোর। স্বর্গে অমৃতের রাজ্য, সেখানে মা বিষ পান করেন বিষ উদ্গার করেন সে যে দেবসমাজে কলঙ্কের কথা। মায়ের যে কলঙ্ক রটত!

"মোর ঢাকলি স্বর্গে, তোর ঢাকবে মর্ত্যে।" মা বিষহরির কথা।

থাক গঙ্গারামের গোপন কথা—দশের সামনে ঢাকাই থাক। পিঙলা নীরব হল। প্রসন্ন অন্তরেই পথ চলতে লাগল।

দ্রুতপদে হাঁটছে তারা।

হিজলের পশ্চিম কূলের মাঠের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে পথ। পথে একহাঁটু ধুলা। গঙ্গার পলিমাটি—মিহি ফাগের মত নরম। ফাল্গুনের তিন পহর বেলা—উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, পায়ের তলায় ধুলো তেতে উঠেছে, বাতাসে গরমের আঁচ লেগেছে। পিঙলার সর্বদেহে যেন একটা নেশার জ্বালা ধরে যাচ্ছে। মাঠে তিল ফসলে বেগুনী রঙের ফুল ফুটেছে। একেবারে যখন চাপ হয়ে ফুল ফুটবে তখন কি শোভাই হবে! কতকগুলি ফুল তুলে সে খোঁপায় গুঁজলে।

গঙ্গারাম বললে—তিলফুল তুল্যা খোঁপায় দিলি—তিলগুনা খাটতে হবে তুকে। চৈতলক্ষীর কথা জানিস?

—জানি। তিলগুনা তো খেটেই যেছি অমনিতে, যাবার সময় তুকে দিয়া যাব গজমতি হার। চৈতলক্ষীর কথা যখন জানিস—তখন-মা-লক্ষ্মী যাবার কালে বেরাহ্মণীকে গজমতি হার দিয়া গেছিল—সে কথাও তো জানিস!

গজমতি হার—অজগর সাপ।

ব্রাহ্মণী ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীকে হতশ্রদ্ধা করতেন, অপমান করতেন, তাই লক্ষ্মী যখন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে বৈকুণ্ঠে যাবার জন্য রথে চড়ছেন, তখন ব্রাহ্মণী ছুটে এসে যখন বললে—মা, আমাকে কি দেবে দিয়ে যাও।

তখন মা হেসে বললেন—তোমার জন্য হুঁড়কো কোটরে আছে গজমতি হার।

ব্রাহ্মণী ছুটে এসে হাত পুরলেন হুঁড়কো কোটরে। সেখানে ছিল অজগর—সে তাকে দংশন করলে।

গঙ্গারাম হাসলে। সে জানে। পিঙলার মনের বিদ্বেষের কথাও সে জানে। আজ সে সত্যই তাকে লক্ষ্য ক'রেই সড়কিটা ছুঁড়েছিল। কিন্তু পিঙলা জাত-কালনাগিনী। নাগিনী মুহূর্তে অদৃশ্য হয়; 'ওই নাগিনী'—এই কথা বলে—চোখের পলক ফেল—দেখবে কই নাগিনী? —নাই নাগিনী! ব্যাধের উদ্যত বাণ তুলতে তুলতে সে মায়াবিনীর মত মিলিয়ে যায়। ঠিক তেমনি ভাবেই পিঙলা আজ ডোঙার উপর থেকে অদৃশ্য হয়েছিল। লক্ষ্য করা পর্যন্ত পিঙলা তার সড়কির ফলার ঠিক সামনে, সড়কি ছাড়লে গঙ্গারাম—ব্যাস—নাই, তখন ডোঙার উপর শূন্য, হিজল বিলের জল দুলে উঠল, পিঙলা তখন জলে পড়েছে। বাহবা দিয়েছে মনে মনে!

বাহা—বাহা—বাহা। পিঙলা চলছে—যেন হেলে দুলে চলেছে। দেখে বুকের রক্ত চল্‌কে ওঠে। গঙ্গারামের চোখে আগুন জ্বলে।

গঙ্গারাম—গঙ্গারাম। সে দুনিয়ায় কিছু মানে না। সব ভেলকিবাজি সব ঝুট। সব ঝুট! কন্যে? হি—হি ক'রে হাসতে ইচ্ছে করে গঙ্গারামের।

ভাদু পথে চলছে আর মন্ত্র পড়ছে, মধ্যে মধ্যে একটা দড়িতে গিঁঠ বাঁধছে। এখান থেকেই সে মন্ত্র পড়ে গিঁঠ দিয়ে বাঁধন দিচ্ছে, রোগীর দেহে বিষ যেন আর রক্তে রক্তে না ছড়ায়।— যেখানে রয়েছিস গরল সেইখানেই থির হয়ে দাঁড়া; এক চুল এগুলে তোকে লাগে মা-বিষহরির কিরা। নীলকণ্ঠের কণ্ঠে যেমন গরল থির হয়ে আছে—তেমুনি থির হয়ে থাক! দোহাই মহাদেবের—নীলকণ্ঠের! দোহাই আস্তিকের! মা-বিষহারির বেটার!

*　　*　　*　　*

পৃথিবীতে নাগ-নাগিনীকে বলে মায়াবী। যে ক্ষণে তারা মানুষের চোখে পড়ে, যে ক্ষণে মানুষ চঞ্চল হয়, বলে—ওই সাপ!— সেই ক্ষণেই নাগ-নাগিনী লোকচক্ষুর অগোচর হয়। মিলিয়ে তো যায় না, লুকিয়ে পড়ে। মায়ার কথা, কথার-কথা—মিলিয়ে যাবার শক্তি ওদের নাই বাবা, ওরা চতুর; যত চতুর তত ত্বরিত ওদের গতি, তাই লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু তার চাতুরী বেদের চক্ষে ছাপি থাকে না। সাপের চেয়েও বেদে চতুর, সে তার চাতুরী ধরে ফেলে। লুকিয়ে পড়েও বেদের হাত থেকে রেহাই পায় না।

পিঙলা বলে—কিন্তু বাবা, একজনের কাছে কোন চাতুরীই খাটে না। বাবা গ! ইন্দ্ররাজার হাজার চোখ—ধরমদেবের হাজার চোখ নাই, একটি চোখ, মাঝ ললাটে—সে চোখের পলক নাই, তার দৃষ্টিতে কিছু লুকানো যায় না, কোন চাতুরী খাটে না।

বারবার সেই কথা বলে পিঙলা সাবধান করে দিলে গঙ্গারামকে। —চাতুরী খেলতে যাস না।

গঙ্গারাম দাঁত বার করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে। কোমরের কাপড়টা সে সেঁটে বাঁধছিল। বললে—চুপ কর্ তু। গঙ্গারাম ভাদু দুজনেই কোমরে কাপড়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে দুটো গোখুরা। রাজ-বাড়ীতে নাগ যদি থাকে তো ভালই, একটা থাকলে তিনটে বের হবে। দুটো থাকলে চারটে বের হবে। না থাকলে—দুটো পাওয়া যাবেই। সাপ থাকে ঘরের অন্ধকার কোণে। সেখানে গর্ত দেখে গর্তটা খুঁড়বার সময়—চতুর বেদে সুকৌশলে কোমরে বাঁধা সাপ দুটোকে ছেড়ে দিয়ে ধরে আনবে, বলবে—এই দেখেন সাপ!

মোটা শিরোপা মিলবেই। পিঙলার এটা ভাল লাগল না। অথ

করবে সাঁতালীর বেদেরা? মেটেল বেদেরা করে, ইসলামী বেদেরা করে—তাদের সাজে! সে সাবধান ক'রে দিলে। কিন্তু গঙ্গারাম দাঁত বার করে, ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—চুপ কর্ তু।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে পিঙলা বল্‌লে—বেশ, তাই চুপ করলাম, তোদের ধরম তোদের ঠাঁই!

বাবুদের পাচক বামুন বাঁচে নাই। সে মরে গিয়েছিল। তারা আসবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মেটেল বেদে, ডাক্তার, অন্ত জাতের ওঝা—কেউ কিছু করতে পারে নাই।

পরের দিন সকালে সাপ ধরার পালা। বাইরে নয়—ঘরেই আছে সাপ।

প্রকাণ্ড বড় বাড়ী। পাকা ইটের গাঁথনি। চারিপাশ ঘুরে গণ্ডি দিয়ে টেনে এল। ভিতরে বাহির মহল অন্দর মহল থেকে পুরানো মহলে ঢুকলো। ওই মহলেই পাচক বামুনকে সর্পাঘাত হয়েছে।

উঠানে বসে খড়ি দিয়ে ঘরের ছক এঁকে মাটিতে হাত রেখে বসল ভাদু। হাত গিয়ে ঢুকল ভাঁড়ার ঘরে। বেদেরাও গিয়ে ঢুকল ভাঁড়ার ঘরে। অন্ধকার ঘর। বেদের নাকে একটা গন্ধ এসে ঢুকল। আছে। এই ঘরেই আছে। আলো চাই। আনুন আলো।

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিঙলা সকলের পিছনে। দেখছে সে।

গঙ্গারাম হাঁকলে,—আলো আনেন হাঁড়ি আনেন। দু-তিনটা হাঁড়ি আনেন। নাগ একটা নয় বাবা—দুটো-তিনটা। একটা পদ্মনাগ মনে লিচ্ছে। ধরব, বন্দী করব। শিরোপা লিব। আনেন।

—সবুর। হাঁক উঠল পিছন থেকে। ভারী গলায় কে হাঁকলে। চমকে উঠল পিঙলা। গঙ্গারাম ফিরে তাকালে। ভাদু চোখ তুললে। একজন জোয়ান লোক, মাথায় চুল মুখে দাড়িগোঁফ, হাতে তাবিজ, গলায় পৈতে, এসে দাঁড়াল সামনে। চোখের চাউনি দেখে পিঙলা মুহূর্তে সব বুঝতে পারলে। কেঁপে উঠল সে! কি হবে? সাঁতালীর বিষবেদে-কুলের মানমর্যাদা এই রাজবাড়ীতে উঠানের ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যেতে হবে?

মা-বিষহরি গ! বাবা মহাদেব গ! উপায় কর, মান্য বাঁচাও! যে সাঁতালীর বিষবেদের মন্ত্রের হাঁকে একদিন গর্ত থেকে নাগ বেরিয়ে এসে দণ্ড ধরে দাঁড়াত সেই সাঁতালীর বিষবেদেরা আজ চোর সেজে মাথা হেঁট ক'রে ফিরবে? মেটেল বেদেরা হাসবে, টিট্‌কারি দেবে; এতবড় রাজার বাড়ীতে নাগবন্দী দেখতে এসেছে কত লোক, মান্যগন্য মানুষ তারা, বিষবেদেদের চোর অপবাদ পথের দুপাশে ছড়াতে ছড়াতে তারা চলে যাবে। উপায় কর মা-বিষহরি!

লোকটি গম্ভীর স্বরে বললে—বেরিয়ে আয় আগে।

—আজ্ঞা?

—আগে তোদের তল্লাস করব। দেখব তোদের কাছে সাপ আছে কি না!

দু হাত উপরে তুলে দাঁড়াল গঙ্গারাম। চোখ তার জ্বলে উঠল। কোমরে তার কাপড় জড়ানো অবস্থায় বাঁধা রয়েছে সেই কালকের ধরা পদ্মনাগ। মরিয়া বেদের ইচ্ছা—কাপড় খুলে পদ্মনাগ বের করতে গিয়ে যদি নাগ ওকে কামড়ায় তো কামড়াক। ভাদুর কোমরেও আছে একটা গোখুরা। সে কোমরে হাত দিচ্ছে, খুলে দেবে ছুঁড়ে কোণের অন্ধকার দিয়ে। কিন্তু সতর্ক লোকটার চোখ নেউলের মত তীক্ষ্ণ। সে

বললে—খবরদার! দাঁড়া, উঠে দাঁড়া। দাঁড়া! সে গলার আওয়াজ কি! বুকটা যেন গুর-গুর করে কেঁপে উঠছে।

—চল্, বাইরে চল্! এত বড়—

—ঠাকুর! সামনে এসে দাঁড়াল নাগিনী কন্যা পিঙলা। সঙ্গে সঙ্গে একটানে খুলে ফেললে তার পরনের একমাত্র লাল রঙের খাটো কাপড়-খানা, পূর্ণ উলঙ্গিনী হয়ে দাঁড়াল সবার সামনে। চোখ তার জ্বলছে—সে চোখ তার নিষ্পলক। দুরন্ত ক্ষোভে উত্তেজনায় নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে, নিশ্বাসের বেগে দেহ দুলছে। বললে—দেখ ঠাকুর, দেখ! নাগ নাই, নাগিনী নাই, কিছু নাই; এই দেখ।

সমস্ত জনতা বিস্ময়ে স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল উলঙ্গিনী মেয়েটার দিকে।

পরমুহূর্তেই মেয়েটা তুলে নিলে কাপড়খানা।

কাপড় পরে গাছকোমর বেঁধে সে গঙ্গারামের হাত থেকে টেনে নিলে শাবলখানা। বললে—মুই ধরব সাপ! আনেন আলো, আনেন হাঁড়ি। থাক গ, তোরা হোথাই দাঁড়ায়ে থাক্। মুই ধরব সাপ—উদের নিয়া টানেন ক্যানে?

শাবল দিয়ে ঠুকলে সে পাকা মেঝের উপর। নিরেট জমাট ইট-চুনের মেঝে—ঠং ঠং শব্দ উঠতে লাগল। কোণে কোণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এগিয়ে চলল বেদের মেয়ে। তার পিছনে সেই লোকটি।

হাতের আলো তুলে ধ'রে পিঙলা দেখলে। লাল ধুলোর মত—ওই ওখানে কি? একেবারে ওই প্রান্তে একটা বন্ধ দরজার নীচে

জল নিকাশের নালার মুখে ? জোরে নিশ্বাস নিলে সে। ক্ষীণ একটা গন্ধ যেন আসছে। দ্রুত পদে এগিয়ে গেল। হাতের আলোটা রেখে সে সেই ঝুরো ধুলো তুলে নিয়ে শুঁকলে। মুখ ফিরিয়ে—ডাকলে সেই ঠাকুরকে।

—আসেন ঠাকুর, দেখেন !

—পেয়েছিস ?

—হাঁ। শাবল দিয়ে সে ঠুঁকলে— ! ঠং শব্দ উঠল।

—কই ? ও তো নিরেট মেঝে।

—আছে। এই দেখ ফাঁপা। সে আবার ঠুঁকলে এক কোণে। এবার শব্দটা খানিকটা অন্য রকম। আরও জোরে সে ঠুঁকলে। —দেখ !

—গর্ত কই ?

—চৌকাঠের নিচে—জল যাবার নালির ভিতর।

—খোঁড় তবে।

পাকা মেঝের উপর শাবল পড়তে লাগল।

পিছন থেকে ভাদু বললে—সবুর রে বেটী, হুঁসিয়ার মা জহুনী।

—ক্যানে ?

—দাঁড়া, মুই যাই। দেখি একবার।

—না রে বাবা, মুই তোদের নাগিনী কন্যে, ভরসা রাখ হামরার পরে। সজ্জনকে দেখায়ে দিই সাঁতালীর বিষবেদের কন্যের বাহাদুরী। কি বুলছিস তু বল্, হোথা থেকেই বল্।

ভাদু বললে—গর্তের মুখ কোথাকে ?

—দুয়ারের চৌকাঠের নালাতে, ঠিক মাঝ চৌকাঠে।

—খুঁড়ছিস কোথা ?

—ডাহিনের কোণ।

—বাঁয়ের কোণ দেখেছিস ঠুক্যা? পরখ করেছিস?

চমকে উঠল পিঙলা। তাই ত! উত্তেজনায় সে করেছে কি?

ভাদু বললে—মনে লাগছে চাতর হবে। গত বর্ষায় দেড় কুড়ি ডেঁকা বেরাল্ছে। দেখ্, ঠুক্যা দেখ্ আগে।

এবার পিঙলা বাঁয়ের কোণে শাবল ঠুকলে। হ্যাঁ। আবার ঠুকলে। হাঁ—হাঁ।

ভাদু বললে—এক কাম কর্ কন্তে।

—হাঁ, হাঁ। আর বুলতে হবে নাই গ বাবা! আগে গর্তের মুখ খুল্যা এক মুখ বন্ধ করি দিব।

—হাঁ। ভাদু সানন্দে বলে উঠল—বলিহারি মোর বিষহরির নন্দিনী, মোর বেদেকুলের কন্তে। ঠিক বলিছ মা। হ্যাঁ। তা পরেতে এক এক কর্যা খোঁড় এক এক কোণ। সাবধান, হুঁসিয়ারি করে।

শাবল পড়তে লাগল।

লাল-কাপড়ে গাছকোমর বাঁধা কালো তন্বী মেয়েটার অনাবৃত বাহু-দুটো উঠছে-নামছে আলোর ছটা ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে নামছে। ঘেমে উঠেছে কালো মেয়ে। হাঁটু গেড়ে বসেছে সে। বুকের ভিতর উত্তেজনায় থরথর করছে। মান রক্ষে করেছেন আজ বিষহরি! তার জীবন আজ ধন্য হয়েছে সে সাঁতালীর বিষবেদেকুলের মান রক্ষে করতে পেরেছে। উলঙ্গিনী হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল—তার জন্য কোন লজ্জা নাই, কোন ক্ষোভ নাই তার মনে।

মাঝখানের গর্তের মুখ খানিকটা খুললে সে। লম্বা একটা নালা চলে গেছে এদিক থেকে ওদিক। ডাইনে বসবাসের প্রশস্ত গর্ত—বাঁয়েও তাই, মধ্যে নালাটা নাগ-নাগিনীর রাজপথ। সদর-অন্দরের

রান্নাঘর। খোয়া দিয়ে ঠুকে বন্ধ ক'রে দিলে সে বাঁ দিকের মুখ। তার-পর শাবল চালালে ডাইনের গর্তের উপর। জমাট খোয়া উঠে গেল খোয়ার নীচে মাটি, তার উপর ঘা মেরে বিস্মিত হয়ে গেল পিঙলা। কোন সাড়া নাই!

আবার মারলে ঘা। কই? কোন সাড়া নাই! তা হলে ওপাশে চলে গেছে? তবু সে খুঁড়লে। প্রশস্ত মসৃণ একটি কাটা হাড়ির মত গর্ত। তাতে এক রাশি সাদা ডিম। এবার সে বাঁ দিকে মারলে শাবল।

নাঃ—আবার তার ভুল হচ্ছে। এবার সে বন্ধ করা নালার মুখ খুলে দিলে। তারপর আঘাত করলে গর্তে।

ঠং—ঠং। ঠং—ঠং। ঠং—ঠং।

গোঁ—গোঁ! গোঁ—গোঁ। গর্জন উঠতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। উত্তেজনায় নেচে উঠল বেদেনীর মন।

আঃ—মাথার চুল এসে পড়ছে মুখে।

শাবল ছেড়ে দিয়ে—চুল এলিয়ে—আবার চুল বেঁধে নিলে শক্ত করে। তারপর মারলে শাবল। শাবলটা ঢুকে গেল ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে সে সতর্ক হয়ে বসল। হাঁ এবার আয় রে আয়—নাগ-নাগিনী আয়! পিঙলা তৈরি। স্থির দৃষ্টি, উদ্যত হাত, বসল বেদেনী এক হাঁটুর উপর ভর দিয়ে; বাঁ হাতে শাবলখানা আরও একটু বসিয়ে দিলে চাপ। এবার গর্জন করে বেরিয়ে এল এক প্রকাণ্ড গোখুরা। মুহূর্তে বেদের মেয়ে ধরলে তার মাথায়।

—আ!

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা। হাঁ। দুটো, দুটোই ছিল। নাগ আর নাগিনী।

—হুঁসিয়ার বেদের মেয়ে। চেঁচিয়ে উঠল পিছনের সেই ব্রাহ্মণ

—থাম ঠাকুর। গর্জন করে উঠল বেদের কন্যে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠানে দাঁড়াল। বিচিত্র সে নারী মূর্তি। দুই হাতে দুটো সাপের মাথা ধরে আছে। সাদা সাপ দুটো তার কালো নধর কোমল হাত দুখানায় পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। তাকে পিষছে। কালো মেয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে হাঁকলে—জয় বিষহরি!

তারপর ডাকলে—ধর্ গ, খুল্যা দে—কালের পাক খুল্যা দে। শুনছিস গ!

ছুটে এল ভাদু। সে ডেকে এল—গঙ্গারাম!

তারা বিচিত্র কৌশলে ধরে পাক খুলে টেনে নিলে নাগ দুটোকে। পিঙলা এবার উঠানে পা ছড়িয়ে বসে হাঁপাতে লাগল। তারপর বললে, হাত জোড় ক'রে বললে, হামরাকে জল দিবেন এক ঘটি?

সেই ব্রাহ্মণটি এল জলের ঘটি নিয়ে। বললে—সাবাস রে কন্যে! সাবাস! কিন্তু এক ঢোকের বেশি জল খাবি না। তোকে আমি প্রসাদী কারণ দোব। কারণ খাবি। মহাদেবের প্রসাদ! ওরে কন্যে আমি নাগু ঠাকুর।

নাগু ঠাকুর! রাঢ় দেশের নাগের ওঝা নাগেশ্বর ঠাকুর! সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি! ভূমিষ্ঠ হয়ে লুটিয়ে পড়ল পিঙলা তাঁর পায়ে।

নাগু ঠাকুর তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—সাবাস, সাবাস! হাঁ—তু সাক্ষাৎ নাগিনী কন্যে!

(চার)

জয় বিষহরি! মা গ পদ্মাবতী, জয়, তোমার জয়!

অরণ্যে, পর্বতে, দরিদ্রের ভাঙাঘরে, রাত্রির অন্ধকারে তুমি গৃহস্থকে রক্ষা কর মা। বেদেকুলকে দাও পেটের অন্ন, পরনের কাপড়। সাঁতালীর বিষবেদেদের নাগিনী কন্তে বেদেকুলের ধর্মকে মাথায় ক'রে রাখ; বেদের মেয়ে অবিশ্বাসিনী—বেদের মেয়ে ছলনাময়ী—বেদের মেয়ে কালামুখী; তাদের অধর্ম তাদের পাপ বেদেকুলকে স্পর্শ করে না ওই নাগিনী কন্যার মহিমায়, ওই কন্যার পুণ্যে।

কন্যার পুণ্য অনেক। মহিমা অনেক।

ভাদু শত মুখ হয়ে উঠেছে। কন্তের অঙ্গ ছুঁয়ে বলেছে—জমুনী, হামরার চোখ খুলিছে। তুমার অঙ্গ ছুঁয়্যা—মা-বিষহরির নাম লিয়া বুলছি—হামরার চোখ খুলিছে। হাঁ, অনেক কাল পর এমন মহিমে দেখলম কন্তের। হামরার চোখ খুলিছে।

ভাদু দশের মজলিসে বর্ণনা করেছে সেই ঘটনার কথা।

বলেছে, সে স্বচক্ষে দেখেছে কন্তের মধ্যে নাগিনী রূপ। বলেছে—আবছা অন্ধকার ঘর—বাইরে কাতার বেঁধে লোক দাঁড়িয়ে, দেখতে এসেছে—সাঁতালীর বিষবেদেরা—নাগ বন্দী করবে। ঘরের মধ্যে তিনজন বেদে আর দরজার মুখে সেই মানুষটি, মাথায় রুখু কাল লম্বা চুল, মুখে গোঁফ দাড়ি, চোখে চিলের মত দৃষ্টি। সাক্ষাৎ চাঁদ সদাগরের প্রাণের বন্ধু শঙ্কর গারুড়ী। রাঢ় দেশের নাগু ঠাকুর—নাগেশ্বর ঠাকুর। সাঁতালীর বেদের বিদ্যার পরখ করতে নিজের পরিচয়

লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাকুর। তার চোখ কি এড়ানো যায়? গঙ্গারামের কোমরে জড়ানো পদ্মদাগ, ঠিক ধরেছিলেন তিনি।

ভাদু বলে, মুই ছিলম বসে, খড়ি পেতে হাত চালায়ে দেখছিলম, হামরার কোমরে সাপ—তাও ঠাকুরের দিষ্টি এড়ায়ে যাবে কোথা? মারলে হাঁক—সবুর! সে যেন গর্জে উঠল অরুণ্যের বাঘ। মনে হ'ল, মনে হ'ল আজ আর রক্ষা নাই! গেল, মান গেল, ইজ্জত গেল, দুশমনের মুখ হাসল, কালী পড়ল সাঁতালীর বেদের কালোবরণ মুখে, উপারে বুঝি কেঁন্দ্যা উঠল পিতিপুরুষেরা!

ভাদুর মনে পড়েছিল, সেই সর্বনাশের রাত্রির কথা। যে রাত্রে লোহার বাসরঘরে কালনাগিনী দংশন করেছিল লখিন্দরকে। সেদিন দেবছলনায় কালনাগিনী নিরপরাধ বেদেদের ছলনা করে তাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিল অপবাদের বোঝা। চাঁদো বেনের অভিশাপে গিয়েছিল সাঁতালী পাহাড়ের আদিকালের বাস, গিয়েছিল জাত। সেদিন দয়া করেছিলেন বিষহরি। কিন্তু আজ? আজ যে অপরাধ, মহা অপরাধ হয়ে গিয়েছে। আজ কে রক্ষা করবে? সে দিন সব গিয়েছিল কিন্তু বিষবৈদ্যের বিদ্যার মান যায় নাই। আজ যে তাও যায়?

ভাদু বলেছে, বাঘের ডাকের উত্তরে গর্জন করে উঠল যেন নাগিনী। সেদিন জাগরণের দিনে হিজল বিলের মা-বিষহরির ঘাটের উপরে যেমন দেখেছিল বাঘের সামনে উদ্যত ফণা পদ্মনাগিনীকে—যেমন শুনেছিল তাদের গর্জন, ঠিক তেমনি মনে হল। পিঙলা খুলে ফেলে দিলে তার কাল তনু অনাবৃত করে রক্তবস্ত্রখানা—দাঁড়াল পলকহীন চোখে চেয়ে; উত্তেজনায় মৃদু মৃদু দুলছিল নাগিনী কন্যা—ভাদুর মনে হল—সাঁতালীর বেদেকুলের কুলগৌরব বিপন্ন দেখে—কন্যা বসনের সঙ্গে নরদেহের

খোলসটাও ফেলে দিয়ে স্বরূপে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে ঠিক নাগলোকের নাগিনী। চোখে তার আগুন দেখেছে সে, নিশ্বাসে তার ঝড়ের শব্দ শুনেছে সে; তার অনাবৃত দেহে নারী রূপ সে দেখে নি—দেখেছে নাগিনী রূপ!

জয় বিষহরি!

আগে বিষহরির জয়ধ্বনি দিয়ে তারপর কন্যার জয়ধ্বনিতে ভরিয়ে দিলে হিজলের কূল, সাঁতালীর আকাশ। কলিকালে দেবতার মাহাত্ম্য যখন ক্ষয় হয়ে আসছে, হিজলের ঘাসবনের আড়াল দিয়েও যখন কুটিল কলির প্রবেশ-পথ রোধ করা যাচ্ছে না, তখনই একদা এমনই ভাবে কন্যার মাহাত্ম্য মহিমা প্রকাশিত হওয়ার কাহিনী শুনে সাঁতালীর মানুষেরা আশ্বাসে উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ভাদু শপথ করে বলে—সে প্রত্যক্ষ দেখেছে কন্যার নাগিনী রূপ।

পিঙলার নিজেরও মনে হয় তাই। সেই ক্ষণটির স্মৃতি তার অস্পষ্ট। অনেক ভেবে তার মনে পড়ে, চোখের দৃষ্টিতে আগুন ছুটেছিল, বুকের নিশ্বাসে বোধ হয় বিষ ঝরেছিল, সে দুলেছিল নাগিনীর মতই; ইচ্ছে হয়েছিল ছোবল দেওয়ার মতই ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করে নাগু ঠাকুরকে। তাও সে করত, নাগু ঠাকুর যদি আর এক পা এগিয়ে আসত—তবে সে বিষকাঁটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত তার উপর! মা বিষহরিকে স্মরণ ক'রে যখন কাপড়খানা খুলে ফেলে দিয়েছিল—তখন এতগুলা পুরুষকে পুরুষ বলে মনে হয় নাই তার। মনে হয়েছিল শত্রু!

সত্যিই সেদিন নাগিনীর রূপ প্রকাশ পেয়েছিল তার মধ্যে। ভাদু ভুল দেখে নাই। ঠিক দেখেছে সে। ঠিক দেখেছে!

একদিন কালনাগিনী সাঁতালী পাহাড়ের বিষ-বৈদ্যদের মায়ায় আচ্ছন্ন ক'রে বিষহরির মান রাখতে গিয়ে বৈদ্যদের অনিষ্ট করেছিল,

তারা তাকে কন্যে বলে বুকে ধরেছিল, নাগিনী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, বৈত্তদের জাতি কুল বাস সব গিয়েছিল। তারপর এতদিন যুগের পর যুগ গিয়েছে—নাগিনী বেদেদের ঘরে কন্যে হয়ে জন্ম নিয়েছে, বিষহরির পূজা করেছে, নিজের বিষে নিজে জ্বলেছে; কিন্তু অমন ক'রে কখনও বেদেকুলের মান বিপন্ন হয় নি বলেই বুঝি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে ঋণ শোধেরও সুযোগ পায় নি। এবার পেয়েছে! জয় বিষহরি কন্যের উপর তুমি দয়া কর।

হিজলের ঘাটে সকাল সন্ধ্যা পিঙলা হাত জোড় করে নতজানু হয়ে ব'সে মাকে প্রণাম করে। মধ্যে মধ্যে তার ভর হয়। মা-বিষহরি তার মাথায় ভর করেন। চোখ রাঙা হয়ে ওঠে, চুল এলিয়ে পড়ে, ঘন ঘন মাথা নাড়ে সে। বিড় বিড় ক'রে বকে।

ধূপধুনা নিয়ে ছুটে আসে সাঁতালীর বেদে-বেদেনীরা। হাত জোড় ক'রে চীৎকার ক'রে—কি হ'ল মা, আদেশ কর।

—আদেশ কর মা, আদেশ কর!

ভাদু মুখের সামনে ব'সে আদেশ শুনতে চেষ্টা করে।

গঙ্গারাম স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকে। চোখে তার প্রসন্ন বিমুগ্ধ দৃষ্টি। পিঙলার মহিমায় জটিল চরিত্র গঙ্গারাম যেন বশীভূত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে অচেতন হয়ে পড়ে পিঙলা, সে দিন বেদেকুলের শিরবেদে হিসাবে সে-ই তার শিথিল দেহ কোলে তুলে নিয়ে কন্যার ঘরে শুইয়ে দেয়। দেবতাশ্রিত অবস্থায় কন্যাকে স্পর্শ করার অধিকার সে ছাড়া আর কারও নাই। গঙ্গারামই সেবা করে, বেদেরা দরজায় বসে থাকে উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত হয়ে।

চেতনা ফিরলেই তারা জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। গর্তে খোঁচা খাওয়া সাপের মতই পিঙলা তাড়াতাড়ি উঠে বসে; অঙ্গের কাপড় সম্বৃত করে

নিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলে—যা—যা তু বাহিরে যা। গঙ্গারামকে পিঙলা সহ্য করতে পারে না। গঙ্গারামের চোখের দৃষ্টিতে অতি তীক্ষ্ণ কিছু আছে যেন; সহ্য করতে পারে না পিঙলা।

শিবরাম কবিরাজ বলেন—এই সময়েই একদিন আমি গিয়েছিলাম সাঁতালী। ওদিকে তখন আচার্য ধূর্জটি কবিরাজ মহাপ্রয়াণ করেছেন, আমি তখন রাঢ়ের এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে আয়ুর্বেদ ভবন খুলে বসেছি, সঙ্গে একটি টোলও আছে।

বলতে বলতেই বলেন—কাহিনীর প্রারম্ভেই বলি নি, এক বর্ধিষ্ণু গ্রামের জমিদার বাড়ীতে ডাকাতির কথা? সাঁতালীতে যখন প্রথম গিয়েছিলাম গুরুর সঙ্গে—নাগিনী কন্যা শবলাকে দেখেছিলাম—কালনাগিনী নিয়ে খেলা খেলতে। সেই খেলায় নাগিনীর আর ওই নাগিনী কন্যার শক্তির কৌশলের পরিচয় দিতে ডাকাতির উপমা দিয়েছিলাম। সেই গ্রামে তখন চিকিৎসা করি। গুরুই আমাকে ওখানে পরিচিত করে দিয়েছিলেন। গুরু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সূচিকাভরণ গুরুর আয়ুর্বেদ ভবন থেকেই আনতাম। গুরু চলে গেলেন, আমি প্রথম সূচিকাভরণ প্রস্তুত করব সেবার। মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও, গঙ্গার পশ্চিম তীর, রাঢ়ভূম—গঙ্গা অনেকটা দূর; এ অঞ্চলে বিষবেদেরা আসে না, আমার ঠিকানাও জানে না। মেটেল বেদের অঞ্চল এটা। মেটেল বেদেরা খাঁটি কাল নাগিনী চেনে না। সর্পজাতির মধ্যেও ওরা দুর্লভ। তাই নিজেই গেলাম সাঁতালী। স্বচক্ষে দেখলাম পিঙলাকে। দেখলাম সাঁতালীর অবস্থা।

পিঙ্গলাকে দেখলাম শীর্ণ, চোখে তার অস্বাভাবিক দীপ্তি।

সেদিনও ছিল ওদের একটা উৎসব।

ধূপে ধূনায় বলিতে নৈবেদ্যে সমারোহ। বাজনা বাজছিল—বিষমঢাকি—তুমড়ি বাঁশী—চিমটে। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি উঠছিল। সবই যেন এবার বেশি। সাঁতালীর বেদেরা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে রয়েছে। ভাদু প্রণাম করে বললে—কন্যে জাগিছেন বাবা। হামরাদের ললাট বুঝি ইবারে ফিরল। মা-বিষহরি মূর্তি ধর‍্যা কন্যারে দেখা দিবেন মোর মনে লিছে।

চুপি চুপি আবার বললে—এতদিন দেখা দিতেন গ। শুধু ওই পাপীটার লেগ্যা—ওই শিরবেদের পাপের তরে দেখা দিছেন নাই। দেখিছেন?—দেখেন হিজল পানে তাকান!

—কি?

—দেখেন ইবারে পদ্মফুলের বহর? মা পদ্মাবতীর ইসারা ইটা গ!

হিজলের বিল পদ্মলতায় সত্যসত্যই ভরে উঠেছে। সচরাচর অমন পদ্মলতার প্রাচুর্য দেখা যায় না। বৈশাখের মধ্যকাল, এরই মধ্যে দুটো-চারটে ফুল ফুটেছে, কুঁড়িও উঠেছে কয়েকটা।

—তা বাদে ইদিকে দেখেন। দেখেন ওই বাঘছালটা। পদ্মনাগিনী ইবারে বাঘ বধ করেছে জাগরণের দিনে।

শিবরাম বলেন—সাঁতালী গ্রামের নিস্তেজ আরণ্যজীবন ওইটুকুকে আশ্রয় করে আবার সতেজ হয়ে উঠেছে। বিলের পদ্মফুলের প্রাচুর্যে, নাগদংশনে বাঘটার জীবনান্ত হওয়ায়, এমন কি হিজলের ঘাসবনের সবুজ রঙের গাঢ়তায় তাদের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী আদিম আরণ্য মন স্ফূর্তি পেয়েছে, সমস্ত কিছুর মধ্যে সেই অসম্ভব সংঘটনের প্রকাশ দেখতে তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

ভাদুই এখানকার এখন বড় সর্পবিদ্যাবিশারদ। তারই উৎসাহ সব চেয়ে বেশি। গভীর বিশ্বাসে, অসম্ভব প্রত্যাশায় লোকটার সত্যই পরিবর্তন হয়েছে। সে এখন অতি প্রাচীনকালের অতি সরল অতি ভয়ঙ্কর বর্বর সাঁতালীর বেদের জীবন ফিরে পেয়েছে।

নাকে নস্য নিয়ে শিবরাম বলেন—আচার্য ধূর্জটি কবিরাজ—শুধু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই পারঙ্গম ছিলেন না। সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবন রহস্য, সব ছিল তাঁর নখদর্পণে। লোকে যে বলত—ধূর্জটি ধূর্জটি সাক্ষাৎ; সে তারা শুধু শুধু বলত না। কষ্টিপাথরে যাচাই না করে হরিদ্রাবর্ণের ধাতুমাত্রকেই স্বর্ণ বলে মানুষ কখনও গ্রহণ করে না। মানুষের মন বড় সন্দিগ্ধ বাবা। তা ছাড়া, মানুষ হয়ে আর একজন মানুষকে দেবতাখ্যা দিয়ে তার পায়ে নতি জানাতে অন্তর তার দগ্ধ হয়ে যায়। তিনি—আমার আচার্যদেব ধূর্জটি সাক্ষাৎ ধূর্জটি কবিরাজ আমাকে বলেছিলেন—শিবরাম, বেদেদের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করি কেন জান? আর আমার মমতাই বা অত গাঢ় কেন জান? ওরা হ'ল ভূতকালের মানুষ। পৃথিবীতে সৃষ্টিকাল থেকে কত মন্বন্তর হ'ল, এক একটা আপৎকাল এল, পৃথিবীতে ধর্ম বিপন্ন হ'ল, মাৎস্যন্যায়ে ভ'রে গেল, আপদ্ধর্মে বিপ্লব হয়ে গেল, এক মনুর কাল গেল, নতুন মনু এলেন, নতুন বিধান নতুন ধর্মবর্তিকা হাতে নিয়ে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, আচারে ব্যবহারে, রীতিতে-নীতিতে, পানে-ভোজনে, বাক্যে ভঙ্গিতে, পরিচ্ছদে প্রসাধনে কত পরিবর্তন হয়ে গেল। কিন্তু যারা না কি আরণ্যক তারা প্রতিবারই প্রতিটি বিপ্লবের সময়েই গভীরতর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে তাদের আরণ্য প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে

রাখলে। সেই কারণেই এরা সেই ভূতকালের মানুষই থেকে গিয়েছে। মনু বলেন, শাস্ত্র পুরাণ বলে, এদের জন্মগত অর্থাৎ ধাতু এবং রক্তের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র এবং সেইটেই এর কারণ। এই ধাতু এবং রক্তের গঠিত দেহের মধ্যে যে আত্মা বাস করেন—তিনি মানবাত্মা হলেও ওই পতিত দূষিত আবাসে বাস করার জন্যেই সেই আত্মাও পতিত এবং বিকৃত হয়ে এই ধর্মে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিকৃতিই ওদের স্বধর্ম। আবার এর মধ্যে পরমাশ্চর্য কি জান? শাস্ত্রে পুরাণে এই ধর্ম পালন করেই ওরা চরমমুক্তি লাভ করেছে এর নজীরও আছে। মহাভারতে পাবে ধর্মব্যাধ নিজের আচরণ বলে পরমতত্ত্বকে জ্ঞাত হয়েছিলেন। এক জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণকুমার তার কাছে সেই তত্ত্ব জানতে গিয়ে তাকে দেখে বিস্মিত হল। সেই আরণ্য মানুষের বর্বর জীবন, অন্ধকার ঘর চারিদিকে মৃত পশু, মাংস-মেদ-মজ্জার গন্ধ, শুষ্ক চর্মের আসন-শয্যা, কৃষ্ণবর্ণ রূঢ় মুখমণ্ডল, রক্তবর্ণ গোলাকৃতি চোখ, মুখে মদ্যগন্ধ। ব্যাধ বুঝেছিল ব্রাহ্মণকুমারের মনোভাব। সে তাকে সম্ভাষণ আবাহন করে বসিয়ে বলেছিল—এই আমার স্বধর্ম। এই স্বধর্ম পালন করেই আমি সত্যকে মস্তকে ধারণ ক'রে পরম তত্ত্ব অবগত হয়েছি। আমি যদি স্বধর্মকে পরিত্যাগ করতাম—তবে তোমাদের পরিচ্ছন্নতা সদাচরণ অনুকরণ ক'রে তাকে আয়ত্ত করতে গিয়ে সদাচরণের পরিচ্ছন্নতার শান্তিতে সুখেই আমি তৃপ্ত হয়ে তত্ত্ব আয়ত্তের সাধনায় ক্ষান্ত হতাম। এই আচরণের মধ্যেই আমাদের জীবনের স্ফূর্তি। এর মধ্যেই আমাদের মুক্তি।

আচার্য চিন্তাকুল নেত্রে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন কিছুক্ষণ। যেন ওই অনন্ত আকাশ-পটের নীলাভ অনুরঞ্জনের মধ্যে তার চিন্তার অভিধান অদৃশ্য অক্ষরে লিখিত আছে। তিনি তাই পাঠ করছেন।

পাঠ করতে করতেই বলতেন—ওদের মধ্যে ভাল মানুষ অনেক আছে কিন্তু শুচিতা ওদের ধর্ম নয়। ওতে ওদের দেহ-আত্মা পীড়িত হয় না। আমাদের হয়। তাই সাবধান করি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে ওই অভিধান পাঠ করে নিজের অস্পষ্ট চিন্তার অন্বয় করে অর্থ জ্ঞাত হয়ে বলতেন—তবে আমার উপলব্ধির কথা আমি বলি শোন। ধর্মব্যাধের কথা মিথ্যা নয়। এই বিশ্বরহস্যের মধ্যে জীবনের ওই আচার-আচরণই বল আর আমাদের এই আচরণই বল—দুয়ের মধ্যে আসল জীবন-মূল্যের পার্থক্য সত্যই নাই। জীবনের পক্ষে আচার-আচরণের প্রাথমিক মূল্য আয়ু এবং স্বাস্থ্য এই দুয়ের পরিমাণ নির্ণয়ে। তার পরের মূল্য বুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিকাশের আনুকূল্যে। প্রথম মূল্য ওরা পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছে ওই ধর্মে। দ্বিতীয়টা পায়নি। কিন্তু শাস্ত্র যে বলে ওদের ওই পতিত এবং দূষিত ধাতু ও শোণিতে গঠিত দেহবাসী আত্মার পক্ষে এই দ্বিতীয়টা অনধিগম্য, এটাতে ওদের অধিকারও নেই, এবং অনধিকারচর্চায় ওদের অনিষ্ট হবে, এইটি, আমার জীবনবোধিতে, আমি যতদূর বুঝেছি শিবরাম, তাতে এ ধারণা ভ্রান্ত অসত্য। আমি আজীবন চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করলাম, বহু আচারের বহু ধর্মের মানুষের চিকিৎসা করলাম, বহু পরীক্ষায় বহু বিচার ক'রে এই সিদ্ধান্তেই পৌচেছি যে, ধাতু বা শোণিত রোগদূষিত যদি না হয় তবে—ওদের জীবনধর্ম থেকে আমাদের জীবনধর্মে আসতে বাধা বিশেষ নাই। যেটুকু বাধা সে নগণ্য। অতি নগণ্য।

হেসে বলতেন—আমাদের বরং ওদের ধর্মে যেতে গেলে বাধা বেশি। খানিকটা মারাত্মকও বটে। ময়লা চীরখণ্ড কোমরে পরতে লজ্জার বাধা যদি বা জয় করা যায়—তবে চর্মরোগের আক্রমণ হবে অসহনীয়।

তার উপর খাদ্যের দিক—স্বাদের কথা বাদ দিয়ে উদরাময়ের ভয় আছে। সেটা অসহনীয় থেকেও গুরুতর মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। শীতাতপের প্রভাব আছে। সেও সহনীয় করে তোলা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু ওরা জামা-কাপড় প'রে—গ্রীষ্মকালে কথঞ্চিৎ কাতরতা অনুভব করলেও শীতে বেশ আরামই অনুভব করবে। আসল কথা—ওরা আসেনি, আসতে চায়নি। সে যে কারণেই হোক। হয়তো আমাদের জটিল জীবনাচরণের প্রতি ওদের ভীতি আছে; সংস্কারের ভীতি; জটিলতার ভীতি; আমরা যে আচরণ করি তার ভীতি। আমরা কেউ আহ্বান করি নি, আমরা দূরে থেকেছি, রেখেছি ঘৃণা করে। ওদের নাড়ী ওদের দেহ-লক্ষণবিচার করে কোন পার্থক্য তো পাই নি! ধাতু এবং শোণিত যদি বিশ্লেষণ পরীক্ষার উপায় জানতাম—তবে এটা আমি সপ্রমাণ করতাম। বলে আবার চেয়ে থাকতেন আকাশের দিকে।

ভাদুকে দেখে গুরুর কথাই সেদিন মনে পড়েছিল।

ভূতকালের মানুষ, ভূতকালের মানসিক পরিবেশের পুনরুজ্জীবনে নতুন বল পেয়েছে, অভিনব স্ফূর্তি পেয়েছে; কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি যেন অমাবস্যার নাগাল পেয়েছে। গোটা গ্রামখানির মানুষের জীবনে এ স্ফূর্তি এসেছে। বেশভূষায় আচারে অনুষ্ঠানে তার পরিচয় সাঁতালীতে প্রবেশ করা মাত্রই শিবরামের চোখে পড়ল।

ভাদুর চকচকে কালো বিশাল দেহখানি ধূসর হয়ে উঠেছে। এ কালে ওরা তেল ব্যবহার করত, ভাদু তেলমাখা ছেড়েছে। রুক্ষ কালো ঝাঁকড়া চুলের জটা বেঁধেছে তার উপর বেঁধেছে একটুকরো ছেঁড়া

গামছা। আগে নাকি এই গামছা বাঁধার প্রচলন ছিল। গলায় হাতে মালা-তাবিজ-তাগার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ ক'রে তুলেছে। গায়ের গন্ধ উগ্রতর হয়ে উঠেছে। মদ্যপান বেড়েছে। গোটা সাঁতালীর বেদেরা গিরিমাটিতে কাপড় ছুপিয়ে গেরুয়া পরতে শুরু করেছে।

পিঙ্গলা যেন তপঃশীর্ণা শবরী। শীর্ণ দেহ, এলায়িত কালো তৈলহীন বিশৃঙ্খল একরাশি চুল ফুলে ফেঁপে তার বিশীর্ণ মুখখানা ঘিরে ফেলেছে, চোখে অস্বাভাবিক দ্যুতি, সর্বঅবয়ব ঘিরে একটা যেন উদাসীনতা।

ভাদু তাকে দেখিয়ে বললে—দেখেন কেনে কন্যের রূপ। সেই পিঙলা কি হইছে দেখেন।

চুপিচুপি বললে।

শিবরাম বলেন—গুরুর কথাই মনের মধ্যে ঘুরছিল। পিঙলাকে দেখে একটা কথা মনে পড়ে গেল। গুরু বলেছিলেন—শিবরাম, একই দেশের জল বায়ুতে আমাদের বাস, একই রোগে একই উপসর্গ-লক্ষণ ওদের দেহেও প্রকাশ পায়, আমাদের দেহেও পায়। রোগভোগে কিছু পার্থক্য আছে—সেটা সহনশীলতার পার্থক্যে। এমন কি, মানসিক গতিও এক। আমি দেখেছি।

শিবরাম স্থির দৃষ্টিতে পিঙ্গলার দিকে চেয়ে রইলেন। ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্য তিনি—তাঁর বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, পিঙ্গলার এ লক্ষণগুলি কোন দৈব প্রভাব বা দেবভাবের লক্ষণ নয়। এগুলি নিশ্চিতরূপে ব্যাধির লক্ষণ। মূর্ছা রোগের লক্ষণ। ব্যাধি আক্রমণ করেছে মেয়েটিকে।

পিঙ্গলা তাঁকে দেখে ঈষৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে যেন জীবন-চাঞ্চল্যে সচেতন হয়ে উঠল। হেসে বললে—আসেন গ, ধন্বন্তরি ঠাকুর। বসেন। দে গ, বসতে দে।

একটা কাঠের চৌকি পেতে দিলে একজন বেদে। শিবরাম বসলেন।

পিঙ্গলা বললে—শবলা দিদির কচি-ধন্বন্তরি তুমি—তুমি হামরার ধন্বন্তরি ঠাকুর। কালনাগিনীর তরে আসিছেন?

—হ্যাঁ। না এসে উপায় কি? গুরু দেহ রেখেছেন—

—আঃ—হায় হায় হায় গ! হামরাদের বাপের বাড়া ছিল গ! আঃ—আঃ—আঃ!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করা যায় না এর উত্তরে। শিবরামের চোখে জল এল, মন উদাস হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ ক'রে শিবরাম বললেন—এতদিন সূচিকা-ভরণ গুরুর কাছ থেকেই নিয়ে যেতাম। এবার নিজেই তৈরি করব। সেইজন্য এসেছি। কালনাগিনীর খাঁটি জাত তোমরা ছাড়া কারুর কাছে পাব না বলেই আমি এসেছি।

পিঙলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আর হয়তো পাবে না ধন্বন্তরি ঠাকুর। আসল হয় তো আর মিলবে না।

—মিলবে না? কেন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন শিবরাম।

—বিষহরির ইসারা এসেছে—আদেশ এখুনও আসে নাই, তবে আসবেক, দেরি নাই তার—কালনাগিনীকে নাগলোকে ফিরতে হবেক। বুঝিছ?

কথাটা ঠিক বুঝলেন না শিবরাম। মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, সবিস্ময় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতেই পিঙলার মুখের দিকে তাকালেন।

প্রশ্ন বুঝতে পারলে পিঙলা; তার প্রখর দৃষ্টি চোখ দুটি প্রখরতর হয়ে উঠল, যেন জ্বলন্ত অঙ্গার গর্ভ চুল্লীতে বাতাস লাগল; সে বললে—তুমি শুন নাই? মুই ঋণ শোধ করেছি। ইবারে বিষহরির হুকুম

আসিবে। বিষহরি—মনে লাগছে—বিধেতা পুরুষের দরবারে হিসাব খতায়ে দেখিছেন, তাঁরে বলিছেন—দেনা তো শোধ করিছে কন্যে, ইবারে মুই কন্যেরে ফির‍্যা আসতি হুকুম দিতে পারি কিনা কও? বিধেতার মত না নিয়া তো তিনি হুকুম দিবেন না!

শিবরাম বললেন—দেখি তোর হাতটা দেখি দে।

—হাত? কি দেখিবে?

—আমি হাত দেখে গুণে বলতে পারি যে!

—পার? দেখ—তবে দেখ।

প্রসারিত ক'রে ধরলে তার করতল। হাতের রেখা পরীক্ষা ক'রে দেখবার ছল করে তিনি তার মনিবন্ধ নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তার নাড়ী পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্পন্দনের গতি এবং প্রকৃতি নির্ণয় করতে চেষ্টা করলেন।

—কি দেখিছ গ ধন্বন্তরি ঠাকুর? ইবারে মুক্তি মিলিবে?

উত্তর দিলেন না। সে অবকাশই ছিল না তাঁর। নাড়ীর গতি প্রকৃতি এবং অবস্থা বিচিত্র। উপবাসে দুর্বল—কিন্তু বায়ুর প্রকোপে চলছে যেন বল্গা-ছেঁড়া উদ্দামগতি উদভ্রান্ত ঘোড়ার মত। মুখের দিকে চাইলেন। চোখের প্রখর শুভ্রচ্ছদ আচ্ছন্ন ক'রে অতি সূক্ষ্ম শিরাজালগুলি রক্তাভ হয়ে ফুটে উঠেছে। মূর্চ্ছা রোগের অধিষ্ঠান তিনি অনুভব করতে পারলেন।

হতভাগিনী পিঙ্গলা! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

—ধন্বন্তরি! কি দেখিলে কও? ব্যগ্র হয়ে সে তাকিয়ে রইল শিবরামের মুখের দিকে। —এমন কর‍্যা তুমি নিশ্বাস ফেললা কেনে গ?

শিবরাম ভাবছিলেন—হতভাগিনী উন্মাদ পাগল হয়ে উঠবে, ওদিকে নতুন নাগিনী কন্যার আবির্ভাব হবে, দেবতা-অপবাদে স্বজন পরিত্যক্ত

উন্মাদিনীর দুর্দশার কি আর অন্ত থাকবে? অথচ সহজে তো মৃত্যু হবে না। এই তো ওর বয়স! কত হবে? বড় জোর পঁচিশ! জীবন যে অনেক দীর্ঘ!

আবার পিঙ্গলা প্রশ্ন করলে—মুক্তি হবে না? লিখনে নাই?

এবার শিবরাম বললেন—দেরি আছে পিঙ্গলা।

—দেরি আছে?

—হ্যাঁ। একটু ভেবে নিয়ে বললেন—মা তো তোকে নিয়ে যেতে চান কিন্তু নিয়ে যাবেন কি ক'রে? তোর দেহে যে বায়ুর প্রকোপ হয়েছে। দেবলোকে কি রোগ নিয়ে কেউ যেতে পারে?

স্থির দৃষ্টিতে কবিরাজের মুখের দিকে সে চেয়ে বসে রইল। মনে মনে খতিয়ে দেখছে সে কথাগুলি। কয়েক মুহূর্ত পরে তার দুই চোখ বেয়ে নেমে এল অনর্গল অশ্রুর ধারা। তারপর—মা ব'লে একটা করুণ ডাক ছেড়ে ঢলে প'ড়ে গেল মাটির উপর। একটা নিদারুণ যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গে আক্ষেপ বেয়ে যেতে লাগল। পৃথিবীর মাটি যেন তার হারিয়ে যাচ্ছে, দু হাতে খামচে মাটির বুক সে আঁকড়ে ধরতে চায়;—মুখ ঘষতে লাগল—, নিদারুণ আতঙ্কে যেন মা ধরিত্রীর বুকে মুখ লুকোতে চাচ্ছে।

ওদিকে বেদেরা কোলাহল ক'রে উঠল।

—ধূপ আন্ ধূনা আন্, বিষম ঢাকি বাজা।

শিবরাম বললেন—থাম্ তোরা থাম্। কন্যার রোগ হয়েছে।

ভাদু উগ্র হয়ে উঠল মুহূর্তে। —কি কইলা? যা জান না কবিরাজ তা নিয়া কথা বলিয়ো না। খবর দার! মায়ের ভর হইছে! যাও, তুমি যাও। কন্যেরে ছুঁয়ো না এখুন। যাও।

গঙ্গারাম নীরবে বসে সব দেখলে। কবিরাজের দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলতেই সে একটু হাসলে। আশ্চর্য হয়ে গেলেন শিবরাম, গঙ্গারাম

সমস্ত বেদেদের মধ্যে স্বতন্ত্র পৃথক হ'য়ে রয়েছে। এ সবের কোন প্রভাব তাকে স্পর্শ করে নাই।

শিবরাম উঠে এলেন।

* * *

শিবরাম দাঁড়িয়েছিলেন হিজলবিলের ঘাটে।

ভাদু তাঁকে ভরসা দিয়েছে। বলেছে কণ্ঠে বলিছে বটে কালনাগিনীরা চলি গেল নাগলোকে—মায়ের ঘরে স্বস্থানে; সিটা বেশি বলিছে। আর দেনা শোধ হ'ল—জন্থনীর আদেশ আসিবে বলিছে, হামরাও ধেয়াইছির কি—তবে হামরাদের সেই জাত ফির‍্যা দাও, মান্যি ফির‍্যা দাও, সাঁতালী পাহাড়ের বাস ফির‍্যা দাও! বিধেতার হিসেব সূক্ষ্ম হিসেব কবিরাজ, বিধেতা কি কর‍্যা বিষহরিকে বলিবে কি হাঁ—ঋণটা শোধ বোধ হইছে! তবে হাঁ—বিষহরি দরবার জানাইছেন বিধেতার কাছে—ইহা হতি পারে।

শিবরাম চুপ করে শোনেন—কি উত্তর দেবেন এ সব কথার।

অরণ্যের মানুষ অরণ্যের ভাষা বুঝতে পারে, তাদের বিশ্বাস—তাদের সংস্কার সম্পর্কে ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্যের অবিশ্বাস নাই। কিন্তু ভ্রম সংসারে আছে। পিঙ্গলার অবস্থা সম্পর্কে ওদের যে ভ্রম হয়েছে—এতে তাঁর একবিন্দু সন্দেহ নাই। অরণ্যের মানুষ পত্রপল্লবের মর্মরধ্বনি শুনে—তাদের শিহরণ দেখে মেঘ-ঝড়ের সম্ভাবনা বুঝতে পারে, আবার পত্রপল্লবের অন্তরাল থেকে মানুষ কথা বললে দৈববাণী বলে ভ্রম করে সহজেই।

অন্তরে অন্তরে বেদনা অনুভব করছেন শিবরাম। শবলার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সূত্রে তার পরবর্তিনী পিঙ্গলাও তাঁর স্নেহভাগিনী হয়ে উঠেছে। শবলার একটা কথা তাঁর মনে অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর সঙ্গে

ভাই-বোন সম্পর্ক পাতাবার সময় সে মনসার উপাখ্যানের বেনেবেটীর কথা বলে বলেছিল, নরে নাগে বাস হয় না, নর নাগের বন্ধু নয়, নাগ নরের বন্ধু নয়। কিন্তু বেনেবেটি ভাই বলে ভালবেসেছিল দুটি নাগ-শিশুকে। তারাও তাকে দিদি বলে চিরদিন তার সকল সুখের সকল দুখের ভাগ নিয়েছিল। ঐ কালে, হেসে শবলা বলেছিল—এ কালে তুমি ভাই, মুই বহিন—তুমি কচি ধন্বন্তরি, মুই বেদে কুলের সব্বনাশী নাগিনী কন্যে; কালনাগিনী কন্যের রূপ ধরে রইছি গ—লইলে—দেখতে হামরার ফণার দোলন, শুনতে হামরার গর্জন! হুঁ! বলে—তাঁর দিকে কটাক্ষ হেনে হেসেছিল। একটু হাসলেন শিবরাম। বিচিত্র জাত! অরণ্যের রীতি আর নগরের রীতি তো এক নয়।

ভাই-বোন, বাপ-বেটী—যে-কোন সম্পর্ক হোক, নর আর নারী সম্পর্কের সেই আদিম ব্যাখ্যাটাই অসংকোচ প্রকাশে সহজ ছন্দে এখানে নিজেদের সমাজ-শৃঙ্খলাকে মেনেও আত্মপ্রকাশ করে। হাস্য পরিহাসে—সরস কৌতুকে পাতানো ভাইয়ের প্রতি কটাক্ষ হেনেছিল শবলা—তাতে আর আশ্চর্য কি!

শবলা মহাদেবকে হত্যা করে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—সে আজ আট-দশ বছর হয়ে গেল। শবলার পর পিঙলা নাগিনী কন্যা হয়েছে। শবলা পিঙলাকে তার জীবনের সকল কথাই বলে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার ধন্বন্তরি ভাইয়ের কথাও বলে গিয়েছে। বলে গিয়েছে—হামরার ভাই তো নয়, সে হইল নাগিনী কন্যের ভাই। তু তার চরণের ধুলা লিস, তারে ভাই বলিস।

পিঙলাও তাই বলে। শিবরামও তাকে স্নেহ করেন। ঠিক সেই কারণেই—এই তেজস্বিনী আবেগময়ী মেয়েটিকে এমন বেদনাদায়ক পীড়ায় পীড়িত দেখে অন্তরে অন্তরে বিষণ্ণতা অনুভব না করে পারলেন

না। ভাদু তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে, আসল কৃষ্ণ সর্পিনী ধরে দেবেই। অন্যথায় তিনি চলে যেতেন। হাঙরমুখীর খালে নৌকা বেঁধে তিনি ভাদুর প্রতীক্ষা করে রয়েছেন।

জ্যৈষ্ঠের প্রথম। অপরাহ্ণ বেলা। হিজলবিলের কালো জল ধীরে ধীরে যেন একটা রহস্যে ঘনায়িত হয়ে উঠছে। কালো জল—ক্রমশ ঘন কৃষ্ণ হয়ে আসছে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য একখানা কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে। পশ্চিম দিক থেকে ছায়া ছুটে চলেছে পূর্বদিকে, হিজলবিল ঢেকে, ঘাসবনের কোমল সবুজে গাঢ়তা মাখিয়ে দিয়ে, গঙ্গার বালুচরের বালুরাশির জ্বালা জুড়িয়ে, গঙ্গার শান্ত জলধারায় অবগাহন ক'রে—ও পারের শস্যক্ষেত্র গ্রামবনশোভার মাথা পার হয়ে চলে গেল। শিবরামের কল্পনানেত্রের দৃষ্টিতে যে ছায়া বিস্তীর্ণ প্রসারিত হয়ে চলেছে—বহু দূর—দূরান্তরে। দেশ থেকে দেশান্তরে।

ছায়া নেমেছে কিন্তু শীতলতা আসে নাই এখনও। রৌদ্রের জ্বালাটা মুছে গিয়েছে কিন্তু উত্তাপ গাঢ় হয়ে উঠেছে। মাটির নীচে গরম এইবার অসহ্য হয়ে উঠবে। এইবার হিজলের সজল তটভূমি হয়ে উঠবে সর্পসঙ্কুল। সাপেরা বেরিয়ে পড়বে। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়েছিলেন হিজলের জলজ পুষ্পশোভার দিকে। চারিপাশে সবুজের খের, মাঝখানে কালো জল; কলমি-সুষনে-পানাড়ি, শালুক পদ্মদামের সবুজ সমারোহ নবীনতার কোমল লাবণ্যে মরকতের মত নয়নাভিরাম। তারই মাঝখানে হিজলের জল যেন সুমসৃণ চিক্কণ একখানি নীলা। এই শোভাতেই তিনি তন্ময় হয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি কীট দংশনে বিচলিত হয়ে দৃষ্টি ফেরালেন। দেখলেন তার পায়ের কাছেই লাল পিঁপড়ার সারি চলেছে, একটু দূরে একটা গর্ত থেকে তারা পিলপিল্ করে বেরিয়ে পড়ছে।

হেসে একটু সরে দাঁড়ালেন তিনি। এদেরও বিষ আছে। মানুষের বিষ বোধ হয় দেহকোষ থেকে নির্বাসিত হয়ে মনকোষে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সাপের চেয়েও মানুষ কুটিল।

—ধন্বন্তরি ভাই!

চমকে ফিরে তাকালেন শিবরাম। কাঁধে গামছা নিয়ে ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়েছিল পিঙলা। একটি অতিক্লান্ত স্নিগ্ধ হাস্যরেখায় তার বিশীর্ণ মুখখানি ঈষৎ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কোমল স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে:

—জহুনীর দরবারের শোভা দেখিছ? এমনভাবে সে কথাগুলি বললে যে, শিবরাম যেন তার কোন স্নেহাস্পদ বয়োকনিষ্ঠ; তিনি লুব্ধ হয়েছেন এই মনোহারী সজ্জায়; আর এই সমস্ত কিছুর সে অধিকারিণী, বয়োজ্যেষ্ঠা, তাঁর মুগ্ধতা এবং লুব্ধতা দেখে প্রশ্ন করছে—দেখছ এই অপরূপ শোভা? ভালো লেগেছে তোমার? কি নেবে বল তো?

শিবরাম বললেন—হ্যাঁ। এবার হিজল সেজেছে বড় ভাল। তুমি স্নান করবে?

—হঁা। স্নান করব। আপন বিষে মুই জল্যা মরলাম ধন্বন্তরি ভাই! অঙ্গে যত জ্বালা মাথায় মনে তত জ্বালা। জান, শবলা কইছিল—নাগিনী কন্যা মিছা কথা, কন্যে আবার নাগিনী হয়! কই, বোঝলম না তো কিছু! কিন্তুক—

একটু চুপ ক'রে থেকে সে মৃদু ঘাড় নাড়লে। কিছু অস্বীকার করলে। অস্বীকার করলে শবলার কথা; মৃদুস্বরে বললে—মুই বোঝলম যে। পরানে-পরানে বোঝলম। চোখ মুদলি দেখি মুই, মোর আত্মারাম—এই ফণা বিছায়ে দুলছে; দুলছে; দুলছে। লকলক করিছে জিভ, ধ্বক ধ্বক করিছে চোখ দুটা, আর গর্জাইছে।

শিবরাম চিকিৎসকের গাম্ভীর্যে গম্ভীর হয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন—

তোমার অসুখ করেছে পিঙলা। তুমি নিজের দেহের একটু শুশ্রূষা কর। ওষুধ খাও। স্নান কর দু বেলা—ভালোই কর, কিন্তু এমন রুখু স্নান না ক'রে মাথায় একটা তেল দিয়ো। বললে না, মাথায় জ্বালা, দেহে জ্বালা—তেল ব্যবহার করলে ওগুলো যাবে। তুমি সুস্থ হবে।

স্থির দৃষ্টিতে পিঙলা শিবরামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। প্রখর হয়ে উঠছে তার দৃষ্টি। একটু শঙ্কিত হলেন শিবরাম। এইবার উন্মাদিনী হয় তো চীৎকার ক'রে উঠবে। কিন্তু সে-সব কিছু করলে না পিঙলা, হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে ঘন মেঘের দিকে চেয়ে রইল। কিছু যেন ভাবতে লাগল।

কালো মেঘ পুঞ্জিত হয়ে ফুলছে। তারই ছায়া পড়ল পিঙলার কালো মুখে। অতি মৃদু সঞ্চরণে বাতাস উঠছে। বিলের ধারের জলজ ঘাসবনের বাঁকা নমনীয় ডগাগুলি কাপছে; সাঁতালীর চরের একহাটু উঁচু কচি ঘাসবনে মৃদু সাড়া জেগেছে; ঝাউ গাছের শাখায় কাণ্ডে গান জাগছে; হিজলের কালো জলে কম্পন ধরেছে; পিঙলার তৈলহীন রুক্ষ ফাঁপা চুল দুলছে—উড়ছে। পিঙলা একদৃষ্টে মেঘের দিকে চেয়ে ভাবছে, খতিয়ে দেখছে ধন্বন্তরি ভাইয়ের কথা। অন্য কেউ একথা বললে সে অপমান বোধ করত, তীব্র প্রতিবাদ ক'রে নাগিনীর মতই ফুঁসে উঠত। কিন্তু ধন্বন্তরি ভাই তো সাধারণ মানুষ নয়, সে যে হাতের নাড়ী ধ'রে রোগের সন্ধান করতে পারে, দেহের মধ্যে কোথায় কোন্ রোগের নাগ, কি, নাগিনী এসে বাসা বাঁধলে, নাড়ী ধরে তিনি তাদের হাত চালিয়ে ঘরের সাপ সন্ধানের মতই সন্ধান করতে পারেন। কিন্তু—; সে ঘাড় নাড়লে; —তা তো নয়।

শিবরামের ইচ্ছা হ'ল তিনি বলেন—তুই শেষ পর্যন্ত উন্মাদ পাগল হয়ে যাবি পিঙলা। ওরে তার চেয়ে শোচনীয় পরিণাম মানুষের আর হয় না।

তোদের বিশ্বাস মিথ্যে আমি বলছি নে। তবে দেবতাই হোক, আর যক্ষ-রক্ষ-নাগ-কিন্নরীই হোক, মানুষ হয়ে জন্মালে, মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। নাগিনী যদি হোস তুই, তবু তুই মানুষ। মানুষের দেহ তোর, তোর দাঁতে বিষ নাই, থাকে তো বুকে আছে। ওসব তুই ভুলে যা। ওই ভাবনাতেই তুই পাগল হয়ে যাবি।

কিন্তু বলতে ভরসা পেলেন না।

পিঙলা তখনও ঘাড় নাড়ছিল; ঘাড় নেড়েই বললে—না ধন্বন্তরি ভাই, তা নয়। তুমার ভুল হইছে গ। হামরার ভিতরের নাগিনীটা জাগিছে। বিষ ঢালছে—আর সেই বিষ আবার গিলছে। তুমাকে তবে বলি শুন। ই কথা কারুকে বলি নাই। গুহ্য কথা। নারী মানুষের লাজের কথা। রাতে হামরার ঘুম হয় না। বেদে পাড়ায় ঘুম নেম্যা আসে—আর হামরার অঙ্গ থেক্যা চাঁপা ফুলের বাস বাহির হয়। সি বাসে মুই নিজে পাগল হয়্যা যাই গ। মনে হয় দরজা খুল্যা ছুট্যা বাহির হয়্যা যাই চরের ঘাস বনে, নয় তো, ঝাঁপিয়ে পড়ি হিজলের জলে। আর পরান দিয়া ডাকি—কালো কানাইয়ে। কালো কানাই না আসে তো—আসুক হামরার নাগ-নাগর; হেলে দুলে—ফণা নাচায়ে।

কণ্ঠস্বর মৃদু হয়ে এল পিঙলার, চোখ দুটি নিস্পলক হয়ে উঠল, তাতে ফুটে উঠল শঙ্কাপূর্ণ স্বপ্ন দেখার আতঙ্কিত দৃষ্টি। বললে—আসে, সে আসে ধন্বন্তরি ভাই। নাগ আসে। তুমার কাছে হামরার পরানের গোপন কথা কইতে যখন মুখ খুলেছি, তখুন কিছু লুকাব না। বলি শুন।

(পাঁচ)

শিবরাম বলেন ; পিঙ্গলার কাছে শোনা কাহিনী।

ফাল্গুনে ওই জমিদার-বাড়ীতে সাপ ধ'রে আনার পর—চৈত্র মাস তখন। ভাদুমামা আর এক মানুষ হয়ে ফিরে এল। কিন্তু গঙ্গারাম—সেই গঙ্গারাম। বাবুরা কন্তেকে বিদায় করেছিলেন দুহাত ভ'রে। দশ টাকা বকশিশ, নতুন লাল পেড়ে শাড়ী, গিন্নীমা নিজের কান থেকে মাকড়ি খুলে দিয়েছিলেন।

নাগু ঠাকুর তাঁর প্রসাদী কারণ দিয়েছিলেন, আর দিয়েছিলেন অষ্টধাতুর একটা আংটি। নিজের কড়ে আঙুল থেকে খুলে পিঙ্গলার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—নে। নাগু ঠাকুরের হাতের আংটি। আমার থাকলে, তোকে আমি হীরের আংটি দিতাম। কামরূপে মা কামাখ্যার মন্দিরে শোধন করে এ আংটি পরেছিলাম আমি। এ আংটি হাতে রাখলে মনে মনে যা চাইবি তা-ই পাবি।

রাঢ়ের সে আমলের টাকু মোড়ল আর এ আমলে নাগু ঠাকুর এই দুই বড় ওস্তাদ। টাকু মোড়ল ছিল কামরূপের ডাকিনী মন্ত্রসিদ্ধ। টাকু মোড়ল—নিজের ছেলেকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে বড় একটি ঝুড়ি ঢাকা দিত। মন্ত্র পড়ে ডাক দিত ছেলের নাম ধ'রে, ঝুড়ি ঠেলে বেরিয়ে আসত ছেলে জীবন্ত হয়ে। আজও রাঢ়ের বাজীকরেরা জাদুবিদ্যার খেলা দেখাবার সময় টাকু মোড়লের দোহাই নিয়ে তবে খেলা দেখায়।—দোহাই গুরুর, দোহাই টাকু মোড়লের।

নাগু ঠাকুর হালের ওস্তাদ। ডাকিনী-মন্ত্র জানে কিন্তু ও মন্ত্রে সে সাধনা করে নাই। নাগু ঠাকুর সাধনা করেছে ভৈরবী তন্ত্রে। লোকে

তাই বলে। তবে—ডাকিনী বিদ্যা, সাপের বিদ্যা, ভূত বিদ্যা—সবই না কি জানে নাগু ঠাকুর। ঠাকুরের জাত নাই, ধর্ম নাই, কোন কিছুতে অরুচি নাই, সব জাতির ঘরে যায়, সব কিছু খায়, পৃথিবীতে মানে না কিছুকে, ভয়ও করে না কাউকে। এই লম্বা মানুষ, গোরা রঙ, রুখু লম্বা চুল, মোটা নাক, বড় বড় চোখ, হা হা শব্দ তুলে হাসে, সে হাসির শব্দে মানুষ তো মানুষ, গাছপালা শিউরে ওঠে। গঙ্গারাম ডাকিনী-মন্ত্র জানে শুনে তার সঙ্গে এক হাত বাণ কাটাকাটি খেলতে চেয়েছিলেন। গঙ্গারাম খেলে নাই। বলেছিল—গুরুর বারণ আছে, বেরাহ্মণের সঙ্গে, সন্ন্যেসীর সঙ্গে খেলবি না।

নাগু ঠাকুর হা হা ক'রে হেসে বলেছিলেন—আমার জাত নাইরে বেটা! নিয়ে চল্ তোদের গাঁয়ে, থাকব সেখানে, তোদের ভাত খাব, আর সাধন করব। এমনি একটা কন্যে দিস ভৈরবী করব।

চৈত্র মাসের তখন মাঝামাঝি।

হিজলের চরে পোড়ানো ঘাসের কালচে রঙের উপর সবুজ ছোপ পড়েছে। কচি কচি সবুজ ঘাসের ডগাগুলি দেখা দিয়েছে। গাছে গাছে লালচে সবুজ কচি পাতা ধরেছে। বিলের জলের উপর পদ্মের পাতা দেখা দিয়েছে। কোকিল, চোখ গেল, পাপিয়া পাখীগুলার গলার ধরা-ধরা ভাব কেটেছে, পাখীগুলা মাতোয়ারা হয়ে ডাকতে শুরু করেছে। ওদিকে হিজলের দক্ষিণ-পশ্চিম মাঠ তিল ফসলের বেগুনী রঙের ফুলে হয়ে উঠেছে রূপসরোবর। এদিকে বেদে পাড়ায় হলুদ আর রঙের ঢেউ খেলছে। বেদে পাড়ায় বিয়ে সাদী সাঙার কাল এসেছে; সকল ঘরেই ছেলে-মেয়ে আছে, ধুম লেগেছে সকল ঘরেই।

বাতাসে আউচ ফুলের গন্ধ; আউচ ফুল ফুটেছে বিলের চারিপাশে।

অষ্টাবক্র মুনির মত আঁকাবাঁকা খাটো গাছগুলি থোলো থোলো সাদা ফুলের গুচ্ছে ভরে গিয়েছে। মাঠময় পাতাঝরা বাঁকাচোরা বাবলা গাছ-গুলির ডগায় ডগায় সবুজ টোপার মত নতুন পল্লব সবে দেখা দিয়েছে।

সে দিন নোটনের কন্যে আর গোকুলের পুত্র, হীরে আর নবীনের বিয়ে। তিন বছরের হীরে, নবীনের বয়স দশ। গায়ে হলুদ মাখছে বেদে এয়োরা, রঙ খেলছে, উলু পড়ছে; ঢোল কাঁসী বাজাচ্ছে পাশের গাঁয়ের বায়েনরা, মরদেরা মদ তুলছে, মদের গন্ধে যত কাক আর শালিকের দল এসে পাড়া ছেয়ে গাছের ডালে বসেছে; বেলা তখন দুপুরের কাছাকাছি, পাড়ায় সোরগোল উঠল।

নাগু ঠাকুর আসছে। নাগু ঠাকুর!

পিঙলা বসেছিল একা নিজের দাওয়ায়।

সে চমকে উঠল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুর-গুর করে উঠল। মনে পড়ল—নাগু ঠাকুরের সে মোটা ভরাট দরাজ কণ্ঠস্বর, তার সেই মূর্তি, লম্বা মানুষ গোরা রঙ, মোটা নাক, বড় বড় চোখ, প্রশস্ত বুক, গলায় রুদ্রাক্ষ আর পৈতে। সেই হা হা ক'রে হাসি। গগনভেরী পাখীর ডাকে আকাশে নাকাড়া বাজে, নাগু ঠাকুরের হাসিতে বুকের মধ্যে নাকাড়া বাজে।

নাগু ঠাকুর আসছে! নাগু ঠাকুর!

উত্তেজনায় পিঙলার অবসাদ কেটে গেল। সে উঠে দাঁড়াল।

যেমন অদ্ভুত নাগু ঠাকুর—তেমনি আসাও তার অদ্ভুত। কালো একটা মহিষের পিঠে চড়ে এসে সাঁতালীতে ঢুকল। সঙ্গে—হিজলের ঘাস-চরের বাথানের এক গোপ। ঠাকুরের কাঁধে প্রকাণ্ড এক ঝোলা। মহিষের পিঠ থেকে নেমে হা হা করে হেসে বললে—পথে ঘোষেদের মহিষটা পেলাম, চ'ড়ে চলে এলাম। নে রে ঘোষ, তোর মোষ নে।

তারপর বললে—বসব কোথা ? দে, বসতে দে।

তাড়াতাড়ি ভাদু নিয়ে এল একটা কাঠের চৌকি। —বসেন, বাবা বসেন।

বসল নাগু ঠাকুর। বললে—ভাত খাব। কন্যে, তোর হাতেই খাব।

হাতের চিমটেটা মাটিতে বসিয়ে দিলে। পিঙলা বিচিত্র বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে দৃষ্টিতে যত আতঙ্ক তত বিস্ময়। লাল কাপড় পরনে গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি উগ্র আয়ত চক্ষু, মোটা নাক—নাগু ঠাকুর যেন দাঁতাল হাতী। না—নাগু ঠাকুর যেন রাজ-গোখুরা। কথা বলছে আর দুলছে, সঙ্গে সঙ্গে দুলছে তার বুকের উপর রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে ডগডগ করছে সিন্দূরের ফোঁটা, ঝকমক করছে রাঙা চোখ। পিঙলার বুকের ভিতরটা গুরগুর করে কাঁপছে নাগু ঠাকুরের ভারী ভরাট কণ্ঠস্বরে।

ভাদু বললে—কন্যে, পেনাম কর গ! পিঙলা!

—এ্যাঁ ? প্রশ্ন করলে পিঙলা; ভাদুর কথা তার কানেই যায় নাই, সে মগ্ন হয়ে রয়েছে নিজের অন্তরের গভীরে।

ভাদু আবার বললে—পেনাম কর গ ঠাকুরকে!

ঠাকুর নিজের পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বললে—পেনাম কর্। তোর জন্যেই আসা। মা বিষহরির হুকুম এনেছি। তোর ছুটির হুকুম হয়েছে।

—ছুটির হুকুম হয়েছে ?

চমকে উঠল পিঙলা, চমকে উঠল সাঁতালীর বেদে পাড়া।

নাগু ঠাকুর দাড়িতে হাত বুলিয়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললে—নাগু ঠাকুর শাক দিয়ে মাছ ঢাকে না। মিছে কথা বলে না। এই কন্যেটাকে দেখে আমার মন বললে—ওকে না-হলে জীবনই মিছে। বুকটা পুড়তে

লাগল। কিন্তু কন্যে যেখানে বিষহরির আদেশে বাকবদ্ধ হয়ে সাঁতালীতে রয়েছে তখন সে কন্যেকে পাই কি ক'রে? শেষ গেলাম মায়ের কাছে ধরনা দিতে চম্পাই নগর রাঙামাটি। পথে দেখা হ'ল এক ইসলামী বেদে-বেদেনীর সঙ্গে। হোক ইসলামী বেদিনী, সাক্ষাৎ বিষহরির দেবাংশিনী। সে-ই বলে দিলে আমাকে। কন্যের দেনা এবারে শোধ হয়েছে, কন্যের এবারে ছুটি। নিয়ে যাও এই নাগ, এই নাগ দেখিয়ো। বলো, এই নাগ বার্তা এনেছে বিষহরির কাছ থেকে। কন্যের মুক্তি, কন্যের ছুটি;—

প্রকাণ্ড ঝুলির ভিতর থেকে নাগু ঠাকুর বার করলে একটা বড় ঝাঁপি। পাহাড়ে চিতি রাখা ঝাঁপির মত বড়। খুলে দিলে সে ঝাঁপিটা। শিশ্ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল সে নাগ; নাগ নয়, মহানাগ; রাত্রির মত কালো, বিশাল ফণা মেলে সে বুকের উপর দাঁড়িয়ে উঠল,—ছোবল মারলে মানুষের বুকে ছোবল পড়বে, বসে থাকলে ছোবল পড়বে মাথায়। ছয়'হাত লম্বা কালো কেউটে। কালো মটর কলাইয়ের মত নিষ্পলক চোখ, ভীষণ দুটি চেরা জিভ!

মাথা তুলে দাঁড়াতেই নাগু ঠাকুর হেঁকে উঠলো, সাপটাকেই হাঁক দিয়ে সাবধান ক'রে দিলে, না-হয় উত্তেজনার আতিশয্যে হাঁক মেরে নাগটাকে যুদ্ধে আহ্বান জানালে। সে হেঁকে উঠল—এ—ই!

সাপটা ছোবল দিয়ে পড়ল। সাধারণ গোখুরা কেউটের ছোবল দেওয়ার সঙ্গে তফাৎ আছে, অনেক তফাৎ। তারা মুখ দিয়ে আক্রমণ করে, এ আক্রমণ বুক দিয়ে। আড়াই হাত তিন হাত উদ্যত দেহের উর্ধ্বাংশটা একেবারে আছাড় খেয়ে পড়ছে। মানুষের উপর পড়বার সুযোগ পেলে দেহের ভারে এবং আঘাতে তাকে পেড়ে ফেলবে; বুকের উপর পড়লে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে মানুষ। তখন ও তার বুকের উপর

চেপে তুলবে আর কামড়াবে। সাঁতালীর বেদেরাও এ নাগ দেখে বারেকের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল।

পিঙলা চীৎকার ক'রে ছুটে এল—ঠাকুর! তার হাতও উদ্যত হয়ে উঠেছে। সে ধরবে ওর কণ্ঠনালী চেপে। সমস্ত দেহখানা নিয়ে ঠাকুরের বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়বার আগেই ধরবে।

নাগু ঠাকুর কিন্তু রাঢ়ের নাগেশ্বর ঠাকুর। দুর্দান্ত সাহস, প্রচণ্ড শক্তি, সে তার লোহার চিমটেখানা শক্তহাতে তুলে ধরেছে। কণ্ঠনালীতে ঠেকা দিয়ে তাকে আটকেই শুধু দেয় নাই তাকে উলটে ফেলে দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্যে হেসে উঠল।

ওদিকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল গঙ্গারাম। সে সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল—শঙ্খচূড়! ই তুমি কোথা পেল্যা ঠাকুর? মুই দেখেছি, কামাখ্যা মায়ের থান যি দ্যাশে—সেই দ্যাশে আছে এই নাগ। আরেঃ—বাবা!

* *

নাগু ঠাকুর বললে—সে আমি জানি না। আমি জানি, এ হ'ল নাগলোকের নাগ। বিষহরির বার্তা নিয়ে এসেছে। নাগিনীর মুক্তি হয়েছে, তার ঋণ সে শোধ করেছে। বলেছে আমাকে—বিষহরির দেবাংশিনী, সে এক সিদ্ধ যোগিনী। মায়ের সঙ্গে তার কথা হয়। তার সঙ্গের যে বেদে সে আমাকে বললে—তুমি মিছে কথা ভেবো না ঠাকুর। এ মেয়ে সামান্য লয়। মা গঙ্গার জলে কন্যে ভেসে এসেছে। আমার ভাগ্যি, আমার লায়ের গায়ে আটকে ছিল, আমি তুললম—যত্ন ক'রে সেবা ক'রে চেতনা ফেরালম, কন্যে জ্ঞান পেয়ে প্রথম কইল কি জান? কইল—মা বিষহরি, কি করলে জয়নী, এই তোমার মনে ছিল? সাক্ষাৎ নাগলোকের কন্যে এ মেয়ে। মা-বিষহরির সঙ্গে ওর কথা হয়!

নাগু ঠাকুর বললে—আমার রাঢ় দেশে বাড়ী শুনে আমাকে বললে, রাঢ় তোমার বাড়ী তো তুমি হিজল বিল জান? মা মনসার আটন যে হিজলে—সেই হিজল! বিষবিদ্যা জান বলছ তো গিয়েছ কখনও সেখানে? সাঁতালী জান? সাঁতালীর বিষবেদেদের জান? আমি অবাক হয়ে গেলাম। শুধালাম—তুমি জানলে কি করে? সে কন্যের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। বললে—ঠাকুর, নাগলোকের কালনাগিনীর এক মায়ের পেটের অনেক কন্যের এক একজনাকে যে এক এক জন্মে সেখানে ঋণশোধ করতে জন্ম নিতে হয়। আমিও এক জন্মে সেখানে জন্ম নিয়েছিলম। বড় দুঃখ—বড় যাতনা, বড় বঞ্চনা, বড় তাপ পেয়ে জন্ম শেষে মায়ের থানে গেলম, বললম—তুমি মুক্তি দাও। আর দুঃখ তাপ দিয়ো না। মা আমাকে পাঠায়ে দিলেন নরলোকে, বললেন—যা তবে সেই তপস্যা কর্ গে যা। সেই তপ করছি ঠাকুর। মায়ের বিধান মানতে পারি নাই, তার জন্যে শাস্তি পেলম, ইস্‌লামী বেদের নায়ে এসে উঠলাম। তার অন্ন খেলম। তবে মানুষটা ভাল। ভারী ভাল। তাতেই তো ওর সঙ্গে ঘর বেঁধেছি। ঘর না ছাই—মা-মনসার আটনে আটনে ঘুরে বেড়াই; মায়ের থানে পূজা করি—আর আদেশ মাগি। বলি—মাগো, মুক্তি দাও! দেনা শোধ কর। আমাকে শুধালে—তা তুমি কেন এমন ক'রে বাণ্ডলা বাউলের মত ঘুরছ ঠাকুর? ব্রাহ্মণের ছেলে, কি তোমার চাই? আমি তাকে বললাম—কন্যে, তোর মত, তোরই মত এক কন্যে, সেও নাগলোকের কন্যে, জন্মেছে নরলোকে, তার জন্যে আমার সব কিছুতে অরুচি, তাকে না পেলে আমি মরব;—তারই জন্যে ঘুরছি এমন করে। আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না, কালো মেয়ে, তার দুই হাতে দুই গোখুরা, আঃ—সে রূপ আমি ভুলতে পারছি না। সে হ'ল ওই সাঁতালী গাঁয়ের

নাগিনী কন্যে—তার নাম পিঙ্গলা। আজ এক মাস ঘর থেকে বেরিয়েছি যাব চম্পাই নগর রাঙামাটি—মা-বিষহরির দরবারে; ধরনা দোব। হয় মা আমাকে কন্যেকে দিক—নয় তো নিক, আমার জীবন নিক বিষহরি। সে কন্যে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল। আকাশ-বাতাস, গাছ-পালা, নদী-পাহাড় পার হয়ে তার দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল আমি দেখলাম। গুরুর নাম নিয়ে বলছি—সে আমি দেখলাম। চলে গেল—আঁধার রাত্রে আলো যেমন চলে—তেমনি ক'রে চলল। না, পাহাড় গাছপালায়—আলো ঠেকা খায়, দৃষ্টি তাও খায় না। সে চলে, তার দৃষ্টি চলল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সে হঠাৎ বললে—পিঙলা, পিঙলা পিঙলা কন্যে! সাঁতালী গাঁয়ের বিষহরির দেবাংশিনী, নাগিনী কন্যে! কালনাগিনীর মত কালো লম্বা দিঘল দেহ, টানা চোখ, টিকালো নাক, মেঘের মত কালো—এক পিঠ চুল, বড় মনের যাতনা তার, দারুণ পরানটার দাহ! কন্যে কাঁদে গ। কন্যে কাঁদে! বুকের মধ্যে এক গাছ চাঁপার কলি কিন্তু সে ফুটতে পায় না। বুকের আগুনে ঝরে যায়।

গোটা সাঁতালীর বেদেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শুনছিল নাগু ঠাকুরের অলৌকিক কাহিনী। শঙ্কায় তারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। বড় ঝাঁপিটার ভিতর মধ্যে মধ্যে গর্জাচ্ছে সেই মহানাগটা। আর শোনা যাচ্ছে—জনতার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ। বিয়েবাড়ীর বাজনা থেমে গিয়েছে। ভাদুর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে, জ্বলছে। গঙ্গারামের চোখের দৃষ্টি ছুরির মত ঝলছে। বেদের মেয়ে অবিশ্বাসিনী, বেদের মেয়ে পোড়ারমুখী, মুখ পুড়িয়ে তার আনন্দ; বেদেদের পাড়ায় পাড়ায় অনেক গোপন খেলা;—তাব জন্য অনেক বিধান; সন্ধ্যার পর বেদের মেয়ে বাড়ী ফিরলে, সে বাড়ী ঢুকতে পায় না;—'শিয়াল ডাকিলে পরে বেদেরা লবে না ঘরে, বেদেনীর যাবে জাতি কুল।' সে সব পাপ খণ্ডন করে—

এক ওই বিষহরির কন্যার তপস্যা; তার পুণ্য। নাগু ঠাকুরের কথার মধ্যে যদি দেবতার কথার আদেশের প্রতিধ্বনি না থাকত তবে নাগু ঠাকুরকে তারা সড়কিতে বিঁধে ঝাঁঝরা করে দিত। আরও আশ্চর্য নাগু ঠাকুর ;—সে সব জানে, তবু তার ভয় নাই। কেন সে ভয় করবে! এ তো তার কথা নয়, দেবতার কথা। বিষহরির এক কন্যার কথা। সে সশরীরে এসেছে নাগলোক থেকে, তপস্যা করছে জীবনভোর। তপস্বিনী যোগিনী কন্যার সঙ্গে মা-বিষহরির কথা হয়। তার কথা। সে বলেছে।

বিস্ময়ে বিচিত্র ভাবোপলব্ধিতে পিঙলা যেন পাথরের মূর্তি। পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে ঠাকুরের দিকে। বড় বড় চোখ, মোটা নাক, গৌরবর্ণ দেহ, কপালে সিন্দূরের ফোঁটা, মাথায় বড় বড় রুক্ষ কালো চুলের রাশি। মুখে দাড়ি গোঁফ। গম গম করছে তার ভরাট গলার আওয়াজ। বলছে সেই কাহিনী। বলছে পিঙলার বুকের ভিতরের চাঁপা গাছে, গাছ ভরে আসে চাঁপার কলি। কিন্তু ঝরে যায়, বুকের আগুনে ঝলসে সব ঝরে পড়ে যায়। একটাও কোন দিন ফোটে না।

পিঙলা অকস্মাৎ মাটির উপর পড়ে গেল, মাটির পুতুলের মত।

নাগু ঠাকুর তার গৌরবর্ণ গোলালো দুখানা হাত দিয়ে কালো মেয়েটিকে তুলে নিতে গেল। এমন যে নাগু ঠাকুর—যার গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় শিঙা বাজছে বুঝি, সেই মানুষের গলায় এবার যেন শানাই বেজে উঠল, সে ডাকলে—পিঙলা! পিঙলা!

তার আওয়াজকে ঢেকে দিলে এবার গঙ্গারামের চীৎকার, সে চীৎকার করে উঠল—খবরদার! সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পড়ল নাগু ঠাকুর আর পিঙলার মাঝখানে; নাগু ঠাকুরের বাড়ানো দুখানা হাত দুহাতে চেপে ধরলে। চোখে তার আগুন জ্বলছে। গঙ্গারাম ডোমন করেত,

সে ফণা তোলে না, তার চোখ স্থির কুটিল, আজ কিন্তু গঙ্গারাম গোখুরা হয়ে উঠেছে। সে বললে—খবরদার ঠাকুর! কন্বেরে ছুঁইবা না। হও তুমি বেরাহ্মণ—হও তুমি দেবতা, সাঁতালীর বিষবেদের বিষহরির কন্বের অঙ্গ পরশের হুকুম নাই।

এবার ভাদু গর্জন ক'রে সায় দিয়ে উঠল—হুঁ! অর্থাৎ ঠিক কথা, এই কথাটাই তারও কথা, গোটা সাঁতালীর বেদেজাতের কুলের কথা।

ভাদুর সঙ্গে সঙ্গে গোটা বেদেপাড়াই সায় দিয়ে উঠল—হুঁ!

নাগু ঠাকুর সোজা মানুষ, বুকের কপাট তার পাথরে গড়া কপাটের মত শক্ত, সে কখনও নোয়ায় না, সে আরও সোজা হয়ে দাঁড়াল। বড় বড় চোখে দৃষ্টি ধ্বকধ্বক ক'রে উঠল। সে চীৎকার ক'রে উঠল, শিঙা হেঁকে উঠল—বিষহরির হুকুম! মা কামাখ্যার আদেশ!

গঙ্গারাম বললে—মিছা কথা!

ভাদু বললে—পেমান কি?

নাগু ঠাকুর এবার নিজের হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্য আকর্ষণ করে বললে—হাত ছাড়্।

—না।

নাগু ঠাকুর যেন দাঁতাল হাতী। এক টানে লোহার শিকল ঝনঝন শব্দ ক'রে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। নাগু ঠাকুরের এক ঝাঁকিতে গঙ্গারামের হাত দুখানা মুচড়ে গেল, সে-মোচড়ের যন্ত্রণায় তার হাতের মুঠি খুলে গেল এক মুহূর্তে। হা হা শব্দে হেসে উঠল নাগু ঠাকুর। নাগু ঠাকুরের ভয় নাই। চারিপাশে তার হিজলের ঝাউবন ঘাসবনের চিতাবাঘের মত বেদের দল;—তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে সে হা হা করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে পড়ল মুগুরের মত একটা হাতের একটা কিল।

মারলে গঙ্গারাম। একটা শব্দ করে নাগু ঠাকুর টলতে লাগল, চোখের তারা দুটো ট্যারা হয়ে গেল, টলতে টলতে সে পড়ে গেল কাটা গাছের মত।

গঙ্গারাম বললে—বাঁধ্ শালাকে। রাখ্ বেঁধ্যা। তারপরেতে—

ভাদু সভয়ে বললে—না। বেরাহ্মণ, গঙ্গারাম—!

—কচু। উ শালার কুনো জাত নাই। শালা বেদের কন্তে নিয়া ঘর বাঁধিবে, উর আর জাত কিসের?

—ওরে সিদ্ধ পুরুষের জাত থাকে না।

হা হা ক'রে হেসে উঠল গঙ্গারাম। বললে—অ্যানেক সিদ্ধ পুরুষ মুই দেখিছি রে। সব ভেলকি, সব ভেলকি! হা-হা-হা-হা করে হাসতে লাগল গঙ্গারাম।

(ছয়)

পিঙলা বলে যাচ্ছিল তার কাহিনী, শুনে যাচ্ছিলেন শিবরাম। হিজল বিলের বিষহরির ঘাটের উপর বসে ছিলেন দুজনে। মাথার উপর ঝড় চলছে—হু হু করে, মেঘ উড়ে চলেছে। মধ্যে মধ্যে নীল বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা সর্পিল রেখায় চিড় খাচ্ছে কালো মেঘের আবর্তিত পুঞ্জ। কড় কড় ক'রে বাজ ডাকছে।

পিঙ্গলার ভ্রূক্ষেপ নাই। তার বিশ্বাস, হিজলের আশেপাশে বজ্রাঘাত হয় না। তার বিশ্বাস সে যখন মায়ের চরণে প্রার্থনা জানিয়ে মন্ত্রপড়ে, হিজল বিলের সীমানার শান্তিভঙ্গ না ক'রে দূরান্তরে চলে যেতে মেঘকে ঝড়কে আদেশ করেছে তখন তাই যেতে সে বাধ্য এবং তাই যাবে।

শিবরাম বললে—ভাল ক'রে কি ঝড় লক্ষ্য করেছ তোমরা বাবা? হয় তো কেতাবে পড়েছ, কিন্তু আমরা সেকালের মানুষ—এ সব পাঠ গ্রহণ করেছি প্রকৃতির লীলা থেকে। ঝড়টা সেদিনের ছিল শুকনো ঝড় এবং উপর-আকাশের ঝড়। অনেক উপরে উনপঞ্চাশপবনের তাণ্ডব চলছিল, নিচে তার কেবল আঁচটা লাগছিল। এমন ঝড় হয়। সে দিনের ঝড়টা ছিল সেই ঝড়। সেদিনের ঝড়টা যদি পৃথিবীর বুকে নেমে বয়ে যেত—তবে হিজলের চরের ঝাউ বন বাবলা বন শুয়ে পড়ত মাটিতে। হিজল বিলের জল চলকে পড়ত চরের উপর। গঙ্গার বুকের নৌকা যেত উড়ে। সাঁতালী বেদেদের কাশে-ছাওয়া খড়ের চাল ঝড়ের নদীতে নোঙর ছেড়া পানসির মত ঘুরতে ঘুরতে চলে যেত উধাও হয়ে। পিঙ্গলা আর আমি নাগিনী কন্যা আর ধন্বন্তরি ভাই চলে যেতাম শূন্যলোকে ভেসে।

হেসে শিবরাম বলেন—তাই যদি যেতাম বাবা তা হলে উড়ে যেতে যেতে পিঙ্গলা খিল খিল করে উঠত, বলত—ধন্বন্তরি ভাই, মনে কর মা মনসার বেরতোর কথা; না হেসে ভাইয়েরা বেনে কন্নেকে বলেছিল—বহিন, দেহকে বাঁটুলের মত গুটিয়ে নাও, তুলোর চেয়ে হাল্কা হও, আমাদের স্কন্ধে ভর কর, চক্ষু দুটি বন্ধ কর। দেখবে শোঁ শোঁ করে নিয়ে গিয়ে তুলব নাগলোকে। তেমনি করে ধন্বন্তরি ভাই, হামরার কাঁধের পর ভর করো।

পিঙলার তখন বাস্তববোধ বোধ হয় একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কের বায়ু সেটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, আর বায়ুকে আশ্রয় করে মেঘের মত পুঞ্জিত হচ্ছে আবর্তিত হচ্ছে ওই অলৌকিক বিশ্বাস। উন্মাদ রোগের ওই হল লক্ষণ। একটা মনোবেদনা বা অন্ধ বিশ্বাস নিরন্তর মানুষের মন এবং দেহের মধ্যে সৃষ্টি করে গুমোটের, যে ভাবনা প্রকাশ করতে পারে না মানুষ সেই নিরুদ্ধ অপ্রকাশিত ভাবনা বায়ুকে কুপিত করে তোলে। তারপর প্রকৃতির নিয়মে কুপিত বায়ু ঝড়ের মত প্রবাহিত হয়। তখন, এই বেদনা বা বিশ্বাস মেঘের মত মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে দুর্যোগের সৃষ্টি করে।

পিঙলা সে দিনও আকাশের ঊর্ধ্ব লোকে প্রবাহিত ঝড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে হেসে বললে—দেখিছ ধন্বন্তরি ভাই, জন্নীর মহিমা!

একটা গভীর মমতা; শিবরাম বলেন—ওই বন্য বোনটির প্রতি রমণীয় আকর্ষণ আমার ছিল, গোড়া থেকেই ছিল। এমনই যারা বন্য—যাদের প্রকৃতির মধ্যে মানব প্রকৃতির শৈশব মাধুর্যের অবিমিশ্র আস্বাদ মেলে—রূপ ও গন্ধের পরিচয় মেলে তাদের উপর এই রমণীয় আকর্ষণ স্বাভাবিক। তোমরা এদের সংসর্গে এস নাই—তাই এই আকর্ষণের গাঢ়তা জান না। আমার ভাগ্য, আমি পেয়েছি। সেই আকর্ষণের

উপরে সে দিন আর এক আকর্ষণ সংযুক্ত হয়ে সবলতর প্রবলতর করে তুলেছিল আমার আকর্ষণকে। সে হল—রোগীর প্রতি চিকিৎসকের আকর্ষণ। আমি পিঙলার আচরণের মধ্যে রোগের উপসর্গের প্রকাশ-বৈচিত্র্য দেখছিলাম। ভাবছিলাম—রোগেরও অন্তরালে লুক্কায়িত রয়েছেন যে বিচিত্র রহস্যময়ী, তিনি কি ভাবে পিঙলাকে গ্রাস করবেন? রোগের অন্তরালে কোন্ রহস্যময়ী থাকেন, বোঝ ত?—মৃত্যু। তা-ছাড়া, পিঙলার কাহিনী ভালও লাগছিল।

পিঙলা ওই পর্যন্ত ব'লে খানিকটা চুপ করেছিল। নাগু ঠাকুর বুকের উপর অতর্কিত প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে পড়ে গেল—সে ছবি যেন শিবরাম চোখে দেখতে পেলেন। এতগুলি কৃষ্ণকায় মানুষের মধ্যে গৌরবর্ণ রক্তাম্বর পরা ওই বিশাল দেহ অসমসাহসী মানুষটা টলতে টলতে পড়ে গেল। পিঙলা বলে চুপ করলে। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের ঘন আবর্তিত মেঘের দিকে চেয়ে রইল। তারপর দূরে একটা বজ্রপাতে সচেতন হয়ে—আকাশের দিকে, আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে—দেখিছ ধন্বন্তরি ভাই, জহুনীর মহিমা!

—"ঠাকুর আসিবে। সে-ই আনিবে হামরার ছাড়পত্তর। বিধেতার দরবারে হিসাব-নিকাশে কন্যের ফারখতের হুকুম। বেদেকুলের বন্ধন থেক্যা মুক্তির আদেশ আনিতে গেলছে ঠাকুর!"

"মুই তারে সেদিনে হাতপায়ের বাঁধন খুল্যা ছেড়্যা দিলম; না-হলি ওই পাপী শিরবেদেটা তারে জ্যান্ত রাখিত না। খুন কর‍্যা ভাসায়ে দিত হাঙরমুখীর খালে। হাঙরে কুম্ভীরে খেয়ে ফেলাত ঠাকুরের গোরো দাঁতাল হাতীর-পারা দেহখানা।"

শিউরে ওঠে পিঙলা।

"ভাগ্য ভাল, ভাদু মামারে সেইদিন থেক্যা সুমতি দিলে মা-বিষহরি! সে-ই এস্যা হামরাকে কইলে—কন্যে তুমি কও, মায়ের চরণে মতি রেখ্যা ধেয়ান কর‍্যা বল, বেরাহ্মণের লহু সাঁতালীর মাটিতে পড়িবে কি না-পড়িবে। গঙ্গারাম বলিছে—উকে খুন কর‍্যা ফেলে দিবে হাঙরমুখীর খালে। বলিছে—ছেড়্যা যদি দিস তবে উ ঠাকুর সব্বনাশ কর‍্যা দিবে!"

সেই যে চেতনা হারিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল পিঙলা—অনেকক্ষণই তার জ্ঞান হয় নাই। তারপর জ্ঞান ফিরল যখন—তখন সে তার দাওয়ায় শুয়ে—আর তার মাথার কাছে বসে ভাদুর মেয়ে—তার মামাতো বোন চিতি। বাড়ীর সামনে যেখানে সে দেখেছিল নাগু ঠাকুরকে আর সাঁতালীর বেদেদের—সেখানটা শূন্য। দূরে বিয়েবাড়ীতে লোকজন বসে রয়েছে। জটলা করছে। বাজনদারেরা ছুটে পালিয়েছে। নাগু ঠাকুরকে বুকে কিল মেরেছে—নাগু ঠাকুর যখন উঠবে তখন সাঁতালীতে বিপর্যয় ঘটবে। মৌমাছি বোলতা ভিমরুলে ভরে যাবে সাঁতালীর আকাশ। কিংবা জ্বলে উঠবে সাঁতালীর কাশে-ছাওয়ানো ঘরবাড়ী। কিংবা প্রচণ্ড ঝড়ই আসবে—যাহোক একটা ভীষণ বিপর্যয় ঘটবে।

পিঙলাকে সমস্ত বিবরণ বললে চিতি।

বললে—আহা দিদি গ, মানুষ তো নয়, সাক্ষাৎ মহাদেব গ। পাথরের কপাটের মতন বুকের পাটা, গোরো রঙ, বীর মানুষ, পড়ল ধড়াশ করে।

ভাদু ছুটে এল এই সময়ে।

পিঙলা বললে—কি হল আমার সে কথা তুমাকে বলতে লারব ধন্বন্তরি ভাই। হাঁ; ঠিক যেমন হলছিল—সেই বাবুদের বাড়ীতে, ওই

নাগু ঠাকুরের হাঁক শুন্যা, বেদেকুলের মাগু যায়-যায় দেখ্যা ঠিক তেমুনি। মনে মনে পরানটা ফাটায়ে ডাকিলম মা-বিষহরিকে। বলিব কি ভাই, চোখে দেখিলম যেন মায়ের রূপ। ওই আকাশের ম্যাঘে যেমন লল্প্যা উয়্যাই মিলায়ে যেতিছে বিদ্যুতের চমক—তেমুনি চকিতে দেখিলম—চকিতে মিলায়ে গেল। পিথিমীটা যেন দুল্যা উঠল, ছামুতে হেই হিজল বিল উথলায়ে উঠল। গাছ দুলিল—পাতা দুলিল।

পিঙলা আবার মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। এবার কিন্তু গতবারের মত নয়। এবার তার উপর হল বিষহরির ভর। মূর্ছার মধ্যেই মাথা তার দুলতে লাগল, মাথার সে আন্দোলনে রুখু চুলের রাশ চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ল। বিড় বিড় করে সে বললে—ছেড়্যা দে, সিদ্ধ পুরুষকে তোরা ছেড়্যা দে। বীরপুরুষকে তোরা ছেড়্যা দে। কন্যে থাকিবে না, কন্যে থাকিবে না। মা কহিছে, কন্যে থাকিবে না!

পিঙলা বলে—মাকে সে সেই বিচিত্র বিস্ময়কর ক্ষণে চোখে দেখেছিল। বলে—ওই চকিতে দেখা দিয়ে মা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যেন কি। পিঙলা দেখলে—মদমত্ত শ্বেতহস্তীর মত—নাগু ঠাকুরকে! বুকে তার রুদ্রাক্ষের মালা দুলছে—চোখে তার নির্ভয় দৃষ্টি, নাগু ঠাকুরের শিঙার মত কণ্ঠস্বর কানের কাছে বেজে উঠল। "কন্যা থাকবে না।" বিষহরির হুকুম নাগু ঠাকুর শুনেছে। সে ওই কন্যেকে নিতে এসেছে।

ভাদু চীৎকার করে উঠেছিল—মা জাগিছেন, কন্যের ভর হইছে। ভর হইছে। ধূপ—ধুনা—বিষমঢাকি!

ধূপধুনার গন্ধে ধোঁয়ায় বিষমঢাকির বাদ্যে সে যেন নূতন পর্বদিন এল সাঁতালী গাঁয়ে।

—কি, আদেশ—কও মা!

পিঙলার সেই এককথা।—সিদ্ধ পুরুষ, বীর পুরুষ—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! কন্যা থাকিবে না। কন্যা থাকিবে না।

বলতে বলতে নির্জীব হয়ে পড়ল পিঙলা। যেন নিথর হয়ে গেল। দীর্ঘক্ষণ পর সে জাগল। তার সামনে দাঁড়িয়ে তখন গঙ্গারাম, চোখে তার ক্রূর দৃষ্টি। ডোমন করেতের দৃষ্টি মেলে—তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পর পিঙলা টলতে টলতে উঠল, ডাকলে—ভাদু মামা গ!

—জননী!

—ধর হামরাকে!

—কোথা যাবে গ, ই দেহ নিয়া।

—যাব। ঠাকুর কোথাকে আছে নিয়া চল হামরাকে। বিষহরির আদেশে কই মুই। নিয়া চল। আশ্চর্য আদেশের সুর ফুটে উঠেছিল পিঙলার কণ্ঠস্বরে। সে সুর লঙ্ঘনের সাহস বেদেদের নাই।

হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে রেখেছিল নাগু ঠাকুরকে।

আশ্চর্য, নাগু ঠাকুর চুপ করে শুয়েছিল—যেন আরাম শয্যায় শুয়ে আছে। পিঙলা গিয়ে তাকে প্রণাম করলে, তারপর নিজের হাতে তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে হাত জোড় করে বললে—বেদে কুলের অপরাধ মাজ্জনা করি যাও ঠাকুর। তুমি ঘর যাও।

নাগু ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে একবার গম্ভীরকণ্ঠে ডাকলে—পরমেশ্বরী মা! তারপর বললে—প্রমাণ চেয়েছিস তোরা! ভাল, প্রমাণ আমি আনব। এনে, শোন্ কন্যে, প্রমাণ দিয়ে তোকে আমি নিয়ে যাব। তোকে নইলে আমার জীবনটাই মিছে।

—ছি ঠাকুর, তুমি বেরাহ্মণ—

—জাত আমি মানি নাই কন্যে, এ সাধনপথে জাত নাই! থাকলেও

তোর জন্যে সে জাত আমি দিতে পারতাম। তোর জন্যে রাজসিংহাসন থাকলে তাও দিতে পারতাম। নাগু ঠাকুরের লজ্জা নাই, মিছে কথা সে বলে না।

কথা বলতে বলতে নাগু ঠাকুর যেন আর একজন হয়ে গেল। শিঙা শানাই হল ধন্বন্তরি, তাতে যেন সুরে গান বেজে উঠল। মুখে চোখে গোরা রঙে যেন আবীরের ছটা ফুটল।

—সর্, সরে যা! দুটারে, দুটারেই খুন করব মুই!

বেদেদের ঠেলে আগিয়ে এল গঙ্গারাম।

হা হা করে হেসে উঠল নাগু ঠাকুর। এবার সে অপ্রস্তুত নয়। হাতের লোহার ত্রিশূলটা তুলে বললে—আয়। শুধু হাতে যদি চাস তো তাই আয়! হয়ে যাক, আজই হয়ে যাক।

তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল পিঙলা—খবরদার! ঠাকুর যা বলিছে সে আপন কথা বলিছে। মুই যাই নাই। যতক্ষণ মায়ের আদেশ না মিলবে মুই যাব না। বেরাহ্মণকে পথ দে!

গঙ্গারাম নাগু ঠাকুরের হাতে ত্রিশূল দেখে, অথবা পিঙলার আদেশে, কে জানে, থমকে দাঁড়াল।

নাগু ঠাকুর বেরিয়ে গেল বেদেপাড়া থেকে। যাবার সময় গঙ্গারামের সামনে দাঁড়িয়ে বললে—প্রমাণ যেদিন আনব, সে দিন, এই কিলের পাওনা আমি নোব। বুকটাকে লোহাতে বাঁধিয়ে রাখিস, এক কিল সেদিন আমি মারব। হা হা ক'রে হেসে উঠল নাগু ঠাকুর!

ওই হাসি হাসতে হাসতেই চলে গেল নাগু ঠাকুর।

গোটা বেদেপাড়াটা স্তম্ভিত হয়ে রইল!

পিঙলা বললে—ধন্বন্তরি ভাই, তুমার কাছে মুই কিছু গোপন করব

না, পরানের কথাগুলান পরানের ভিতরে গুমর্যা গুমর্যা কেঁন্থা সারা হল। দুঃখের ভাগী আপনজনার কাছে না-বল্যা শান্তি নাই। তুমারে সকল কথাই কই, শুন। হও তুমি মরদ মানুষ, তবু তুমি হামরার ধরম ভাই, মনে লাগে যেন কত জনমের আপন থেক্যাও আপনজনা। বলি শুন ভাই। মানুষটা চল্যা গেল, হামরার নয়ন দুটা আপনা থেক্যা ফিরল তার পানে। কি করব কও? ধন্বন্তরি ভাই, সূয্যমুখী পুষ্প—সুরযঠাকুরের পানে তাকায়ে থাকে, দেবতার রথ চলে, পূব থেক্যা পচি মুখে—নয়নে তার পলক পড়ে না, নয়ন তার ফেরে না। নাগু ঠাকুর হামরার সুরযঠাকুর! তেমুনি বরণ তেমনি ছটা—ঠাকুর হামরার বন্ধন-মোচনের আদেশ নিয়া আসিল, কইল—ওই কন্যেরে লইলে পরানটা মিছা, পিথিমীটা মিছা, বিদ্যা মিছা, সিদ্ধি মিছা; তার লাগি সে জাত মানে না, কুল মানে না, স্বগ্য মানে না। এই কালো কন্যে—কাল-নাগিনী—এরে নিয়া ঘর বাঁধিবে, বুকে ধরিবে, হেন পুরুষ ই পিথিমীতে কে? কোথায় আছে? আছে ওই নাগবিদ্যায় সিদ্ধ নাগু ঠাকুর। নাগ-লোকে নর গেলে পরে পরান নিয়া ফেরে না। নাগলোকের বাতাসে বিষ—মানুষ ঢল্যা পড়ে যায়, নাগলোকের দংশনে পরান যায়। কিন্তু বীরপুরুষের যায় না। পাণ্ডব অর্জ্জুন নাগরাজার কন্যেকে দেখেছিল—মা গঙ্গার জলে, কন্যেকে পাবার তরে হাত বাড়ালে, কন্যে হেসে ডুব দিলে জলে! বীরপুরুষও ডুবল। এস্যা উঠল নাগলোকে। বিষ-বাতাসে সে ঢল্যা পড়ল না, সে বাতাসে তার পরানে মধুর মদের নেশা ধরায়ে দিলে। নাগলোক এল হাঁ-হাঁ ওরে, বীরপুরুষ যুদ্ধ করে কন্যেকে জয় করে লিলে। নাগু ঠাকুর হামরার তাই। সে চলে গেল, হামরার নয়নদুটি তার পথের পানে না-ফির্যা থাকে কি ক'রে কও? তাকায়ে ছিলম তার পথের পানে। রাঢ়ের পথ, মা-গঙ্গার কূল থেকে চল্যা

গিয়াছে পচি মুখে। দুইধারে তালগাছের সারিও চলে গিয়েছে—আঁকাবাঁকা পথের দুই ধারে—এঁকে বেঁকে। সুয্যি ঠাকুর তখুন পাটে বসেছে, তার লাল ছটা সেই তালগাছের সারির মাথায় মাথায় রঙের ছোপ বুলায়ে দিয়েছে; চিকণ পাতায় পাতায় সে পিছ্‌লে পিছ্‌লে পড়ছে। মাটির ধুলোতে তার আভা পড়েছে। তালগাছের পাতায় লেগেছে লাল ছটা। ওদিকে মাঠে তিল ফুলের বেগুনে রঙে পড়েছে লাল আলোর রঙ। নাগু ঠাকুর সেই পথ ধর‍্যা চল‍্যা গেল। মুই অভাগিনী রইলম খালি পথের পানে তাকায়ে। হুঁস আমার ছিল না। হুঁস হ'ল, কে যেন ঘাড়ে ধ'রে দিলেক ঝাঁকি!

ঝাঁকি দিলে গঙ্গারাম।

কুৎসিত হাসি হেসে সে বললে—চাঁপার ফুল ফুটল লাগছে! এ্যাঁ?

চাঁপার ফুলের অর্থ ধন্বন্তরি ভাই জানে কি-না প্রশ্ন করলে পিঙলা। শিবরাম হাসলেন। মৃদুস্বরে বললেন—জানি।

শিবরাম জানবেন বৈকি। তিনি যে আচার্য ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্য। তিনি গ্রামের মানুষ, শুধু গ্রামের মানুষ নন, গ্রামের যে মানুষ ভূমিকে জানে, নদীকে জানে, বৃক্ষকে জানে, লতাকে জানে—ফল ফুল ফসলকে জানে, কীট-পতঙ্গ জীব-জীবনকে জানে—সেই মানুষ। তিনি জানেন, নাগমিলন-তৃষাতুরা নাগিনীর অঙ্গসৌরভ ওই চাঁপার গন্ধ। প্রকৃতির নিয়মে অভিসারিকা নাগিনীর অঙ্গখানি সৌরভে ভরে উঠবে, চম্পকগন্ধা তার প্রেমের আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দেবে—অন্ধকার লোকের দিকে দিকে!

পিঙলা বলে—না-না। হ'ল না। তুমি জান না ধন্বন্তরি ভাই। সে বলে—অভিসারিকা নাগিনী চম্পকগন্ধা বটে, এ কথাটা ঠিক, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম নাকি বললে না? ও কথাটার অর্থ কি সে তা জানে

না, তবে মূল তথ্যটা তা নয়। কালো কানাই গো, কালো কানাই, কালিন্দীর কূলে ব্রজধাম, সেখানের মাটিতে উদয় হয়েছিল—কালো চাঁদের। সেই কানাই এর কারণ। শোন, গান শোন।

বিচিত্র বেদের মেয়ে, মাথার উপরে ঝড়ো আকাশ, বাতাসের এক-টানা সোঁ সোঁ শব্দ, তারই সঙ্গে যেন সুর মিলিয়ে গান ধরে দিলে—

কালীদহের কূলে ব'সে, সাজে, ও কার ঝিয়ারী
ও তো নয় কো গৌর বরণী রাধা বধূ শ্যামপিয়ারী।
ও-কার ঝিয়ারী ?

সাজিছে যে তার দেহের বর্ণ কালো। কালো কানাইয়ের বর্ণের আলো আছে, কানাই কালো—ভুবন আলো করে, এ মেয়ের কালো রঙে আলো নাই কিন্তু চিকন বটে! ও হ'ল কালীয় নাগনন্দিনী কালীদহের কূলে মনোহর সজ্জায় সেজে বসে আছে।

ও খোঁপায় পরেছে চাঁপা ফুল—গলায় পরেছে চম্পক মালা! বসে আছে সে কদম্ব তলার দিকে চেয়ে।

ওরে নিঠুর কালীয়া, কি অগ্নি জ্বালালি বুকে—কি বিষম জ্বালা!
আমার বুকের বিষ—জ্বল্যা জ্বল্যা জ্বল্যা হইল মধু!
বিষের পাত্রে মধু আমার খাইয়া যাওরে বঁধু!

ধূর্জটি কবিরাজের শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাভারতে হরিবংশে আছে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়নাগ দমনের কথা। পিঙলার সাঁতালী গাঁয়ের বেদেদের আছে আরও খানিকটা। ওরা বলে আরও আছে। বলে—নাগ শুধু হার মানেন নাই। বিষম যুদ্ধের পর নাগ বললেন—আমি মরব তবু হার মানব না। মানতে পারি এক সর্তে। সে সর্ত হ'ল তোমাকে আমার জামাই হতে হবে। আমার কন্যাকে বিয়ে করতে হবে। কুটিল কানাই

রাজী হলেন, কালীয়নাগের বিষ মাখানো অস্ত্রগুলি নিয়ে, মাথার মণি নিয়ে এই আসি বলে চলে গেলেন—আর এলেন না। চলে গেলেন মথুরা। সেখান থেকে দ্বারকা। ওরা বলে—সেই অবধি সন্ধ্যাকালে কালীদহের কূলে দেখা যেত এক কালো মেয়েকে। পরনে তার রাঙাশাড়ী, চোখে তার নিষ্পলক দৃষ্টি, দেহে তার লতার মত কমনীয় গঠন-লাবণ্য, সর্বাঙ্গে চম্পকাভরণ। সে কাঁদত। নিত্য কাঁদত।

এই কাহিনী ওদের গানে আছে, মুখে মুখে গল্পে আছে।

সন্ধ্যাবেলা এই কাহিনী শুনে, স্মরণ করে সাঁতালীর নাগিনী কন্যেরা চিরকাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বিরলে বসে গুন গুন করে অথবা নির্জন প্রান্তর-পথে উপকণ্ঠে সকরুণ সুরে ওই গান চিরকাল গেয়ে আসছে।

আমার বুকের বিষ জল্যা জল্যা জল্যা হইল মধু!

কালীদহের কূলে কৃষ্ণাভিলাষিনী ব্যর্থ অভিসারিকা কালীয় নাগ-নন্দিনীর চম্পক সজ্জার সৌরভ তার দেহসৌরভে পরিণত হয়েছিল। সেই বেদনাতুরা কুমারীকে দেখে নাকি অন্য সব পতিগর্রবিনী সোহাগিনী নাগকন্যারা হেসে ব্যঙ্গ করেছিল। সেই ব্যঙ্গ বেদনার উপর বেদনা পেয়ে কৃষ্ণাভিলাষিনী চম্পকগন্ধা কুমারী অভিশাপ দিয়েছিল, বলেছিল—এ কামনা কার না আছে সৃষ্টিতে? আমার সে কামনা দেহগন্ধে প্রকাশ পেয়েছে বলে যেমন ব্যঙ্গ করলি তোরা, তেমনি আমার অভিশাপে নাগিনী কুলে যার যখন এই কামনা জাগবে অন্তরে, তখনই তার অঙ্গ থেকে বার হবে এই গন্ধ। আমি কৃষ্ণাভিলাষিনী, আমার তো লজ্জা নেই, কিন্তু তোরা লজ্জা পাবি, শাশুড়ী-ননদ-শ্বশুর-ভাসুরের সংসারে, সংসারের বাইরে নাগপ্রধানদের সমাজে।

শিবরাম বলেন—ওদের পুরাণকথা ওরাই সৃষ্টি করেছে। আমাদের

পুরাণ সত্য হলে ওদের পুরাণকথাও সত্য। কিন্তু থাক সে কথা; পিঙলার কথাই বলি শোন।

পিঙলা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। বোধ হয় কালীয় নাগকুমারীর বেদনার কথা স্মরণ করে বেদনা অনুভব করছিল। বোধ হয় নিজের বেদনার সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিল।

শিবরাম বলেন—পিঙ্গলার চোখে সেইদিন প্রথম জল দেখলাম। পিঙ্গলার শীর্ণ কালো গাল দুটি বেয়ে নেমে এল দুটি জলের ধারা। তিনি বললেন—আজ থাক রে বহিন। আজ তুই স্নান ক'রে বাড়ী যা। এইবার বৃষ্টি আসবে।

পিঙলা আকাশের দিকে তাকালে।

মোটা মোটা টোপায় বৃষ্টি পড়তে শুরু হল। মোটা টোপা কিন্তু ধারাতে ঘন নয়, একটু দূরে দূরে পড়ছে, যেমন বৃষ্টি নামার শুরুতে অনেক সময় হয়। হিজলের জলে—মোটা টোপাগুলি সশব্দে আছড়ে পড়ে ঠিক যেন খই ফোটাচ্ছে, যেন পালিশ করা কালো পাথরের মেঝের উপর অনেকগুলো ছেনি হাতুড়ি দিয়ে কাটতে চেষ্টা করছে। পিঙলা কথার উত্তর না দিয়ে মুখ উঁচু ক'রে সেই বৃষ্টি মুখে নিতে লাগল।

শিবরাম উঠেছিলেন। পিঙলা মুখ নামালে, বললে—না গ ভাই, বস। ই জল হবে না। উড়ে চলেছে মেঘ, দু ফোঁটা দিয়া ধরম রেখ্যা গেল নিজের, আর হামরার চোখের জল ধুয়্যা দিয়া গেল। বস, শুন। হামরার কথা শুন্যা যাও।

"—জান ভাই ধন্বন্তরি, একজনার অমৃতি অন্যজনের বিষ। গরল পান কর‍্যা শিব মৃত্যুঞ্জয়, দেবতারা অমর হন সুধা পান কর‍্যা। রাম-

গীতের কথায় আছে; রামের বাবা দশরথকে অন্ধক মুনি শাপ দিলে, কি, পুত্যশোকে মরণ হবে। শাপ শুন্যা রাজা নাচতে লাগল। কেনে? নাচ কেনে রাজা? না—ই যে হামরার আশীর্বাদ, হামরার বেটা নাই, বেটা হোক—তবে তো বেটার শোকে পরানটা যাবে! কালী-নাগের কন্যে কানাই গরবিনী শাপ দিলেক—সে শাপ নাগিনীদের লাজের কারণ হইল কিন্তুক তাতেই নাগিনী হইল মোহিনী। তাদের অঙ্গগন্ধে নাগেরা হইল পাগল। আর সাঁতালীর নাগিনী কন্যের ওই হইল সব্বনাশের হেতু, পরানের ঘরের আগুন,—সে আগুন ঘরে লাগলে ঘরের সাথে নিজে সমেত পুড়্যা ছারখার হয়্যা যায়! নাগিনী কন্যের অঙ্গে চাঁপার বাস ফুটলে—কন্যে হয় মরে, নয়তো কুলে কালী দিয়া বেদেকুলে পাপ চাপায়ে অকুলে ভাসে। জান তো শবলার কথা! নাগিনী কন্যের অঙ্গে চাঁপার বাস।—অভিশম্পাত, এর চেয়ে বড় গাল আর হয় না। বেদে ঘরের বউ কি কন্যের সকল পাপ জরিমানায় মাপ হয়, রাত কাটায়ে সকালে বেদের বউ কন্যে ঘরকে ফেরে, বেদের মরদ তার অঙ্গটা ছেঁচ্যা দেয় ঠেঙার বাড়ি দিয়া, কিন্তু ছাড়-বিড় নাই, জরিমানা দিয়া দিল্যাই সব মাজ্জনা; যদি গেরস্ত কেউ সাক্ষী দেয় কি রাতে তার বাড়ীতে তার আশ্রয়ে ছিল, তবে জরিমানাও লাগে না। কিন্তু নাগিনী কন্যের বেলা তা নয়। তার সাজা—পরানটা দিতে হয়! তাই ওই পাপীটা, ওই শিরবেদেটা যখন কইলো—কি চাঁপার ফুল ফুটলো লাগছে!—এ্যাঁ? তখুন হামরার পায়ের নখ থেক্যা মাথার চুল পয্যন্ত বিদ্যুত লল্‌প্যা গেল।"

মুহূর্তে তার রূপ পালটে গেল।

সে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন। স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টি—নিষ্কম্প দেহ, এক মুহূর্তে কন্যা যেন সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছে। বাহিরের পৃথিবীতে সব

যেন হারিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে। হিজল বিল, সাঁতালীর ঘাসবন, সামনের বেদেরা—কেউ নাই, কিছু নাই।

বুকের ভিতর কোথায় ফুটন্ত চাঁপার ফুল ফুটেছে চাঁপার ফুল? কই? কোথায়? কোথায়?

না। মিছে কথা। পিঙলা চীৎকার ক'রে উঠল। আপনার মন তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রে দেখে সে নিজেকে অপরাধিনী মনে করতে পারলে না। কই? নাগু ঠাকুরের ওই গৌরবরণ বীরের মত দেহখানা দেখে তার তো বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার কামনা হয় নাই! ওই তো নাগু ঠাকুর চলে গেল—কই, তার তো ইচ্ছে হ'ল না সাঁতালীর আটন ছেড়ে, সাঁতালীর বেদেদের জাতিকুল ছেড়ে ঠাকুরের সঙ্গে ওই তালগাছ-ঘেরা পথ দিয়ে চলে যায় নিরুদ্দেশে। তার চলে যাওয়া পথের পানে তাকিয়ে সে ছিল, এ কথা সত্য, কিন্তু এমন যে বীরপুরুষ—তার পথের পানে কে না তাকায়? সীতা সতীর স্বয়ম্বরে ধনুকভাঙার পণ ছিল। মহাদেবের ধনুক। রামচন্দ্র যখন ধনুক ভাঙবার জন্য সভায় ঢুকলেন—তখন সীতা সতী রাজবাড়ীর ছাদের উপর থেকে তাকে দেখে তার পানে তাকায়ে থাকে নাই? মনে মনে শিবঠাকুরকে ডেকে বলে নাই—হে শিব, তুমি দয়া করো, তোমার ধনুককে তুমি পাখীর পালকের মত হালকা ক'রে দিয়ো, কাশের কাঠির মত পল্‌কা করে দিয়ো যেন রামচন্দ্রের হাতে ধনুকখানা ভেঙে যায়! মনে মনে বলে নাই—মা মঙ্গলচণ্ডী, রামচন্দ্রের হাতে দিয়ো বাসুকী নাগের হাজার ফণার বল, যে বলে সে পৃথিবীকে ধরে থাকে মাথায়—সেই বল, আর বুকে দিয়ো অনন্ত নাগের সাহস, যে সাহসে প্রলয়ের অন্ধকারে দিকবিদিক মুছে গেলে ডুবে গেলে একা ফণা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে—কাল সমুদ্দুরের মাঝখানে,—সেই সাহস! তাতে কি অপরাধিনী হয়েছিলেন সীতা সতী? রামচন্দ্রকে চোখে—পরানে

ভাল লেগেছিল তাই কথাগুলি কয়েছিলেন,—ভগবানও কান পেতে সে কথা শুনেছিলেন। ধনুকভাঙার আগে তো সীতা ফুলের মালা গাছাটা রামের গলায় পরায়ে দেন নাই! পিঙলাও দেয় নাই। সে শুধু তার পথের পানে চেয়ে বলেছে—ভগবান, ঠাকুরের প্রতিজ্ঞা পূরণ কর, সে যেন এই অভাগিনী বন্দিনী কন্যার মুক্তির আদেশ নিয়ে ফিরে আসে। বিধাতার শিলমোহর করা—মা বিষহরির হাতের লেখা ছাড়পত্র সে যেন আনতে পারে।

চোখের ভাললাগা, মনের ভাললাগা—এর উপরে হাত নাই; কিন্তু সে ভাললাগাকে—সে তো কুলধরমের চেয়ে বড় করে নাই, তাকে সে লঙ্ঘন করে নাই! সে এক জিনিস—আর বুকের মধ্যে চাঁপা ফুল ফোটা আর এক জিনিস। সে ফুল যখন ফোটে, তখন বুকের গঙ্গায় বান ডাকে; সাদা ফটিকের মত জল—ঘোলা ঘোরালো হয়, ছলছল ডাক—কলকল রব তোলে, কূল মানে না, বাঁধ মানে না,—সব ভেঙে চুরে ভাসিয়ে চলে যায়। স্বর্গের কন্যে মর্তে নেমে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাত সমুদ্রের নোনা জলে।

তবে?

না—মিছে কথা। সে চীৎকার ক'রে উঠল—না না-না। শিবরাম বলেন—আমি মনশ্চক্ষে দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে পিঙলার সমস্ত দেহ—পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল; কালবৈশাখীর ঝড়ে আন্দোলিত ঝাউগাছের মত প্রবল অস্বীকৃতির দোলায় দুলে উঠল। তারই ঝাপটায় তার মাথার চুলের রাশি খুলে এলিয়ে পড়ল। চোখ দুটো হয়ে উঠল প্রখর—তার মধ্যে ফুটে উঠল উন্মাদ ক্রোধের ছটা।

উন্মাদ রোগ তখন পিঙলাকে আক্রমণ করেছে।

পিঙলা বললে—ধন্বন্তরি ভাই, মুখে কইলাম, মনে ডাকলম বিষহরিকে। তারে ডেক্যা কইলম—জন্মুনী, তুমার বিধান যদি মুই লঙ্ঘন কর‍্যা থাকি, বুকের চাঁপার গাছে জল ঢেল্যা ঢেল্যা যদি চাঁপার ফুল ফুটায়ে থাকি—তবে তুমি কও। তুমার বিচার তুমি কর। হোক্‌ সেই বিচার। সে পাগলের মত ছুটল। নাগু ঠাকুরকে যে ঘরে বেঁধে রেখেছিল—সেই ঘরের দিকে। নাগু ঠাকুরের বাঁধন সে-ই নিজে হাতে খুলে দিয়েছে। তার চোখের সামনে নাগু ঠাকুর চলে গিয়েছে। তার সেই মহানাগের ঝাঁপি সে নিয়ে যায় নাই, সেটা পড়ে আছে সেই ঘরে।

বেদের দল বুঝতে পারে নাই; বিস্মিত হয়েছিল—ওদিকে কোথায় চলেছে কন্যা।

পিঙলা তুলে নিয়ে এল সেই ঝাঁপি। বিষহরির আটনের সামনে ঝাঁপিটা নামিয়ে চীৎকার করে উ ল—বিচার কর মা বিষহরি জন্মুনী—তুমি বিচার কর।

সমস্ত সাঁতালী আতঙ্কে শিউরে উঠল। কন্যা, এ কি করলে? কিন্তু উপায় নাই। আটনের সামনে এনে যখন নাগের ঝাঁপি পেতে—বিচার চেয়েছে—তখন উপায় নাই! মেয়েরা অস্ফুট শব্দ করে উঠল—ও মা গ!

সুরধুনী চেঁচিয়ে উঠল—কন্যে!

পুরুষেরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে এ ওর মুখের দিকে চাইলে! গঙ্গারাম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে কি যেন একটা খেলে যাচ্ছে। যেন হিজল বিলের গভীর জলের তলায় কোন জলচর নড়ে নড়ে উঠছে। ভাদু দাঁড়িয়ে আছে—তার চোখে যেন আগুন লেগেছে। সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠেছে—হাতে কপালে শিরাগুলো মোটা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

পিঙলা হাঁপাচ্ছে, চোখে তার পাগলের চাউনি। বারবার মাথায়

এলানো চুল মুখে এসে পড়ছে। সে হাত দিয়ে সরালে না সে চুল, মাথা ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে পিঠে ফেললে সে চুল। খুলে দিলে উর্ধ্বাঙ্গের কাপড়, আঁচলখানা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, সে ক্ষিপ্র হাতে খুলে দিলে সেই মহানাগের ঝাঁপি। কামাখ্যা পাহাড়ের শঙ্খচূড়। বসল হাটুগেড়ে নগ্ন বক্ষ পেতে।

নাগিনী কন্যা যদি চম্পকগন্ধা হয়ে থাকে, যদি তার অঙ্গে অঙ্গে নাগ-সাহচর্য-কামনা জেগে থাকে, তবে ওই নাগ তাকে সাদরে বেষ্টন করে ধরবে; পাকে পাকে কন্যার অঙ্গ বেষ্টন ক'রে মাথার পাশে তুলবে ফণা। না হলে নাগ তার স্বভাব ধর্মে মারবে তাকে ছোবল; ওই অনাবৃত বক্ষে পড়বে সে ছোবল।

নাগু ঠাকুরের নাগ—তার বিষ আছে কি গালা হয়েছে সে জানে নাগু ঠাকুর।

মুহূর্তে মাথা তুলে দাঁড়াল হিংস্র শঙ্খচূড়।

সামনে পিঙলা বসেছে বুক পেতে। সাপটার ফণা তার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। সেটা পিছন দিকে হেলছে, জিভ দুটো লক্‌লক্ করছে, স্থির কালো দুটো চোখ পিঙ্গলার মুখের দিকে নিবদ্ধ। হেলছে পিছনের দিকে···বুকটা চিতিয়ে উঠছে, মারবে ছোবল। বেদেদের চোখ মুহূর্তে ধরে নিয়েছে সাপের অভিপ্রায়। কন্যাকে জড়িয়ে ধরতে চায় না, দংশন করতে চায়। পিঙ্গলার চোখে বিজয়িনীর দৃষ্টি—তাতে উন্মাদ আনন্দ ফুটে উঠেছে। সে চীৎকার ক'রে উঠল—আয়! পড়ল নাগ ছোবল দিয়ে। অসমসাহসিনীর দুই হাত মুহূর্তে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হ'ল নাগটার ফণা লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্যে লুফে নেওয়ার মত গ্রহণ করবে। কিন্তু তার আগেই সাঁতালীর বিষবেদেদের অগ্রগণ্য ওস্তাদ ভাদু তার হাতের লাঠিটা দিয়ে আঘাত করেছে সাপটার ঠিক গলার নীচে; সে আঘাত

এমনি ক্ষিপ্র, এমনি নিপুণ এবং এমনি অব্যর্থ যে সাপটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ল পিঙ্গলার পাশে মাটির উপর—শুধু তাই নয়—ধরাশায়ী সাপটার গলার উপর কঠিন চাপে চেপে বসল ভাদুর সেই লাঠি।

বেদেরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

সুরধুনি পিঙলার স্খলিত আঁচলখানা তুলে তার অঙ্গ আবৃত ক'রে দিয়ে বাঁকা দৃষ্টিতে গঙ্গারামের দিকে তাকিয়ে বললে—পাপী! পাপী কুথাকার!

গঙ্গারাম শিরবেদে, সাঁতালীর একচ্ছত্র মালিক, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা; তার ভয় নাই। সে ঘাড় নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

(সাত)

পিঙ্গলা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তার কাহিনী বলতে বলতে। একটা ছেদ পেয়ে সে থামলে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আঃ—মা—

শিবরাম বলেন—কুপিত বায়ু ঝড়ের রূপে উড়িয়ে নিয়ে চলে মেঘের পুঞ্জ, ভেঙে দিয়ে যায় বনস্পতির মাথা;—তারপর এক সময় আসে তার প্রতিক্রিয়া। সে শ্রান্ত হয়ে যেন মন্থর হয়ে পড়ে। শীতল হয়ে আসে। পিঙ্গলারও সে সময়ের অবস্থা ঠিক তাই হয়েছিল। অবসাদে সে ভেঙে পড়ল যেন। উত্তেজনার উপাদান তার ফুরিয়ে গিয়েছিল।

একটু থেমে সেদিনের স্মৃতিপটের দিকে তাকিয়ে ভাল ক'রে স্মরণ ক'রে বলেন—বিশ্বপ্রকৃতিও যেন সেদিন পিঙ্গলার কাহিনীর সঙ্গে বিচিত্র-ভাবে সাম্য রেখে পটভূমি রচনা করেছিল।

ঊর্ধ্বাকাশে যে ঝড় চলছিল—সে ঝড় পার হয়ে চলে গেল। গঙ্গার পশ্চিম কূলকে পিছনে রেখে গঙ্গা পার হয়ে পূর্ব দিকে চলে গেল। কালো মেঘের পুঞ্জ আবর্তিত হ'তে হ'তে প্রকৃতির কোন বিচিত্র প্রক্রিয়ায়—টুকরো টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল ছিন্নপক্ষ জটায়ুর মত; কালো মেঘস্তরেরও পিছনে ছিল একটা সাদা মেঘের স্তর, তারি বুকে ভাসতে লাগল; এদিকে পশ্চিম দিগন্ত থেকে আবার একটা মেঘস্তর উঠে এগিয়ে আসছে। এ স্তরটা শূন্যমণ্ডলের নিচে নেমে এসেছে। ধূসর মন্থর একটি মেঘস্তর পশ্চিম থেকে আসছে, বিস্তীর্ণ হচ্ছে উত্তর-দক্ষিণে। যেন জটায়ু সম্পাতির কোন অজ্ঞাতনামা সহোদর। সে তার বিশাল পক্ষ দুখানিকে উত্তরে এবং দক্ষিণে দিগন্ত পর্যন্ত আবৃত করে বেদনার্ত বুকে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলেছে—ছিন্নপক্ষ জটায়ুর সন্ধানে।

পাখার বাতাসে বাজছে তার শোকার্ত স্নায়ুমণ্ডলীর ধ্বনি, মিশে রয়েছে তার স্পর্শে। সজল শীতল মন্থর বাতাসে ভেসে আসছে ধূসর মেঘস্তর-খানি। অতি মৃদু রিমিঝিমি বর্ষণ ক'রে আসছে। কুয়াসার মত সে বৃষ্টি।

হিজলের সর্বত্র এই পরিবর্তিত রূপের প্রতিফলন জেগে উঠল। কিছুকাল পূর্বের ঝড়ের রুদ্রতাণ্ডবে জলে স্থলে ঝাউবনে ঘাসবনে মেশানো এই বিচিত্র ভূমিখণ্ডের সর্বাঙ্গে—অকাল রাত্রির আসন্নতার মত যে কুটিল কৃষ্ণ ছায়া নেমেছিল, যে প্রচণ্ড আক্ষেপ জেগেছিল—ক্ষণিকে তার রূপান্তর হয়ে গেল।

শিবরামের মনে পড়ল মনসার ব্রতকথা।

কাহিনীর বণিক-কন্যা দক্ষিণ দুয়ার খুলে আতঙ্কে বিষনিশ্বাসে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল; সে দেখলে বিষহরির বিষম্ভরী রূপ, নাগাসনা, নাগভূষণা, বিষপানে কুটিল নেত্রা নাগকেশী—রুদ্ররূপ—বিষসমুদ্র উথলিত হচ্ছে। পড়ল সে ঢলে। মুহূর্তে রূপের পরিবর্তন হল। দেবী এলেন শান্ত রূপে, সস্নেহ স্পর্শ বুলিয়ে জুড়িয়ে দিলেন বিষবাতাসের জ্বালা!

হিজলবিলের জলে ঢেউ উঠেছিল। তার রঙ হয়েছিল বিষের মত নীল।

এখন সেখানে ঢেউ থেমে গিয়েছে, থর থর ক'রে কাঁপছে, রঙ হয়েছে ধূসর, যেন কোন তপস্বিনীর তৈলহীন রুক্ষ কোঁকড়ানা একরাশি চুল—তার শোভায় উদাস বিষণ্ণতা। ঝাউবনের ঘাসবনের মাথাগুলি আর প্রবল আন্দোলনে আছড়ে পড়ছে না, স্থির হয়েছে, কাঁপছে, মন্থর সোঁ-সোঁ শব্দ উঠছে বিষণ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসের মত।

পিঙ্গলা ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়ল ঘাসবনের উপর। মুখে তার ফিন্‌ফিনে বৃষ্টির ধারা ঝরে পড়ছিল।—সে চোখ বুজে বলল—আঃ—দেহখানা জুড়াল গ!

সত্যই দেহ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। জ্যৈষ্ঠের সারাদিনের প্রচণ্ড উত্তাপের পর এই ঠাণ্ডাবাতাসে এই ফিন্‌ফিনে বৃষ্টিতে শিবরামও আরামে চোখ বুজলেন। এ বর্ষণ সিঞ্চনে যেন মাধুরীর স্পর্শ আছে।

—এইবারে দুখিনী বহিনের, মন্দভাগিনী বেদের কন্যের গোপন দুখটা শুন হামরার ধরম ভাই; শবলা দিদি, গঙ্গার কূলে দাঁড়ায়ে বিষহরিরে সাক্ষী রেখ্যা তুমার সাথে ভাই-বহিন সম্বন্ধ পাতালছে। হামরাকে বল্যা গেলছে, যে-দুখের কথা কারুখে বুলতে লারবি, সে কথা বুলিস ওই ভাইকে। বুকের আঙার বুকে রাখিলি বুক পোড়ায়, অন্যেরে দিলি পরে ওই আঙার তুর ঘরে দিয়া তুকেই পুড়ায়ে মারে। ই আঙার দিবার এক ঠাঁই হ'ল বিষহরির চরণ; তা—বিষহরি নিদয়া হলছেন, দেখা দেয় না। আর ঠাঁই—, মুই অ্যানেক ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে এই ঠাঁই পেয়েছিরে পিঙলা, ওই ধরমভাইয়ের ঠাঁই;—এই আঙার তারে দিস, তুর পরানটা জুড়াবে, কিন্তুক অনিষ্ট হবে নাই। হামরার বুকের আঙার তুমি লাও, ধর ভাই!

পিঙলার ঠোঁট দুটি থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। চোখের কোণে কোণে জল টলমল করে উঠল। সে স্তব্ধ হয়ে গেল। আবেগে সে আর বলতে পারছিল না।

অপেক্ষা করে রইলেন শিবরাম। অন্তরে অন্তরে শিউরেও উঠলেন। কি বলবে পিঙলা? সে কি তবে দেহ-প্রবৃত্তির তাড়নায় নাগিনী কন্যার ধর্ম বিসর্জন দিয়ে—? শবলা তাকে বলেছিল—এই প্রবৃত্তি যখন উগ্র হয়ে ওঠে, তখন উন্মাদিনীর মত তারা নিশীথ রাত্রে ঘুরে বেড়ায় হিজলের ঘাস বনে। বাঘের হাতে জীবন যায়, হাঙরমুখীর খালে শিকার প্রতীক্ষমান কুমীর অতর্কিতে পায়ে ধরে টেনে নেয়; নিশীথ রাত্রে

হিজলের কূলে শুধু একটা আর্তচীৎকার জেগে ওঠে। আবার কেউ শোনে বাঁশী। দূরে হিজলের মাঠে চাষীরা কুঁড়ে বেঁধে থাকে, মহিষগরুর বাথান দিয়ে থাকে শেখেরা ঘোষেরা, তারা বাঁশী বাজায়। সে বাঁশী শুনে নাগিনী কন্যা এগিয়ে যায়, সুরের পথ ধরে।

শবলা বলেছিল—তার থেক্যা বড় সব্বনাশ আর হয় না ধরমভাই! সেই হইল মা বিষহরির অভিশাপ! তাতে হয় পরানটা যায়—লয় ধরম যায়—জাতি যায়, কুল যায়।

পিঙ্গলা আত্মসম্বরণ করে চোখের জল মুছলে—তারপর অতি মৃদুস্বরে বললে, এখানে এই জনহীন হিজল বিলের বিষহরির ঘাটে স্বর মৃদু করবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু পিঙ্গলার বোধ হয় কীটপতঙ্গ, পশুপাখী, গাছপাতাকেও ভয়—তাই বোধ হয় মৃদু স্বরে বললে—কিন্তুক ভাই, এইবার যে হামরার বুকে চাঁপা ফুল ফুটল!

চমকে উঠলেন শিবরাম।

পিঙ্গলা বললে—হামরার ঘরে, রাত্রি দুপহরে—চাঁপার ফুলের বাস ওঠে। ঘরটা যেন ভর‍্যা যায় ভাই। মুই থরথর কর‍্যা কাঁপতে থাকি। পেথম যেদিন বাসটা নাকে উঠল ভাই—সেদিনে মুই যেন পাগল হয়্যা গেলম। ঠিক তখুন রাত দুপহর। হিজলের মাঠে শিয়ালগুলান ডেক্যা উঠিল, সাঁতালীর পশ্চিম দিকে—রাঢ়ের পথটার দুধারের তালগাছের মাথায় মাথায় পেঁচা ডেকে ই গাছ থেক্যা উ গাছে গিয়া বসিল। সাঁতালীর উত্তরে হুইখানে আছে বাদুড়ঝুলির বটগাছ, শ দরুনে বাদুড় সেথা দিনরাত্রি ঝুলে, চ্যাঁ-চ্যাঁ রবে চিল্লায়, সে গুলান—জোরে চেঁচায় রব তুল্যা—একবার পাখা ঝটপট কর‍্যা আকাশে পাক খেলে। ঘরের মধ্যি ঝাঁপিতে সাপগুলান বারকয়েক ফুঁসায়ে উঠল। মুই পোড়াকপালী, হামরার চোখে ঘুম বড় আসে না ধরমভাই, সেই যে

বাবুদের বাড়ী থেক্যা ফিরলম—মোর মধ্যি কালনাগিনীর জাগরণ হইল, সেই থেক্যাই ঘুম হামরার নাই। তা পরেতে ঠাকুর এল—বল্যা গেল—হামরার খালাস নিয়া আসবেক ;—তখন থেক্যা বিদায় দিছি ঘুমেরে ; ঘরে পড়্যা থাকি পহর গুণি, কান পেত্যা শুনি—কত দূরে উঠছে পায়ের ধ্বনি। সেদিনে আপনমনে জেগ্যা জেগ্যাই ওই ভাবনা ভাবছিলাম। দু পহর এল, মনে মনে পেনাম করলম বিষহরিরে! এমন সময়—ধরমভাই—।

আবার কাঁপতে লাগল পিঙলার ঠোঁট। সকরুণ সজল দৃষ্টিতে সে শিবরামের দিকে তাকিয়ে রইল। তেজস্বিনী মেয়েটি যেন তেজশক্তি সব হারিয়ে ফেলে একান্ত অসহায়ভাবে শিবরামের কাছে আশ্বাস ভিক্ষা করছে—সাহস প্রার্থনা করছে।

ঠিক সেই মধ্যরাত্রির লগ্নটিতে নাগিনী কন্যা যদি জেগে থাকে তবে তাকে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে মনে মনে বিষহরিকে ডাকতে হয়। ওই লগ্ন নাগিনী কন্যার বুকে নিশির নেশা জাগিয়ে তোলে। কুহকমায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে।

খাঁচায় বন্দী বাঘকে দেখেছ মধ্যরাত্রে? এই লগ্নে? রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ করে নিশিঘোষণা বেজে ওঠে দিকে-দিকে, খাঁচার ঘুমন্ত বাঘ চকিত হয়ে জেগে ওঠে, ঘাড় তুলে রাত্রির অন্ধকারের দিকে তাকায়, আকাশের দিকে তাকায়, সে দৃষ্টি স্থির অথচ উত্তেজনায় অধীর। মুহূর্তে মুহূর্তে চোখের তারা বিস্ফারিত হয়, আবার সঙ্কুচিত হয়।

ঠিক তেমনি নিশির মায়ার উত্তেজনায় নাগিনী কন্যা আত্মহারা হয়। সাঁতালীর বিষবেদেদের কুলশাসনে বিধিবিধানে বার বার করে বলেছে

কন্যাকে—এই লগ্নে, কন্যা, তুমি সাবধান। যদি জেগে থাক, তবে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবে, মনে মনে মাকে স্মরণ করবে।

দ্বিপ্রহর এল সেদিন। রোজই আসে। ঘুম তো নাই পিঙলার চোখে। অনন্ত ভাবনা তার মনে। সে ভাবে—নাগিনী কন্যার ঋণের কথা, সে হিসাব করে জন্ম জন্ম ধ'রে কত নাগিনী কন্যা সাঁতালীর বেদে-কুলে জন্ম নিয়ে কত পূজা বিষহরিকে দিয়েছে, আজন্ম পতি-পুত্র ঘর-সংসারে বঞ্চিত থেকে, ব্রত তপস্যা করে বেদেকুলের মায়াবিনী কুহকিনী কন্যা বধূদের সকল স্খলনের পাপ ধুয়ে মুছে দিয়েছে। বেদেকুলের মান-মর্যাদা রেখেছে! তবু কি শোধ হয় নাই দেনা?

শোধের সংবাদ নিয়ে আসবে নাগু ঠাকুর। শোধ না হলে তো তার ফিরবার পথ নাই।

কাহিনীতে আছে—নদীর জলে ভেসে যায় সোনার চাঁপা ফুল। রাজা পণ করেছেন—ওই চাঁপার গাছ তাকে যে এনে দেবে তাকেই দেবেন তার নন্দিনীকে। রাজনন্দিনীকে রেখেছেন সাতমহলার শেষ মহলায়, মহলায় মহলায় পাহারা দেয় হাজার প্রহরী। রাজপুত্র আসে—তারা কন্যাকে দেখে—তারপর চলে তারা নদীর কূলে কূলে; কোথায় কোন্ কূলে আছে সোনার চাঁপার গাছ। চলে—চলে—তারপর তারা হারিয়ে যায়, পিছনের পথ মুছে যায়। সোনার চাঁপার গাছ যে পাবে খুঁজে—সে-ই পাবে ফিরবার পথ। পিঙ্গলার কাহিনীও যে ঠিক সেই রকম!

ঠাকুর কি ফিরবার পথ পাবে?

এমন সময় এল ওই মাঝরাত্রির ক্ষণ। পিঙ্গলা চকিত হয়ে উপুড় হয়ে শুল। মনে মনে স্মরণ করলে বিষহরিকে। সঙ্গে সঙ্গে বললে—মুক্তি দাও মা, দেনা শোধ কর জননী!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। এ কি? এ কিসের গন্ধ?

দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে একটি মিষ্ট মধুর গন্ধে তার বুক ভরে গেল। সে-শ্বাস আর বিষণ্ণ আক্ষেপে সে ফেলতে পারলে না; রুদ্ধশ্বাসে সে চমকে উঠল। ফুলের গন্ধ। চাঁপার গন্ধ! কোথা থেকে এল? নিশ্বাস ফেলে সে আবার শ্বাস গ্রহণ করলে!—মধুর গন্ধে বুক ভরে গেল।

ধড়মড় করে সে উঠে বসল।

কোথা থেকে আসছে এ গন্ধ? তবে কি—? সে বারবার শুঁকে দেখলে নিজের দেহ। গন্ধ আসছে—কিন্তু সে কি তার দেহ থেকে? না!

সে তাড়াতাড়ি আলো জ্বাললে। চকমকি ঠুকে খড়ের নুটিতে ফুঁ দিয়ে আগুন জেলে নিমফল পেষা তেলের পিদিম জেলে চারিদিক চেয়ে দেখলে। ধোঁয়ার গন্ধে ভরে উঠেছে খুপরি ঘরখানা, কিন্তু তার মধ্যেও উঠছে সেই মিষ্ট সুবাস।

কোথায় ফুটল চাঁপার ফুল?

সাঁতালীর কোথাও তো নাই চাঁপার গাছ! তবে?

তাড়াতাড়ি সে একটা ঝাঁপির উপর ঝুঁকে শুঁকে দেখলে। ঝাঁপি-টায় আছে একটা সাপিনী। ঝাঁপিতে বন্দী সাপিনীর অঙ্গে বাস বড় একটা ওঠে না; নাগিনীর মিলনের কালও এটা নয়; সে কাল আরম্ভ হবে বর্ষার শুরুতে; অম্বুবাচিতে মা-পৃথিবী হবেন পুষ্পবতী, কামরূপে পাহাড়ের মাথায় মা কামাখ্যা এলো চুলে বসবেন, আকাশ ঘিরে আসবে সাত সমুদ্রের জল নিয়ে সম্বর্ত পুষ্কর মেঘের দল; মাকে স্নান করাবে। নদীতে নদীতে তার ঢেউ আসবে। কেয়া গাছের কচি পাতার ঘেরের মধ্যে ফুলের কুঁড়ির মুখ উঁকি মারবে। সাপিনীর অঙ্গে অঙ্গে জাগবে আনন্দ। সে আনন্দ সুবাস হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। চাঁপার গন্ধ! নাগ-কুল উল্লসিত হয়ে উঠবে।

সে কাল তো এ নয়। এ তো সবে চৈত্রের শেষ।

গাজনের ঢাক বাজছে রাঢ়ের গাঁয়ে গাঁয়ে। শেষরাতে আজও বাতাস হিমেল হয়ে ওঠে; নাগ-নাগিনীর অঙ্গের জরার জড়তা আজও কাটে নাই। রাত্রির শেষ প্রহরে আজও তারা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শিব উঠবেন গাজনে, তাঁর অঙ্গের বিভূতির পরশ পেয়ে নাগ-নাগিনীর নবকলেবর হবে। নূতন বছর পড়বে; বৈশাখ আসবে, সাপ-সাপিনীর হবে নবযৌবন।

তবু সে ঝুঁকে পড়ে শুঁকলে সাপিনীর ঝাঁপিটা।

কোথায়? কই?—সাপিনীর সেই চিরকেলে কটু গন্ধ উঠছে।

তবে এ গন্ধ কোথা থেকে উঠছে? প্রদীপের সলতে উসকে দিয়ে আলোর শিখাকে উজ্জ্বলতর করে তুলে শঙ্কাতুর মনে দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে বসে রইল।

হঠাৎ একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। আজই সন্ধ্যায় গঙ্গারাম. বলেছিল। তখন মুখ বেঁকিয়ে ঘেন্নার দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল সে।'

দুদিন আগে গঙ্গারাম গিয়েছিল শহরে। কামাখ্যা মায়ের ডাকিনীর কাছে গঙ্গারাম শুধু যাদুবিদ্যা মোহিনীবিদ্যা বাণবিদ্যাই শিখে আসে নি, চিকিৎসা বিদ্যাও জানে সে। বেদেদের চিকিৎসা বিদ্যা আছে, সে বিদ্যা জানে ভাদু, নটবর, নবীন। সাঁতালীর আশপাশের গাছ-গাছড়া নিয়ে সে চিকিৎসা। জন্তু-জানোয়ারের তেল হাড় নিয়ে সে চিকিৎসা। নাগিনী কন্যার কাছে আছে জড়ি আর বিষহরির প্রসাদী নির্মাল্য, তাই দিয়ে কবচ মাদুলি নিয়ে সে চিকিৎসা। গঙ্গারামের চিকিৎসা অন্য রকম। ওষুদের মশলা সংগ্রহ ক'রে আনে সে শহর-বাজারের দোকান থেকে। ধন্বন্তরি ভাইদের কবিরাজী ওষুদের মত বড়ি পাঁচন দেয়। বিশেষ ক'রে

জ্বর-জ্বালায় গঙ্গারামের ওষুদ খুব খাটে। সেই মশলা আনতে সে মধ্যে মাঝে শহরে যায়। নিয়ে যায় শুশুকের তেল, বাঘের চর্বি, বাঘের পাজর নখ, কুমিরের দাঁত, শজারুর কাঁটা, আর নিয়ে যায় মা-মনসার অব্যর্থ ঘায়ের প্রলেপ মলম। নিয়ে আসে ওষুদের মশলা আর সঙ্গে চুড়ি, ফিতে, মাদুলির খোল, পুঁতির মালা সূচ-সুতো, বঁড়শি, ছুরি, কাটারি, কাঁকুই হরেক রকম জিনিস। গঙ্গরাম শিরবেদে সাঁতালী গায়ে নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেছে—শিরবেদে হয়ে বেনেতী বৃত্তি নিয়েছে।

ওই ব্যবসায়ে সে দুদিন আগে গিয়েছিল শহরে। ফিরেছে আজই সন্ধ্যায়। তখন মায়ের আটনের সামনে বেদেরা এসে জমেছে। হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ভাদু বাজাচ্ছে চিমটে, নটবর বাজাচ্ছে বিষম চাকি,—পিঙলা করছিল আরতি। গঙ্গারাম ফিরেই ধুলোপায়ে মায়ের থানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। মায়ের আরতি শেষ ক'রে—সেই প্রদীপ নিয়ে বেদেদের দিকে ফিরিয়ে পিঙলা বার কয়েক ঘুরিয়ে নামিয়ে দিলে। বেদেরা একে একে সেই প্রদীপের শিখার তাপে হাতের তালু তাতিয়ে নিয়ে কপালে স্পর্শ নেবে। গঙ্গারামের প্রথম অধিকার। সে এসে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল, ভুরু কুঁচকে বার দুয়েক ঘ্রাণ নেওয়ার মত ঘন ঘন শ্বাস টেনে—উঃ—শব্দ করেছিল, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেছিল কি ? কিসের বাস উঠছে লাগছে যেন ?

পিঙলার ঠোঁট দুটি বেঁকে গিয়েছিল ওই কুটিল লোকটার প্রতি অবজ্ঞায়। চাপা রাগে নাকের ডগাটা ফুলে উঠেছিল, চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল ঘেন্না; সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাকে কিছু বলতে হয় নাই; গঙ্গারামের পর অধিকার ভাদুর, সে এসে তাকে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—বাস উঠছে তুর নাসায়। বাস উঠছে! আলছিস শহর থেক্যা—পাকীমদ খেয়েছিস, তারই বাস—তুর নাসাতে বাসা বেঁধে

রইছে। লে সব্। ঢং করিস না। পিদিম নিভিয়ে যাবে। দাঁড়ায়ে আছে গোটা পাড়ার মানুষ।

গঙ্গারাম ভাদুর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে ফিরে চেয়ে—প্রদীপের তাপ কপালে ঠেকিয়ে সরে গিয়েছিল। তার পর পিঙলা লক্ষ্য করেছিল—সে একজায়গায় দাঁড়িয়ে ক্রমাগত শ্বাস টেনে কিসের গন্ধ নিয়েছে।

যাবার সময় পিঙলার দিকে তাকিয়ে একটু যেন—ঘাড় দুলিয়ে কিছু বলে গিয়েছে। শাসন, সন্দেহ, তার সঙ্গে যেন আরও কিছু ছিল।

পিঙলার ঠোঁট দুটি আবার বেঁকে গিয়েছিল।

এই নিশীথ রাত্রে এই ক্ষণটিতে হঠাৎ সেই কথা পিঙলার মনে পড়ে গেল। তবে কি তখন গঙ্গারাম এই গন্ধের আভাস পেয়েছিল? গঙ্গারাম পাপী, সে ভ্রষ্ট, সে ব্যভিচারী। জটিল তার চরিত্র, কুটিল তার প্রকৃতি। সে ডোমন করেত। বেদেপাড়ায় সে অবাধে চালিয়ে চলেছে তার পাপ। কিন্তু এক ভাদু ছাড়া বেদেদের আর কেউ তাকে কিছু বলতে সাহস করে না। আর পারে পিঙলা। আজ দীর্ঘ দশ বছর সে তার সঙ্গে লড়াই ক'রে আসছে। কিন্তু এতদিন কিছু করতে পারে নাই। এইবার তার জাগরণের পরে আশা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বেদেপাড়ায়ও খানিকটা সাহস দেখা দিয়েছে। তার জাগরণের ছোঁয়াচে তারাও যেন জেগেছে। ভাদুর সঙ্গে তারা দু-তিনবার গঙ্গারামের কথার উপর কথা বলেছে। কিন্তু গঙ্গারামের বাঁধন বড় জটিল। বেদেপাড়াকে সে শাসনের দড়িতে বাঁধে নাই, বেঁধেছে পয়সার দড়িতে, ধারের কড়িতে। গঙ্গারাম টাকা পয়সা ধার দেয়। সুদ আদায় ক'রে। মহাদেব শিরবেদেকে পিঙলার মনে আছে। সে কথায় কথায় টুঁটি টিপে ধরত। গঙ্গারাম তা ধরে না। গঙ্গারাম মানুষের ঘাড় নুইয়ে ধারের পাথর চাপিয়ে দেয়।

মানুষ মাটির দিক ছাড়া মুখের দিকে চোখ তুলতে পারে না। এই সুযোগে গঙ্গারাম বেদেদের ঘরে ঘরে অবাধে চালিয়ে যায় তার ব্যভিচার। এ আচার বেদেদের মধ্যে চিরকাল আছে। বেদের কন্যে অবিশ্বাসিনী, বেদের কন্যে মিথ্যেবাদিনী, বেদের কন্যে পোড়াকপালী পোড়ারমুখী, তার রঙ কালো কিন্তু তারও উপরে সে কালামুখী, বেদের কন্যে কুহকিনী; বেদের কন্যের আচার মন্দ, সে বিচারভ্রষ্টা। বেদের পুরুষও তাই। তবু এমন ছিল না কোন কালে! সাঁতালীর পাপের বোঝা চিরকাল নাগিনী কন্যের দুঃখের দহনে পুড়ে ছাই হয়েছে; তার চোখের জলে ধুয়ে গিয়েছে; এবার গঙ্গারামের পাপের বোঝা হয়ে উঠেছে পাহাড়, তাই তার জীবনে এত জ্বালা। এত জ্বালাতেও কিন্তু সে পাপের পাহাড় পুড়ে শেষ হচ্ছে না। তাই সময় সময় পাগলের মত হয়ে যায়। অজ্ঞান হয়ে পড়ে—বুকের নাগিনী—তার মুখ দিয়ে বলে—বিচার কর মা, বিচার কর। মুক্তি দাও! বলে—আমার মুক্তি হোক বা না হোক, ওই পাপীকে শেষ কর। কত দিন মনে মনে সংকল্প করেছে—শেষ পর্যন্ত নিজে সে মরবে কিন্তু ওই পাপীকে সে শেষ করবে।

সেই পাপী গঙ্গারাম—সে কি সন্ধান পেয়েছিল এই গন্ধের?

পাপী হলেও সে শিরবেদে। শিরবেদের আসনের গুণে পেয়েছিল হয় তো! ভোজরাজার আসন ছিল, সে আসনে যে বসত—সে-ই তখন হয়ে উঠত রাজার মত গুণী। তার উপর গঙ্গারাম ডাকিনী-বিদ্যা জানে।

সে জেনেছে, সে বুঝেছে, সে এ গন্ধের আভাস পেয়েছে সব চেয়ে আগে। তার অঙ্গে গন্ধের সন্ধান সে নিজে পায় নাই—শিরবেদে পেয়েছে আসনের গুণে।

সমস্ত রাত্রি সে আলো জ্বেলে বসে রইল। সকাল বেলা আবার একবার তন্ন তন্ন করে খুঁজলে ঘর—। কিসের গন্ধ! কোথা থেকে

আসছে গন্ধ! গন্ধ রয়েছে ঘরে কিন্তু কোথা থেকে উঠছে বা আসছে বুঝতে পারলে না। ঘর বন্ধ করে ছুটে এসে পড়ল বিলের জলে। সর্বাঙ্গ ধুয়ে সে ঘরে ফিরল। ঘরে তখনও গন্ধ উঠছে। তবে ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘরের দাওয়ার উপর শুয়ে অঙ্গ এলিয়ে দিলে। ঘুমিয়ে পড়ল।

আবার।

মধ্য রাত্রিতে আবার উঠল গন্ধ।

পিঙলা ধড়মড় করে উঠে বসল। আলো জ্বাললে। মদির গন্ধে ঘর ভরে উঠেছে। তার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে। চাঁপা ফুল কোথায় ফুটেছে? তার বুকে? নইলে এই লগ্নে—কেন উঠছে সে গন্ধ?

উন্মাদিনীর মত সে নিজেই নিজের দেহগন্ধের শ্বাস টানতে লাগল। কিছু বুঝতে পারলে না, কিন্তু আছাড় খেয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ডাকলে দেবতাকে।

—হামরার পাঁপ তুমি হরণ কর জননী, কন্তের শরম তুমি ঢাক মা। ঢেক্যা দাও। মুখ রাখ।

* * *

—"মনে মনে শুধু জননীরেই ডাকি নাই ধন্বন্তরি ভাই। তারেও ডাকি।" শীর্ণ মুখ তার চোখের জলে ভিজে গিয়েছিল। শিবরামের চোখেও জল এসেছিল। বায়ুরোগপীড়িতা মেয়েটির কষ্টের যে অন্ত নাই, মস্তিষ্ক থেকে হৃদ্‌পিণ্ড পর্যন্ত অহরহ এই যন্ত্রণায় নিপীড়িত হচ্ছে, সে তথ্য ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্যটির অনুমান করতে ভুল হয় নাই এবং যে যন্ত্রণার পরিমাণও তিনি অনুভব করতে পারছিলেন। সেই অনুভূতির জন্যই চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর।

চোখের জলে অভিষিক্ত বেদনার্ত শীর্ণ-মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, পিঙলা বললে—তারে ডাকি। নাগু ঠাকুরকে। সে যদি মুক্তির আদেশ আনে—তবে তো মুই বাঁচলম। লইলে মরণ। হামরার বুকে চাঁপা ফুল ফুটিছে, ই লাজের কথা দশে জানার আগে মুই মরব। কিন্তুক আগুন জ্বালায়ে যাব। আগুন জ্বালাব নিজের অঙ্গে—সেই আগুনে—। পিঙলার দুপাটি দাঁত সেই মেঘচ্ছায়াছন্ন অপরাহ্নে কালো মুখের মধ্যে বিদ্যুতের মত ঝলকে উঠল। শিবরাম আশঙ্কা করলেন—এইবার হয় তো চীৎকার করে উঠবে পিঙলা। কিন্তু তা করলে না সে। উদাস নেত্রে চেয়ে রইল সম্মুখের মেঘমেদুর আকাশের দিকে। কিছুক্ষণ পর সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল। বললে—দুখিনী বহিনের কথা শুনলা ভাই; যদি শুন বহিন মরেছে তবে অভাগিনীর তরে কাঁদিও। আর যদি মুক্তি আসে—।

একটি প্রসন্ন হাসিতে তার শীর্ণ মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বললে—দেখা করিব। তুমার সাথে দেখা করিব। মুক্তি আসিলে তোমার সঙ্গে দেখা করিব। এখুন—যাও ভাই, আপন লায়ে। মুই জলে নামিব।

এতক্ষণ অভিভূতের মতই বসেছিলেন শিবরাম। চিকিৎসকের কৌতূহল আর ওই বন্য আদিম মানুষের একটি কন্যার অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন-কাহিনীর বৈচিত্র্য তাঁকে প্রায় মুগ্ধ করে রেখেছিল। শেষ হতেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি উঠলেন।

একদিন—সে দিনের খুব দেরি নাই; পিঙলার মস্তিষ্কের কুপিত বায়ু হতভাগিনীকে বদ্ধ উন্মাদ ক'রে তুলবে। সর্বত্র এবং অহরহ সে অনুভব করবে চাঁপার গন্ধ। শঙ্কিত ত্রস্ত হয়ে সে গভীর নির্জনে লুকিয়ে থাকবে। হয়তো ওই কল্পিত গন্ধ ঢাকবার জন্য দুর্গন্ধময় পঙ্ককে মাখবে চন্দনের মত আগ্রহে।

—ভাই! অ ধন্বন্তরি ভাই! পিছন থেকে ডাকলে পিঙলা। কণ্ঠস্বরে তার উত্তেজনা; —উল্লাস!

ফিরলেন শিবরাম। দেখলেন দ্রুতপদে প্রায় ছুটে চলেছে পিঙলা। পিঙলা আবার একবার মুহূর্তের জন্য মুখ ফিরিয়ে বললে—যাইয়ো না। দাঁড়াও!

সে একটা ঘন জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। শিবরাম ভ্রূ কুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি হ'ল? মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তাঁকে পাগল ক'রে তুলবে?

কিছুক্ষণ পর পিঙলা আবার বেরিয়ে এল জঙ্গলের আড়াল থেকে। তার হাতে ঝুলছে একটি কালো সাপ। সত্যকারের লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণসর্প।

—মিলেছে ভাই। মা বিষহরি হামরার কথা শুনিছেন। মিলিবে—আরও মিলিবে।

বেদেপাড়ায় তখন কোলাহল উঠছে। গঙ্গায় শুশুক পেয়েছে দুটো। গঙ্গারাম তার হলদে দাঁতগুলি বার ক'রে বললে—যাত্যা তুমার ভাল কবিরাজ। শুশুকের ত্যাল কালোসাপ অ্যানেক মিলিল এক যাত্যায়।

বিদায়ের সময় পিঙলা ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে জল টলমল করছিল, ঠোঁট দুটি কাঁপছিল। তারই মধ্যে ফুটেছিল—একটুকরা হাসি।

শিবরাম বললেন—এবার কিন্তু আমার ওখানে যাবে তোমরা। যেমন যেতে গুরুর ওখানে। আমাকে বিষ দিয়ে আসবে।

গঙ্গারাম বললে—উ কন্যে তো আর যাবে নাই ধন্বন্তরি, উয়ার তো মুক্তি আসিছে। হুই রাঢ়ের পথ দিয়া ঠাকুর গেলছে মুক্তি আনিতে। না—কি গ কন্যে?

পিঙলা লেজ মাড়ানো সাপিনীর মত ঘুরে দাঁড়াল।

গঙ্গারাম কিন্তু চঞ্চল হল না, সে হেসে বললে—আসিছে, সে আসিছে। চাঁপা ফুলের মালা গলায় পর‍্যা সে আসিছে। মুই তার বাস পাই যেন!

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পিঙলা।

শিবরামের নৌকা মোড় ফিরল, হাঙ্গরমুখীর খাল থেকে কুমীরখালার নালায় গিয়ে পড়ল। স্রোত এখানে অগভীর—সন্তর্পণে চলল নৌকা। শিবরাম ছইয়ের উপরে বসেছিলেন। ভাবছিলেন, পিঙলার সঙ্গে আর দেখা হবে না। হয় তো মাস কয়েকের মধ্যেই রুদ্ধ কুপিত বায়ু কাল বৈশাখীর ঝড়ের মত বেগে আলোড়ন তুলবে, জীবনটাকে তার বিপর্যস্ত করে দেবে। উন্মাদ পাগল হয়ে যাবে হতভাগিনী।

(আট)

"বেদের কন্তে সহজে পাগল হয় না ধন্বন্তরি ভাই; বেদের কন্তের পরান যখন ছাড়-ছাড় কর‍্যা উঠে তখুন পরানটারেই ছেড়্যা দেয় হাসি মুখে বাসিফুলের মালার মতুন; লয় তো—বাঁধন ছিড়্যা আগুন জ্বালায়ে নাচতে নাচতে চল্যা যায়, যা-পেলে, যারে পেলে পরান বাঁচে—তারির পথে। আপন মনেরে সে শুধায়—মন কি চাস তা বল্, খতায়ে দেখ্যা বল্। যদি ধরমে সুখ তো ধরম মাথায় লিয়া মর‍্যা যা; দে কুনও কালনাগের মুখে হাত বাড়ায়ে দে। নিয়া ভরপেট মদ খেয়ে ঘুমায়ে যা। আর তা যদি না-চাস, যদি বাঁচিতে চাস, ধরমে-করমে-জাতিতে কুলে-ঘরে গেরামে-পরানের আগুনের জ্বালা ধরায়ে দিয়া—জ্বালায়ে দিয়া চলে যা তু আপন পথে।"

মুই গেলছিলম। মহাদেব শিরবেদের সব্বনাশ কর‍্যা—ঝাঁপ দিয়া পড়ছিলম গাঙের জলে। মরি মরব, বাঁচি বাঁচব, বাঁচিলে পিথিমীর মাটিতে পরানের ভালবাসা ঢেল্যা মাখায়ে তাতেই ঘর বেঁধ্যা, পরানের সাধ মিটাব। ঘরের দুধারে দুই চাঁপার গাছ পুঁত্যা, ফুলের মালা গলায় পর‍্যা—পরানের ধনে মালা পরায়ে—বাঁচব, পরান ভরায়ে বাঁচব। তা মরি নাই, বেঁচেছি, দেখ চোখে দেখ, তোমার ধরম বহিন—বেদের কন্তে—পোড়াকপালী, মন্দভাগিনী, কালামুখী কুহকিনী নিলেজ্জো শবলা তুমার ছামনে দাঁড়ায়ে—দুশমনের হাড়ে গড়া দাঁতে ঝিকিমিকি কর‍্যা হেসে সারা হতেছে। পেত্নিী নই, জ্যান্ত শবলা, দেখ, ছুঁলি পর যদি চান করতে হয় তো কাজ নাই; লইলে এই হামরার হাতখানা পরশ কর‍্যা দেখ, মুই সেই শবলা! ধন্বন্তরি ভাই, বেদের কন্তের মনে বায়ু যখন ঝড় তুলে—তখন পরানের ঘরের দুয়ার ভেঙে ফেলায়;—

হেসে ওঠে শবলা—খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে, সে হাসিতে মানুষের আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না, ভাবে—নির্লজ্জ ভাবে এমন হাসি হাসে কি করে মানুষ। সেই হাসি হেসে শবলা বললে—কি কইলম? পরানের দুয়ার ভেঙে ফেলায়! আ—হামরার কপাল, বেদের জাতের পরানের ঘরে আবার দুয়ার! দুয়ার লয় গো আগড়। কোনমতে ঠেকা দিয়া পরানের সুখ দুখ ঢেক্যা রাখে। ঝড় উঠলে সে কি থাকে? উড়ে যায়। ভিতরের গুমোট বাহিরে এসে আকাশে বাতাসে ছড়ায়ে যায়। বায়ুতে বেদের কন্যে পাগল হয় না ধন্বন্তরি ভাই। মুই পাগল হই নাই। পিঙলা—সেও পাগল হয় নাই।

মাস চারেক পর। তখন কার্তিকের প্রথম। শিবরামের সঙ্গে শবলার দেখা হল। তাঁর নতুন ঠিকানায়, আয়ুর্বেদ ভবনের সামনে এসে চিমটে বাজিয়ে হাঁক তুলে দাঁড়াল।

—জয় মা বিষহরি! জয়—ধন্বন্তরি! তুমার হাতে পাথরের খলে বিষ অমৃতি হোক; ধনে পুত্যে লক্ষ্মীলাভ হোক। যজমানের কল্যাণ কর ভোলা মহেশ্বর!

শিবরাম জানতেন বেদেরা আবার তাঁর এখানে আসবে। ঠিকানা তিনি দিয়ে এসেছেন। নারীকণ্ঠের ডাক শুনে ভেবেছিলেন—পিঙলা। একটু বিস্মিত হয়েছিলেন, পিঙলা পাগল হয় নাই? কিসে আরোগ্য হল? দেবকৃপা? বিষহরির পূজারিণীর, বিষহরির কৃপায় ব্যাধি প্রশমিত হয়েছে! রসায়নের ক্রিয়া যেমন দুইয়ের দুই যোগ করলে চারের মত স্থির নিশ্চয়, দেহের অভ্যন্তরে ব্যাধির প্রক্রিয়াও তেমনি সুনিশ্চিত; ব্যাধিতে তাই ঔষধের রসায়ন প্রয়োগে দুই শক্তিতে বাধে দ্বন্দ্ব, কোথাও জেতে ঔষধ, কোথাও জেতে ব্যাধি। ঔষধ প্রয়োগ না

করলে ব্যাধির গতিরোধ হয় না, হবার নয়। এ সত্যকে তিনি মানেন, আয়ুর্বেদ—পঞ্চমবেদ, বেদ মিথ্যা নয়। কিন্তু তার পরেও কিছু আছে, অদৃশ্য শক্তি, দৈব-অভিপ্রায়, দেবতার কৃপা! দৈববলের তুল্য বল নাই। আচার্য ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্য হয়ে তিনি কি তা অবিশ্বাস করতে পারেন? রহস্য উপলব্ধির একটু প্রসন্ন হাসিতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিস্ময় কেটে গেল। বেরিয়ে এলেন তিনি। বেরিয়ে এসে কিন্তু তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

সামনে দাঁড়িয়ে পিঙলা নয়—শবলা।

পিঙলা দীর্ঘাঙ্গী, শবলা বালিকার মত মাথায় খাটো। আজও তাকে পনেরো ষোল বছরের মেয়েটির মত মনে হচ্ছে।

পিঙলা দীর্ঘকেশী; শবলার চুল কুঞ্চিত কোকড়ানো একপিঠ খাটো চুল।

শবলার চোখ আয়ত ডাগর; পিঙলার চোখ ছোট নয় কিন্তু টানা-লম্বা।

শবলাকে পিঙলা বলে ভুল হবার নয়।

শবলার পিছনে সাঁতালীর ক'জন অল্পবয়সী বেদে, বয়স্ক লোকের মধ্যে নটবর আর নবীন।

শিবরাম বুঝতে পারছিলেন না কিছু। শবলা?

শবলা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললে—পেনাম ধন্বন্তরি ভাই। তুমার আঙ্গিনায় হামরাদের জনম জনম পেট ভরুক, হামরাদের নাগের গরল তুমার খলে তুমার বিদ্যায় অমৃতি হোক, তুমার জয়জয়কার হোক।

প্রণাম সেরে উঠে নতজানু হয়ে বসেই বললে—হামরাকে চিনতে পারছ ভাই?

এতক্ষণে বিস্ময় এবং স্নেহভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন শিবরাম—শবলা!

—হাঁ গ! শবলা!

—আর সব? পিঙলা? গঙ্গারাম? ভাদু?—এরা? পিঙলা পাগল হয়ে গেছে, না?

শবলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শিবরাম বুঝলেন—শবলা প্রশ্ন করছে—জানলে কি করে? শিবরাম বিষণ্ণ হেসে বললেন—তার দেহে বায়ু রোগের লক্ষণ আমি দেখে এসেছিলাম। মানসিক-দৈহিক পীড়ন সে নিজেই অত্যন্ত কঠোর করে তুলেছিল। বায়ু কুপিত হয়ে উঠল স্বাভাবিক ভাবে। আমি বলেছিলাম তাকে ওষুদ ব্যবহার করতে। কিন্তু—

—বায়ুরোগ! বায়ুর কোপ!

হাসলে শবলা। বললে—বেদের কন্যে সহজে পাগল হয় না ধন্বন্তরি ভাই! পিঙলার মনে যে ঝড় উঠিল ভাই, সে ঝড়ে পেলয় হয়ে গেল সাঁতালীতে। মন্বন্তর হয়ে গেলছে সাঁতালীতে। নাগিনী কন্যের মুক্তি হলছে।

* * *

সে এক বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনা।

শবলা বলে গেল, শিবরাম শুনে গেলেন।

শুনতে শুনতে মনে পড়ল আচার্য ধূর্জটি কবিরাজের কথা। একদিন তুলসীর পাতা তুলতে তুলতে বলেছিলেন, তুলসীর গন্ধ তৃপ্তিদায়ক কিন্তু পুষ্পগন্ধের মত মধুর নয়। স্বাদেও সে কটু। আমি যেন ওর মধ্যে অরণ্যের বন্য জীবনের গন্ধ পাই। মনে হয় অকপট ধর্মবিশ্বাসে অন্তর ঢালা নিষ্ঠায় মানুষ অসম্ভব কামনা করলে তা হয়তো পূর্ণ হয় না, কিন্তু

নিজের জীবনটা চতুর্বর্গ লাভে সার্থক হয়ে ওঠে কিন্তু তার ক্ষতি পূরণ তাঁকে করতে হয়। তুলসীর জন্মবৃত্তান্ত জান তো? সমুদ্রগর্ভে বা সমুদ্রতটে থাকত যে দৈত্যজাতি, তাদের রাজা জলন্ধর বা শঙ্খচূড়ের পত্নী তুলসীর তপস্যায় স্বামী ছিল অজেয়। সে তো সব জান তোমরা। বিষ্ণু প্রতারণা করে তার তপস্যা ভঙ্গ করলেন; স্বামীর অমরত্ব লাভ ঘটল না, জলন্ধর বা শঙ্খচূড় নিহত হলেন। কিন্তু তুলসী মানবজীবনের মহাকল্যাণ নিয়ে, বিষ্ণুর মস্তকে স্থান লাভের অধিকার নিয়ে পুনর্জন্ম লাভে সার্থক হলেন। ওর গন্ধের মধ্যে আমি যেন সেই সমুদ্রতটের দৈত্যনারীর গাত্রগন্ধ পাই।

পিঙ্গলাও কি কোন নূতন বিষনাশিনী লতা হবে না নূতন জন্মে?

মহাদেব বেদের বুকে বিষের কাঁটা বসিয়ে দিয়ে প্রত্যূষে কুহকালোকের মত আবছা-আলো আবছা-অন্ধকারের মধ্যে নগ্নিকা শবলা ভরা গঙ্গায় ঝাঁপ খেয়ে পড়েছিল। সে প্রতিশোধ নিয়েছিল। সে তখন প্রায় উন্মাদিনী।

বন্য আদিম নারীজীবন; চারিদিকে নিজেদের সমাজে অবাধ উদ্দাম জীবন-লীলা; তার জীবনে কামনা জেগেছিল, উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, সে কথা শবলা গোপন করে নাই; অস্বীকার করে নাই। অনেক কাল পূর্বে প্রথম পরিচয়ে ভাই-বোন সম্বন্ধ পাতিয়েও সে পাতানো-ভাইয়ের কাছে চেয়েছিল অসামাজিক অবৈধ ভেষজ। সন্তানঘাতিনী হতেও সে প্রস্তুত ছিল, সে বলতেও সে লজ্জা বোধ করে নাই। সে স্বীকার করেছিল, একটি বীর্য্যবান বেদে তরুণকে সে ভালবেসেছিল কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে ভয় তার তখনও ছিল, পারে নাই স্পর্শ করতে। তাকে সুকৌশলে মহাদেব শিরবেদে সর্পাঘাত করিয়ে খুন করেছিল। তারপরই সে উন্মত্ত হয়ে উঠল।

শবলা বললে—হামরার চসকু দুটা ঠুলি দিয়া ঢাকা ছিল ধরম ভাই, খুল্যা ফেল্লালাম মনের জ্বালায়—টেন্যা ছিড়্যা দিলম। চসকুতে হামরার সব পড়িল, রাতিরে দেখলম রাতি, দিনেরে দেখলম দিন। শিরবেদের স্বরূপ দেখ্যা পরানটায় হামরার আগুন জল্যা উঠল। হয় তো উয়ারও দোষ নাই; কি করিবে; বেদেকুলের দেবতা দুটি, একটি শিব আরটি বিষহরি। শিব নিজে ধরম ভেরষ্ট হয়্যা কুচনী পাড়ায় ঘুরে, আপন কন্যের রূপে মোহিত হয়—। বেদেকুলের কপাল।

শিবরাম ম্লান হেসে বলেন—ওদের দেবতা হওয়া সাধারণ কথা নয়। ওই শিবই পারেন ওদের দেবতা হতে। ওদের পূজা নিতে দেবতাটি অম্লানমুখে গ্রহণ করেছেন উচ্ছৃঙ্খলতার অপবাদ, ধরেছেন বর্বর নেশা-পরায়ণের রূপ, আরও অনেক কিছু। নিজেদের সমাজপতির শ্রেষ্ঠ শক্তিমানের জীবনের প্রতিফলনে প্রতিফলিত হয়েছেন রুদ্রদেবতা। বল্গাহীন জৈবিক জীবন স্বেচ্ছাচারে যা চায়, যা করে, তার দেবতাও তাই করেন। তারা বলে দেবতা করে, তারই প্রভাব পড়ে মানুষের উপর। উপায় নাই, পরিত্রাণ নাই। প্রাণপণ চেষ্টা হয় তো করে, তবু অন্তরের অন্তস্তলের স্বেচ্ছাচারের কামনা কুটিলপথে আত্মপ্রকাশ করে।

শবলা আবিষ্কার করেছিল—মহাদেব শিরবেদের মধ্যেও সেই উদ্দাম ভ্রষ্ট জীবনের নিরুদ্ধ কামনা। সে বলে—শিরবেদেদের উপরে শিব চাপিয়ে গিয়েছেন তাঁর সেই ভ্রষ্ট জীবনের কামনার অতৃপ্তি। সব—সব, সকল শিরবেদের মধ্যেই তা প্রকাশ পায়। বেদেরা ধরতে পারে না; দেখতে পায় না; দু-একজন পেলেও তারা চোখ ফিরিয়ে থাকে। মহাদেবের দৃষ্টি পড়েছিল শবলার উপর।

কিন্তু শবলা নাগিনী কন্যা হলেও তার তো বিষহরির মত নাগভূষায় ভূষিতা, গরলনীল, বিষম্ভরী মূর্তি ধরবার শক্তি ছিল না। তাই সে

সেদিন শেষরাত্রে অসহ্য জীবনজ্বালায় উন্মাদিনীর মত তার নৌকায় গিয়ে উঠেছিল জলচারিণী সরীসৃপের মত। জলে ভিজে কাপড়খানা ভারী হয়ে উঠেছিল, শব্দ তুলছিল প্রতি পদক্ষেপে, গতিকেও ব্যাহত করছিল; তাই সে খুলে ফেলে দিলে কাপড়খানা। উন্মাদিনী গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে।

শিবরাম সে সব জানেন। শুনেছিলেন। বিস্মিত হন নাই। যে আগুন দেখেছিলেন তিনি শবলার চোখে, তার যে উত্তাপ অনুভব করেছিলেন—তাতে শবলার পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। সব শুনতে প্রস্তুত ছিলেন। শিবরাম বললেন—সে সব আমি জানি শবলা।

—জান? শবলা কঠিন দৃষ্টিতে শিবরামের দিকে তাকিয়ে বললে—কি জান তুমি? মুই তার বুকের উপর ঝাঁপায়ে পড়েছিলম, সে আমারে দধিমুখী ভেবেছিল—।

ঠোঁট বেঁকিয়ে বিচিত্র হাসি হেসে সে বললে—এক কুড়ি চার বছর তখন হামরার বয়স—দধিমুখী দু কুড়ি পারাল্‌ছে; হামরাকে মনে ভেবেছিল দধিমুখী!

মুই তখন সাঁতালী পাহাড়ের কালনাগিনীর-পারা ভয়ঙ্করী। চোখে আগুন—নিশ্বাসে বিষ—ছামনে পড়ছে যে ঘাস গাছ সে ঝলসে কালো হয়ে যেতেছে। ওদিকে আকাশে ম্যাঘের ঘটাপটার মাঝখানে জেগ্যা রইছেন বিষহরি—চোখে তার পলক নাই, হাতে তার দণ্ড; ইদিকে ঘুরছে হিন্তালের লাঠি হাতে চাঁদো বেনে—তার নয়নে নিন্দে নাই, নাগিনীর অঙ্গে বিষের জ্বালা—বিষহরি তারে খাওয়ালছেন বিষের পাথার। ঠিক তেমুনি হামরার দশা তখুন। জ্ঞান নাই, গম্যি নাই—মরণে ভয় নাই—বুকে হামরার সাতটা চিতার আগুন—সর্ব অঙ্গে হামরার মরণ জ্বরের তাপ। ভোর হতেছে তখন—চারিদিকে কুহকমায়ার আলো, সেই

আলোতে সব দেখাইছিল সব ছায়াবাজীর-পারা। গাছ-পালা গাঁ-লা—হামরার চোখে মুই তাও দেখি নাই, মুই দেখেছিলম অন্ধকার, সাত সমুদ্দুরের পাথারের মত অন্ধকার থৈথৈ করছিল হামরার চোখের ছামনে। ঝাঁপ দিব—হারায়ে যাব। হামরার তখুন কারে ডর? কিসের ডর? মুই যাব লরকে—উকে লিয়া যাব না? বুকের উপর নিজেরে দিলম ঢেল্যা, পাপী ভাবলে—স্থখনিদ্দা এল বুঝি স্বগ্যের স্বপন নিয়া; দিলম তখুন হাত বুলায়ে ঠিক কলিজার উপর কাঁটাটা বিঁধ্যা; লোহার সরু কাঁটা, সুচের মতন মুখ, ভিতরটা ফাঁপা—তাতে ভরা থাকে বিষ। সে বিষের ওষুদ নাই।

তারপর সে ছুটে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভাদ্রের দুকূল পাথার গঙ্গার বুকে। কলকল—কলকল শব্দ, প্রচণ্ড একটা টান,—মধ্যে মধ্যে শ্বাস কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল—নইলে ভেসে চলেছে, যেন দোলায় দুলে চলেছে; আকাশ নাই, মৃত্তিকা নাই—চন্দ্র নাই সূর্য্য নাই—বাতাস নাই—শবলা বললে—বাস্ মনে হ'ল হারায়ে গেলম। মুছে গেল সব। মনে হল—খুব উঁচু ডাল থেক্যা পড়েছি, পড়ছি—পড়ছি—পড়ছি। তা পরেতে তাও নাই। কিন্তু হারায়ে গেলম না। চেতন যখুন হল—তখুন দেখি মুই একখানা লায়ের উপর শুয়ে রইছি।

সে লা এক মুসলমান মাঝির লা। ইসলামী বেদে। বেদের কন্তেরে দেখেই সে চিনেছিল। চিহ্ন হামরার ছিল। শবলা হাসলে

শবলা শক্ত ক'রে এলো খোঁপা বেঁধেছিল সেদিন। খোঁপায় গুজেই নিতে হয়েছিল ওই বিষকাঁটা; আর এলো খোঁপার পাকানো চুলের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিল পদ্ম গোখুরার একটা বাচ্চা। প্রয়োজন হলে ওকেও ব্যবহার করবার অভিপ্রায় ছিল।

—শুনলুম যখুন ভাই, কি, সে ইসলামী বেদে, তখুন হাসলম।

বুঝলম—মা হামরাকে সাজা দিছেন। এই ভাদর মাসের দুকূল পাথার গাঙের লাল বরণ জলের পরতে পরতে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির পরশ; মহাপাপীর হাড়ের টুকরা কাকে চিলে ঠোঁটে কর‍্যা নিয়া যায়, যদি কোন রকম পড়ে মা গঙ্গার জলে, তবে লরকের পথ থেক্যা স্বরগের রথ এস্যা তারে চাপায়ে ডঙ্কা বাজায়ে নিয়া যায়। হামরার করমদোষ ছাড়া আর কি কইব? পাথার গাঙে ঝাঁপায়ে পড়লম, বুক ফেট্যা গেল বাতাসের তরে, চেতনা হর‍্যা গেল, আলো মুছ্যা গেল, জুড়ায়ে গেল জ্বালা, ভুলে গেলম মনিষ্যি জীবনের সকল কথা, বুলব কি ভাই, চুলে জড়ানো নাগের ছানা, যে নাগ ছটা মাস মাটির তলে থাকে, সে নাগটাও মরে গেছিল, হামার মরণ হয় নাই। বুঝতে হামরার বাকি রইল না, বিষহরি হামরাকে ফিরায়ে দিছেন;—জাতি নিয়া—কুল নিয়া পাঠায়ে দিছেন নরলোকে—; দুঃখভোগের তরে। কণ্ঠস্বর হঠাৎ দৃঢ় হয়ে উঠল শবলার। সে বললে, উপরের দিকে মুখ তুলে কথাগুলি তাদের দেবী বিষহরিকে উদ্দেশ ক'রে;—তা পাঠাও তুমি। একদিন তুমি নিজে বাদ করলা চাঁদো বেনের সাথে, সে বাদে জীবন দিলেক নাগেরা; তুমি রইল্যা নিজের আটনে বস্যা—কালনাগিনীরে পাঠাইলা সোনার লখিন্দরকে দংশন করতে। কি পাপ—কি দোষ করেছিল লখিন্দর-বেহুলা? ছলতে হল বিষবেদের প্রধানকে। তুমি পেলে পূজা, কালনাগিনী বেদেকূলে জনম নিয়া জনমে জনমে—তিলস্থলা খাটিছে; হামরাকে ফিরা পাঠাইলা নরলোকে দুঃখ ভোগের তরে। ভাল! দুখের বদলে সুখ করিব মুই। স্বামী নিব, ঘর গড়িব, দুয়ার গড়িব, হাসিব নাচিব, গাহিব, পুত্য-কন্যায় সাজাইব হামরার সংসার, তারপরেতে মরিব, তখুন নরকে যাই যাইব। যমদণ্ডে যদি আঙুল পেমান পরান পুতুল আছাড়ি পিছাড়ি করে তবু তুমারে ডাকিব না।

কিন্তু তা লারলাম। দিলে না বিষহরি, দিলে না ওই ইসলামী বেদে। ওই বেদেরেই মুই হামরার পতি বল্যা বরণ করিছিলম। ইসলামী হলি কি হয়—দেবতা তো বেদের বিষহরি! তারে তো সি ভুলে নাই। সাঁতালীর বেদেকুলের যারা সাঁতালী থেক্যা গাঙুড়ের জলে লা ভাসায়ে আসিবার পথে সঙ্গ ছাড়িল, থেক্যা গেল পদ্মাবতীর চরে—তারাই তো হইছে ইসলামী বেদে। ভুলিবে কি কর্যা? সে কইল—বেদের কন্যে ঘর বাঁধিবার আগে মায়েরে পেসন্ন কর। লইলে মায়ের কোপে—চাঁদো বেনের দশা হইবে। ঝড়ে লা ডুবিবে, পুত্য কন্যা—নাগ দংশনে পরান দিবে; সুখের আশায় ঘর বাঁধিব, দুখের আগুনে জল্যা ছারখার হয়্যা যাবে। মায়েরে পেসন্ন কর। মনে কর কন্যে—নাগিনী কন্যের অদেষ্ট, পেথম সন্তানটিরে তারে—।

শিউরে উঠল শবলা।

প্রবাদ আছে,—নাগিনী কন্যা যদি ভ্রষ্ট হয়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচে, সে যদি ঘর-সংসার বাঁধে, সে যদি তার জাতি-ধর্ম সব ত্যাগ করে, তবে মা বিষহরির অভিশাপ গিয়ে পড়ে তার মাতৃত্বের উপর। সন্তান কোলে এলেই তার নাগিনী স্বভাব জেগে ওঠে। নাগিনী নাকি নিজের সন্তান ভক্ষণ করে। সেও সন্তান হত্যা করে।

আত্ম সম্বরণ ক'রে শবলা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে।

কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আর হ'ল না ঘর বাঁধা। জমি পেলম, বাঁশ খড় দড়ি সবের ব্যবস্থাই করলম মনে মনে, পুঁজিরও অভাব ছিল নাই; কিন্তু তবু হল নাই। পশ্চিম আকাশের দিকে তাকায়ে—কালো মেঘের কথা মনে পড়িল, বিদ্যুতের আলো মনে হইল, কড় কড় ডাক যেন মাথার মধ্যে ডেক্যা উঠল। ঘর বাঁধা হ'ল

নাই। পথে পথে ঘুরতে লাগলম। যোগিনী সাজলম, সাঁতালীর বিল বাদ দিয়া মা বিষহরির আটনে আটনে ঘুর‍্যা বেড়ায়ে ধরনা দিলম। শুধু হামরার তরে লয় ভাই, যোগিনী সেজ্যা তপ যখুন করছি তখুন নাগিনী কন্যের তরেও খালাস চাইলম। বললম—জয়নী গ, শুধু হামরাকে লয়, তুমি কন্যের এই বন্ধন থেক্যা খালাস দাও—খালাস দাও—খালাস দাও। কামরূপ গেলম। মা চণ্ডী মা কামিক্ষেকে বললম, মা, আমারে খালাস দাও, কন্যেরে খালাস দাও।

পথে দেখা ঠাকুরের সাথে!

—কার সঙ্গে?

—নাগু ঠাকুর গ! মাথায় রুখু চুল, বড় বড় চোখে, খ্যাপা-খ্যাপা চাউনি; সোনার পাতে মোড়া লোহার কপাটের মতুন এই বুক, তাতে দুলছে রুদ্দারিক্ষির মালা, অরুণ্যের দাঁতাল হাতীর মতুন চলন,—ঠাকুরকে দেখ্যা মনে হইল মহাদেব। দেখে ডেকে তারে কইলম—তুমি ঠাকুর কে বট তা কও? ঠাকুর কইল—হামরার নাম নাগু ঠাকুর—মুই চলেছি মা কামাখ্যার আদেশের তরে, মা বিষহরির আদেশের তরে।

শিবরাম সবিস্ময়ে বললেন—তুমিই সেই যোগিনী?

—হঁ, শবলা পোড়াকপালীই সেই যোগিনী!

শবলা বললে—ধন্বন্তরি ভাই, ঠাকুরের কথা শুন্যা পিঙলার ভাগ্যের পরে হামরার হিংসা হছিল! হায়রে হায়, রাজনন্দিনীর এমন ভাগ্যি হয় না; বেদের কন্যে মন্দভাগিনীর সেই ভাগ্যি।

শিবরাম বলেন—সত্যিই ঈর্ষার কথা। এমন বীরের মত গৌরবর্ণ পুরুষ, গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী—সে ওই বেদের মেয়ের জন্য জাতি ধর্ম সন্ন্যাস ইহকাল পরকাল সব জলাঞ্জলি দিয়ে বনে পাহাড়ে দুর্গম পথে চলেছে, তাকে না পেলে তার জীবনই বৃথা, ওই বন্দিনী কন্যাটির মুক্তিই হ'ল

তার তপস্যা; এ ভাগ্যের চেয়ে কোন উত্তম ভাগ্য হয় নারীজীবনে? এ দেখে কোন্ নারীর না সাধ হয়, হায় আমার জন্য যদি এমনি করে কেউ ফিরত!

বিপুল বিস্তার কোন নদী, বোধ হয় ব্রহ্মপুত্রের তীরে—ঘন বনের মধ্যে শবলার সঙ্গে নাগু ঠাকুরের দেখা হয়েছিল। বীর বপু নির্ভীক নাগু ঠাকুর মনের বাসনায় একা পথ চলছিল। মধ্যে মধ্যে ডাকছিল—শঙ্করী! শঙ্করী! বিষহরি, শিবনন্দিনী!

হাতে ত্রিশূল দাও; কখনও কখনও অরণ্যের গাঢ় নির্জনতার মধ্যে ছেলে মানুষের মত হাঁক মেরে প্রতিধ্বনি তুলে কৌতুক অনুভব করছিল।

—এ– প্!

তিন-চার দিক থেকে প্রতিধ্বনি উঠছিল—এ—প! এ—প্! এ—প্!

সে প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে না-যেতে আবার হেঁকে উঠছিল নাগু ঠাকুর—এ—প!

শবলা বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় করেছিল।

নাগুর কথা শুনে বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠেছিল শবলার। সাঁতালী মনে পড়েছিল। পিঙলাকে মনে পড়েছিল। হিজলের বিল মনে পড়েছিল।

শবলার উত্তেজনার সীমা ছিল না। প্রথমেই সে সেই উত্তেজনায় ঠাকুরকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিল—ঠাকুর, কেমন পুরুষ তুমি? একটা কন্যেরে তোমার ভাল লেগেছে, তার তরে তুমার পিথিমী শূন্য মনে হচ্ছে, তুমি তারে কেড়ে লিতে পার না? এমুন বীর চেহারা তুমার, এমুন সাহস, বাঘেরে ডরাও না, পাপেরে ডরাও না; পাহাড় মান না, নদী মান না, আর কটা বেদের সাথে লড়াই কর্যা কন্যেটারে কেড়্যা লিতে পার না?

নাগু ঠাকুর বলেছিল—পারি। নাগু ঠাকুর পারে না—তাই হয়? নাগু ঠাকুরের নামে রাঢ়ের মাটিতে মাটি ফুড়ে ওঠে তার সাকরেদ শিষ্যের দল। মেটেল বেদে, বাজীকর, ওস্তাদ, গুণীন এরাই শুধু নয়, নাগু ঠাকুর কুস্তীগির, নাগু ঠাকুর লাঠিয়াল। নাগু সব পারে। সব পারে বলেই তা করব না। কন্যেকে কেড়ে আনলে তো কন্যে হবে ডাকাতির মাল। তাকে মুক্তি দিয়ে জয় করতে হবে। পিঙ্গলা কন্যে—লম্বা কালো মেয়ে, টানা দুটি চোখে আষাঢ়ে কালো মেঘ, কখনও বিদ্যুতের ছটা, কখনও সন্ধের আঁধারের মত ছায়া, পিঠে একপিঠ রুখু কালো চুল,—সে হাসি মুখে লজ্জায় মাটির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে এসে আমার হাত ধরবে, তবে তো তাকে পাব আমি।

আঃ—ধন্বন্তরি ভাই, পরানটা আমার জুড়ায়ে গেল; পরানের পরতে পরতে মনে হল রামধনু উঠেছে দশ-বিশটা।

মায়েরে সেদিন পরান ভর্যা ডাকলম। মনেও লিলে—কি—পিঙ্গলা যখুন এমুন কর্যা বেদেকুলের মান রেখেছে, লজ্জা শরম ভাসায়ে দিয়া আর নাগু ঠাকুরের মতুন এমন যোগী মানুষ যখুন মুক্তি খুঁজিতে আসিছে—তখুন মুক্তি ইবার হবে। "রাতে সি দিনে স্বপন পেলাম মুই। স্বপনে দেখলম পিঙ্গলারে, হাতে তার পদ্মফুল, বিষহরির পুষ্প; সে হামরাকে হেস্যা কইল—মুক্তি দিলে জননী, নাগিনী কন্যের খালাস মিলিল গ শবলা দিদি!' ধড়মড় কর্যা উঠ্যা বসলম। শেষরাত সন সন করছে, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে মনে হচ্ছে অরুণ্যিতে গীত উঠিছে; হামরার বেদে ঘুমে নিথর; নাগু ঠাকুর ছিল একটা পাথরের উপর চিৎ হয়্যা শুয়্যা, বুকে দুটা হাত, নাক ডাকিছে যেন শিঙা বাজিছে, শুধু জেগ্যা রইছে মাথার কাছে নাগ একটা, মহানাগ শঙ্খচূড়, ঠাকুরের নাক ডাকার সাথে পাল্লা দিয়া গর্জাইছে। সে-ই শুধু সাক্ষী হামরার স্বপনের। ঠাকুরকে ডেক্যা তুল্যা

কইলম বিবরণ। কইলম সাঁতালীতে গিয়া বলিয়ো তুমি মুক্তি হইছে কন্তের, দেনা সোধ হইছে। এই নাগ তার সাক্ষী। কিন্তু সাঁতালীর বেদেরা মানিল না সে কথা। গঙ্গারাম শয়তানের দোসর, সে নাগু ঠাকুরের বুকে মারিল আচমকা কিল। নাগ দিল না সাক্ষী। নাগু ঠাকুর নাগু ঠাকুর—সে নিজে স্বপন দেখে নাই; তাই নিজে সেই আদেশের তরে চল্যা এল। পিঙ্গলারে কইল, মুই আনিব, পেমান আনিব। মুক্তি হইছে।

কন্যা কইল—।

শিবরাম জানেন পিঙ্গলা দুইপাশে তালগাছের সারি দেওয়া রাঢ়ের সেই আঁকা-বাঁকা মাটির পথের দিকে চেয়ে থাকে। আসবে নাগু ঠাকুর; মহিষ কি বলদ কিছুর উপর চড়ে। কবে কখন আসবে?

রাঢ়ে আছে চম্পাই নগর জান? বর্ধমান জেলা। বেহুলা নদীর ধারে চম্পাই নগরে বিষহরির আটন। নাগপঞ্চমীতে বিষহরির পূজার দিন—আজও গ্রামের বধূরা শ্বশুরবাড়ীতে থাকে না, সে দিন তাদের বাপের বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থা। চম্পাইয়ের বধূরা বেহুলার বাসরের কথা স্মরণ করে সেদিন চম্পাই নগর ছেড়ে চলে যায়। বাপের বাড়ীতে গিয়ে মনসার উপবাস করে, চম্পাই নগরে বিষহরির দরবারে পূজা পাঠায়। সেই চম্পাই নগরে গিয়েছিল নাগু ঠাকুর। সামনে আসছে নাগপঞ্চমী। চারদিক থেকে আসবে দেশান্তরের সাপের ওস্তাদ।

নাগু ঠাকুর ধরনা দিয়েছিল, 'যোগিনীকে দিলে যে আদেশ—সেই আদেশ আমাকে দাও।' আদেশ না পেলে উঠবে না। অন্ন জল গ্রহণ করবে না।

দেখা হ'ল শবলার সঙ্গে। শবলা ওখানে এসেই তার ব্রত শেষ

করবে। মুক্তি মিলেছে, তীর্থ পরিক্রমায় বাকি দুটি তীর্থ। বেহুলা নদীর উপর চম্পাই নগর আর হিজলে সাঁতালী গায়ে মা বিষহরির জলময় পদ্মালয়; যেখানে লুকানো ছিল চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা মধুকর।

চম্পাই নগরে সাঁতালীর বিষ বেদেরা যায় না। সে এ চম্পাই নগরই হোক, আর রাঙামাটী চম্পাই নগরই হোক। মূল সাঁতালীর চিহ্ন নাই, কি দেখতে যাবে? আর কোন্ মুখেই বা যাবে? কিন্তু শবলা গেল। তার মুক্তি হয়েছে আর সে তো সাঁতালীর বেদেনী নয়।

নাগু ঠাকুরের সেই বীরের মত দেহের লাবণ্য শুকিয়ে এসেছে উপবাসে। কিন্তু চোখ দুটো হয়েছে ঝকমকে দুটো স্ফটিকের মত। বুকের উপর হাত রেখে পাথরে মাথা দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে উপরের দিকে চেয়ে ঠাকুর শুয়ে ছিল। একটা বড় ঝাকড়া বটগাছের তলায় শুয়ে ধরনা দিয়েছে।

শবলা তাকে দেখে সবিস্ময়ে বললে—ঠাকুর!

ঠাকুর চমকে' উঠল—যোগিনী!

—কই? পিঙ্গলা কই? পিঙ্গলা বহিন? ভাগ্যবতী!

—পিঙ্গলাকে এখনও পাই নাই। প্রমাণ চাই।

—প্রমাণ?

—হাঁ, প্রমাণ। প্রমাণ নিয়ে যাব, গঙ্গারামের বুকে কিল মারব, তারপর—। হাসলে নাগু ঠাকুর, বললে—তারপর পিঙ্গলাকে নিয়ে নাগু ঠাকুর—ভৈরব আর ভৈরবী—বাধবে ডেরা, নতুন আশ্রম!

—নাগ? নাগ দিলে না সাক্ষী?

—না!

—কি সাজা দিছ তারে? চোখ জ্বলে উঠল শবলার!

—সেটাকে ফেলে এসেছি সাঁতালীতে! তাকে সাজা দেওয়া উচিত ছিল। টুঁটিটা টিপে টেনে ছিঁড়ে দিতে হ'ত। কিন্তু মনের ভুল—মনেই পড়ে নাই।

—পিঙলা কি কইল?

—পিঙলা আমার পথ চেয়ে থাকবে। বলেছে মুক্তির আদেশের প্রমাণ নিয়ে তুমি এস। আমি থাকলাম পথ চেয়ে।

—কি করিছ ঠাকুর? আঃ--কি করিছ তুমি? সাঁতালীর নাগিনী কন্যে বলিল—তুমার পথ চাহি থাকিবে আর তুমি তারে সেথা ফেল্যা রেখ্যা আসিলে? আঃ—হায় অভাগিনী কন্যে—

—কেন? কি বলছ তুমি?

—তার পরানটা তারা রাখিবে না।

—না—না। তুমি জান না! আর সেদিন নাই। পিঙলাকে তারা দেবতার মত দেখে।

—মুই জানি না, তুমি জান ঠাকুর? মুই কে জান, মুই শবলা—পাপিনী নাগিনী কন্যা;—শবলা ছুটে গিয়ে বিষহরির স্থানে উপুড় হয়ে পড়ল। তুমি আদেশ কর ঠাকুরকে। কন্যেকে তুমি রক্ষে কর! রক্ষে কর পিঙলাকে!

কি জানে নাগু ঠাকুর? শবলা যে জানে। দেবতার আদেশ হলেও কি সাঁতালীর বেদেরা মুক্তি দিতে চাইবে কন্যাকে? তাদের জীবনের সকল অনাচারের পাপের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ওই তপস্বিনী কন্যার পুণ্য তাদের সম্বল; অনায়াস নির্ভাবনায় তারা মিথ্যাচারণ করে চলে, ওই অক্ষয় সত্যের ভরসায়। তারা কি পারে তাকে মুক্তি দিতে। দেবতার মত ভক্তি করে? হাঁ, করে হয়তো। পিঙ্গলা হয়তো সে ভক্তি পেয়েছে। কিন্তু যে দেবতা পরিত্যাগ করে যাবে, কি, যেতে চায়—তাকে তারা যে

বাঁধবে, মন্দিরের দুয়ার গেঁথে দিয়ে চলে যাবার পথ বন্ধ করবে। কি জানে নাগু ঠাকুর!

মা বিষহরি! আদেশ দাও!

দীর্ঘকাল পর শবলার মনে হ'ল সে যেন সেই নাগিনী কন্যা—সম্মুখে বিষহরি, পৃথিবী দুলছে—বিষহরির বারিতে সাপের ফণাগুলি মিলিয়ে গিয়ে জেগে উঠছে মায়ের মুখ; বাতাস ভারী হয়ে আসছে, চারিদিক ঝাপসা হচ্ছে, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে—তার ভর আসছে। সে চীৎকার করতে লাগল—বাঁচা হামরার কন্যেরে বাঁচা, মুক্তি দে—খালাস কর। থর থর করে কাঁপতে লাগল শবলা। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

সমারোহ করে এবার নাগু ঠাকুর এল সাঁতালী।

সঙ্গে তার বিশজন জোয়ান, হাতে লাঠি শড়কী। নিজে চেপেছিল একটা ঘোড়ায়। সঙ্গে একটা বলদের গাড়ী। জন চারেক বায়েন—তাদের কাঁধে নাকাড়া শিঙা। নাগু ঠাকুরের মাথায় লাল রেশমী চাদরের পাগড়ী। গলায় ফুলের মালা। সঙ্গের সাকরেদরা পথের ধারের গাছ থেকে ফুল তুলে নিত্য নূতন মালা গেঁথে পরায়। শবলাও সঙ্গে চলেছে। সে তাকে রহস্য করে। সে যে পিঙলার বোন, শালিকা।

এবার নাগু বিয়ে করতে চলেছে। সমারোহ হবে না?

সম্মুখে নাগপঞ্চমী।

নাগপঞ্চমীর পূজা শেষ করেই সাঁতালীর বেদেরা নৌকা সাজিয়ে বেরিয়ে পড়বে। দেশ দেশান্তরে নৌকায় নৌকায় ফিরবে। নাগের বিষ, শুশুকের তেল, বাঘের চর্বি শজারুর কাঁটা—তাদের পণ্য।

তার আগে—তার আগে যেতে হবে।

জন্মাষ্টমী চলে গিয়েছে কবে, অমাবস্যা গিয়েছে, আকাশে সন্ধ্যায়

দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠেছে। চারিপাশে ধান থৈ-থৈ মাঠ। আকাশে মেঘের ঘোরা ফেরা চলছে। থামে বরযাত্রী! নাগু ঠাকুর হাঁক দেয়। থামে বরযাত্রীর দল। ভাদ্র মাসে বিয়ে, নাগু ঠাকুরের বিয়ে, ভৈরব চলেছে—বন্দিনী নাগকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে। এ কি সাধারণ বিয়ে রে! আয় সব।

গাড়ী থেকে নামে চাল ডাল—শুকনো কাঠ। নামে বোতল-বোতল মদ। খা সব ভৈরবের সঙ্গীরা দত্যি-দানার দল। বাজা নাকড়া শিঙে। নাচ, সব, নাচ!

কাল নাগপঞ্চমী!

চতুর্থীর সকালে—ধানভরা মাঠের বাঁকে—তালগাছের সারির ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সাঁতালীর গ্রাম—। ওই আকাশে উড়ছে হাজারে হাজারে সরালির দল! গগনভেরীরা বড় বড় হাঁসেরা আজও আসে নাই। ওই দেখা যাচ্ছে ঝাউ বন। তার কোলে বাতাসে দুলছে সাঁতালীর ঘাস-বন। সবুজ সমুদ্রে ঢেউ খেলছে। মাঠের বুকে আঁকাবাঁকা বাবলা গাছে হলুদ-রঙের ফুল ফুটেছে। মধ্যে মধ্যে শনের চাষ করেছে চাষীরা। হলুদ ফুলে আলো করে তুলেছে সবুজ মাঠ। সবুজ আকাশে—হলুদ তারা ফুল ফুটেছে।

—বাজাও নাকাড়া শিঙা।

কড় কড় শব্দে বেজে উঠল নাকাড়া! বিচিত্র উচ্চ সুরে শিঙা।

—দে রে বেটারা, হাঁক দে।

বিশ চব্বিশ জন জোয়ান—হেঁকে উঠল—আ—বা—বা—বা—বা!

—জয়—বাবাঠাকুরের জয়!

ঢুকল—বরযাত্রীর দল—সাঁতালীর মুখে। পথ এখানে সংকীর্ণ!

শবলার বিস্ময়ের সীমা ছিল না!

আজ চতুর্থী, কাল পঞ্চমী, বিষহরির পূজা! কই বিষম ঢাকি বাজে। কই! চিমটা কড়া বাজে কই! তুমড়ী বাঁশী বাজে কই!

নাকাড়ার শব্দ শুনে বেদেরা বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এল! কিন্তু—উল্লাস কই—?

নাগু ঠাকুর হাঁকলে—পিঙ্গলা! কন্যে, আমি এসেছি। এনেছি হুকুম। এনেছি প্রমাণ। দে রে, বেটারা, প্রমাণ দে!

বিশ জোয়ান কুক দিয়ে পড়ল! —আ—বা—বা—বা—বা! আ—!

হুঙ্কার ছড়িয়ে গেল দিকে দিগন্তরে গঙ্গার কূল পর্যন্ত দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ জুড়ে; হিজল বিলে ঢেউ উঠল—পাখীর ঝাঁক কলরব করে হাজার হাজার পাখায় ঝর-ঝর শব্দ তুলে আকাশে উড়ল।

বেদের দল সামনে এসে দাঁড়াল। সর্বাগ্রে ভাদু। হাতে তাদের চিমটে।

নাগু লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বললে—প্রমাণ এনেছি। কই পিঙলা কই?

ভাদুর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল—নাই। পিঙলা নাই!

পিঙলা নাই?

—না। চলে গেল। তুমি এনেছিলে কাল নাগ, তারই বিষে—।

নাগ পক্ষের প্রথম দিন। প্রতিপদের প্রভাতে কন্যা এসে দাঁড়াল বিশীর্ণা তপস্বিনীর মত। বললে—ডাক সব বেদেদের।

বেদেরা এল। কি আদেশ করবে কন্যা কে জানে? তপস্বিনীর মত কন্যাটির মধ্যে তারা সাক্ষাৎ নাগিনী কন্যাকে প্রত্যক্ষ করে।

কন্যা বললে—শিরবেদে কই?

গঙ্গারাম তখনও রাত্রির নেশার ঘোরে ঢুলছে। —সে বললে, যাব নাই যা!

কন্যা বললে—বেশ চল, মুই যাই তার হোথাকে!

গঙ্গারাম জনতা দেখে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। পিঙ্গলা কিছু বলবার আগেই সে বললে—ভাল হইছে তুমরা আসিছ। মুই ডাকতম তুমাদিগে। এই কন্যেটার অঙ্গে চাঁপা ফুলের গন্ধ উঠে গভীর রাতে। মুই অ্যানেক দিন থেক্যাই গন্ধ পাই। কাল রাতে মুই গন্ধ কুথা উঠে দেখতে গিয়া দেখেছি—কন্যের ঘর থেকে উঠে গন্ধ! শুধাও কন্যেরে! কি রে কন্যে—বল্!

স্তব্ধ হয়ে রইল বেদেরা। তারা তাকালে পিঙলার দিকে। প্রবাদ, সবাই শুনে এসেছে—যে সর্বনাশিনী নাগিনী কন্যা চম্পক গন্ধা হয়ে ওঠে। কিন্তু তারা এমন ঘটনার কথা জানে না। তারা প্রতীক্ষা ক'রে রইল পিঙলার মুখ থেকে প্রতিবাদ শুনবার জন্য।

পিঙলা বললে—হাঁ, উঠে। দুপহর রাতে বাস উঠে হামরার অঙ্গ থেক্যা।

চোখ থেকে তার গড়িয়ে এল দুটি জলের ধারা!

—মুই বুঝতে লারি! মুই জানি না। ক্যানে এমুন হয়! তবে হয়! সিবারে যখুন বুলেছিল শিরবেদে—তখুন উঠত না! এখুন উঠে। মুই আর পারছি না। ঠাকুর বুলেছিল—সে মুক্তির আদেশ আনিবে। আসিল না আদেশ। কাল রাতে হামরার ঘরের পাশে—কে পা পিছ্‌লে পড়্যা গেল। মুই তখুন কাঁদছি। মায়েরে বুলছি—হামবার ই লাজ তুমি ঢাক জমুনী! শব্দ শুন্যা দুয়ার খুল্যা দেখলম শিরবেদে! হামরার লাজের কথা আর গোপন নাই। তুমরা বিহিত কর! মুই চল্যা যাব।

নীরবে সে এল নিজের ঘরে। দরজা দুটি বন্ধ করে দিলে।

গঙ্গারাম এতক্ষণে এল ছুটে। তার যেন চেতনা হল —কন্যে পিঙলা! কন্যে!

ভাদুও এল ছুটে, সেও বুঝেছে।

ঘরের মধ্যে তখন নাগের গর্জনে যেন ঝড় উঠেছে।

পিঙলা বেদনা কাতর স্বরে প্রার্থনা করছে—খালাস দে জননী, —খালাস! মা গ!

ভাদু লাথি মেরে ভেঙে ফেলে দিলে দরজা!

ঘরের মেঝের উপর পড়ে আছে পিঙলা। আর তার বুকের উপর পড়ে ছোবলের পর ছোবল মারছে ওই শঙ্খচূড়। পিঙলা বললে—হুঁস করে ভাদু মামা। উরে আমি কামাই নাই ইবার।

পিছিয়ে এল গঙ্গারাম।

ভাদু তুলে নিলে চিমটে। দুর্ধর্ষ ভাদু—চিমটের আঘাতে তাকে শেষ করেছে!

নতুন নাগিনী কন্যার আবির্ভাব হয় নাই। সাক্ষাৎ দেবতার মত পিঙলা কন্যা নাই। তাই চিমটে বাজছে না, বিষম ঢাকি বাজছে না, তুমড়ি বাঁশী বাজছে না।

দানবের মত চীৎকার ক'রে উঠল নাগু ঠাকুর।—আ—!

দু হাতে বুক চাপড়াতে লাগল!

ছোট একটা ছেলে ছুটে এল—উ গ, শিরবেদে ছুটিছে গ! পালাইছে—হুই খালের পানে!

—অঁ্যা! পালাল! আমার কিল!

ছুটল নাগু ঠাকুর। সঙ্গে সঙ্গে কজন সাগরেদ।

উন্মত্তের মত ছুটছে গঙ্গারাম।

পিছনে নাগু ঠাকুর।

হাঙ্গরমুখী খালের ধারে দু'জনে দুজনকে জড়িয়ে পড়ল নরম মাটির উপর।

গঙ্গারাম ধূর্ত চতুর—কিন্তু নাগু ঠাকুর উন্মত্ত ভীম।

বুকের উপর চড়ে বসে—মারলে কিল। গঙ্গারাম একটা শব্দ করলে। বাক রোধ হয়ে গেল।

কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি দিলে না নাগু ঠাকুর—বুকে আর এক কিল। তারপর তাকে টেনে নিয়ে এল—সাঁতালীর বিষহরির আটনের সামনে। রক্ত উঠছিল গঙ্গারামের মুখে।

সমস্ত দিন কাঁদলে নাগু ঠাকুর।

সন্ধ্যের পর মদ খেয়ে চীৎকার করতে লাগল। ঘুরে বেড়াতে লাগল গঙ্গার ধারে ধারে।

শবলা এতক্ষণে কাঁদলে। বললে—সন্ধ্যার খানিক আগে—গঙ্গারাম মরিল। কি কিল মারিছিল ঠাকুর—উয়ার কলিজাটা বুঝি ফেট্যা গেলছিল। যেমুন পাপ—তেমুনি সাজা! ভাদুরে শ্বাযকালে বুলেছিল—হঁ্যা, হামরার সাজাটা উচিত সাজাই হলছে ভাদু! কন্তেটার মরণের পর থেক্যা—এই ভয়ই হামরার ছিল। মরণ কালে হামরার পাপের কথাটা তুরে বুলে যাই।

চতুর গঙ্গারাম ডোমন করেত। যাদুবিদ্যা ডাকিনী সিদ্ধ গঙ্গারামের কল্পনাতীত কুটিল বুদ্ধি। শিবরাম বলেন—শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি কবিরাজ—আমি পিঙলার ওই চম্পকগন্ধের কথা শুনে ভেবেছিলাম—ওটা তার বায়ু কুপিত মস্তিষ্কের ভ্রান্তি মানসিক বিশ্বাসের বিকার। কিন্তু তা নয়। যাদুবিদ্যা শিখেছিল গঙ্গারাম। আর অতি কুটিল ছিল তার বুদ্ধি। ওই ধনীর বাড়ীতে বেদেকুলের মর্যাদা

বিপন্ন দেখে পিঙলা তার নারীত্বের লজ্জা বিসর্জন দিয়ে যে দিন নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে দেখিয়েছিল—তার কাছে সাপ নাই—সেদিন তখন সকল লোকে হয়েছিল স্তম্ভিত, বিস্মিত; কিন্তু গঙ্গারামের পাপ দৃষ্টি পড়েছিল—পিঙলার উপর। লালসা তার লোলুপ হয়ে উঠেছিল। কোন ক্রমে তাকে আয়ত্ত করতে না পেরে সে এই জটিল পন্থার আবিষ্কার করেছিল। কন্যাটির মনে সে বিশ্বাস জন্মাতে চেয়েছিল তার অঙ্গে চাঁপার গন্ধ ওঠে। শেষ পর্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পিঙলা রাত্রে বের হবে, নয় তো পালাতে চাইবে। পালালে সে তাকে নিয়ে পালাত। মুরশিদাবাদে সে যেত ওষুধের উপকরণ আনতে। সেখান থেকে সে এনেছিল আতর। নিত্য মধ্যরাত্রে সে এসে পিঙলার ঘরের পাশে—দাঁড়িয়ে ওই আতরের গন্ধ মাখানো তুলো গুঁজে দিয়ে আসত।

পিঙলার মন বুঝবার শক্তি গঙ্গারামের ছিল না।

দৈত্যকন্যা জলন্ধর পত্নীকে ছলনা করবার সময় দেবতারও ভ্রম হয়েছিল। গঙ্গারামের কি দোষ?

গঙ্গারাম সব ব'লে শেষ বলেছিল—ঠাকুর ঠিক সংবাদ আনিছিল, কন্যে ঠিক করেছিল। হামরাদের পাপে—রোষ কর‍্যা বিষহরি কন্যারে মুক্তি দিচ্ছেন। পিঙলা যেমুন ক'রে চলে গেল—তারপরে আর কি কন্যে আসে? কন্যে আর আসবেন নাই। কন্যে আর আসবেন নাই।

শবলা বললে—সব চেয়ে দুখ ভাই—।

সবচেয়ে দুঃখ—মধ্যরাত্রে নাগু ঠাকুরের শিষ্যরা মদ খেয়ে উন্মত্ত হয়ে সাঁতালীতে আগুন জালিয়ে চরম অত্যাচার করে এসেছে। মনসার বারি কেড়ে নিয়ে এসেছে।

ভাদু নোটনেরা সাঁতালী ছেড়ে চলে গিয়েছে। মনসার বারি নাই

. কি ক'রে সাঁতালীতে থাকবে? গভীর অরণ্যে গিয়ে তাঁরা বাস
ষ।

দের নিয়ে শবলা বেরিয়েছে রাঢ়ের পথে।

আর সাঁতালী নয়,—অন্যত্র এদের নিয়ে বসতি স্থাপন করবে।
ষের বসতির কাছে—গ্রামে তারা স্থান খুঁজছে।

াগিনী কন্যা আর আসবে না, মুক্তি পেয়েছে, আর তো সাঁতালীতে
কবার অধিকার নেই!

শেষ